প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ—১৯৬০

মুদ্রক :
এম. ভট্টাচার্য
জে. এম. প্রিণ্টার্স
৩৭/সি/১ চাউলপট্টি রোড
কলকাতা-১০

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন

ভক্তিভাজনেষু

সূচী

শরৎপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ

ষোড়শ শতকের বাংলায় জ্ঞানচর্চা

প্রাচীন বাংলায় নির্বস্তুক তত্ত্বচিন্তা ও বিশুদ্ধ দর্শন অনুশীলনে বাঙালীর বড়ো একটা অনুরাগ দেখা যায় না। চিন্তার অশরীরী নৈর্বস্তুকতা বা নির্বিকল্প চৈতন্যের আস্বাদনও এ জাতির মনোধর্মের অনুকূল নয়। বুদ্ধির কুশাগ্রতীক্ষ্ণতা ও আবেগের উদ্বেলভাব—এ দুটি পরস্পরবিরোধী চারিত্র ও মনোভঙ্গী বাঙালী সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকেও বাঙালী-মনীষার শ্রেষ্ঠ দান- নবান্যায় এবং চৈতন্য-সংস্কৃতি। একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। নবান্যায় বুদ্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশকামী; চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মত ও আদর্শ ঐশ্বর্য-মিশ্রা ভক্তি ও শুষ্ক-জ্ঞান-বিরোধী। বস্তুব্যাতিচারী আবেগ *গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান পরিচয়।*

এ পর্যন্ত যে-সমস্ত উপাদান পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় ষোড়শ শতকের পূর্বেও এদেশে স্মৃতি-মীমাংসার চর্চা তো ছিলই, এমন কি ষড়-দর্শনের অন্যান্য শাখার রীতিমতো অনুশীলনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ বাংলা অক্ষরে লেখা ষড়দর্শনের পুঁথি ও টীকা এদেশ থেকে প্রচুর পাওয়া গেছে। প্রাচীন যুগে পূর্বমীমাংসা, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শন বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ১২শ-১৩শ শতাব্দী থেকে মীমাংসাচর্চা ক্রমেই মন্দীভূত হ'য়ে এল। মুসলমান-অভিযানের ফলে শিথিলীকৃত হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনের জন্য চৈতন্যযুগের আগে থেকেই স্মৃতির পঠনপাঠন বাঙালীর কাছে আবশ্যিক কৃত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এই স্মৃতি অনুশীলনের জন্য যতটুকু মীমাংসা-পাঠের প্রয়োজন, বিদ্যার্থীরা

শুধু সেইটুকুই অধ্যয়ন করত। অথচ বাংলার বাইরে গৌড় মীমাংসকদের বেশ খ্যাতি ছিল। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি'তে গৌড় মীমাংসক-দের উল্লেখ দেখা যায়। তন্ত্র ও স্মৃতি চর্চার জন্য মীমাংসার প্রয়োজন, তাই ১৫শ শতকেও মীমাংসার অনুশীলন খুব একটা অজ্ঞাত ছিল না। এই শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'অধিকরণ কৌমুদী' রচনায় মীমাংসার প্রচুর সাহায্য নিয়েছিলেন, উত্তর-বঙ্গের চন্দ্রশেখর মীমাংসার টীকা লিখেছিলেন।

মীমাংসার কথা বাদ দিলে, ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে বা তারপরেও ষড়্-দর্শনের মধ্যে বেদান্তানুশীলন অব্যাহতভাবে চলেছিল। প্রাচীন যুগেও দেখা যাচ্ছে হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট অদ্বৈত দর্শনে প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পরেও বেদান্তের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৬১ শকে বাংলা অক্ষরে লেখা একখানি 'বেদান্ত সূত্র'-এর খানিকটা এখনও বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে আছে। মান্দ্রাজের আদায়ার গ্রন্থাগারে বাংলা অক্ষরে লেখা উপনিষদের অনেকগুলি পুরানো পুঁথি আছে। শ্রীধরের 'অদ্বয় সিদ্ধি' তো বহুপূর্বে এই বাংলাদেশেই রচিত হ'য়েছিল।

গৌড় পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তী 'তত্ত্ব-মুক্তাবলী-মায়াবাদ-শত-দূষণী' গ্রন্থে (১৪শ শতক) ১২০টি শ্লোকে শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেন। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' এঁর উল্লেখ আছে, সুতরাং ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন। এই যুগের একটা কৌতূহলজনক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এঁরা ন্যায়বৈশেষিকের প্রভাবের ফলে বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্যকে পদে পদে আক্রমণ করতেন। ১৬শ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে মায়াবাদ বারবার আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। বাসুদেব সার্ব-ভৌমের 'অদ্বৈত মকরন্দে'র টীকা ও রঘুনাথ শিরোমণিকৃত শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যম্'-এর টীকা এই যুগেই (১৫শ শতকের শেষে) রচিত। বাংলার সুবিখ্যাত বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী (১৬শ শতক) শঙ্করের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর 'অদ্বৈতবাদ সিদ্ধি', 'অদ্বৈত রত্নরক্ষণ', 'বেদান্তকল্পলতিকা', 'গূঢ়ার্থ দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ বৈদান্তিক সমাজে

সুপরিচিত। বাংলাদেশে পরের যুগে অদ্বৈত বেদান্তের চেয়ে বেদান্তের দ্বৈতবাদী ভাষ্য বা ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী অধিকতর প্রাধান্য পেলেও মধুসূদন সরস্বতীর বেদান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যা (অদ্বৈতবাদ) খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অবশ্য তাঁর মনেও দ্বৈতবাদী ভক্তি যে ছায়া ফেলে নি, একথা বলা যায় না। তাঁর 'ভক্তিরসায়নে' ভক্তির সাহায্যে মোক্ষলাভের কথা বলা হয়েছে। মধুসূদন বিশুদ্ধ অদ্বৈতপথের পথিক হলেও গৌড়ীয় ভক্তিবাদের দ্বারা যে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না।

মধুসূদনের অল্প পরে আবির্ভূত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বা গৌড় ব্রহ্মানন্দ মধুসূদনের 'অদ্বৈত সিদ্ধি'র টীকা লিখে এবং 'অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত বিদ্যোতন' নামক অদ্বৈত মতের মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দিয়েছেন। অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে সারা দেশেই ষোড়শ শতক থেকে অদ্বৈততত্ত্বের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যাই অধিকতর প্রচার লাভ করেছিল। মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভের দ্বৈতবাদী বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ও আদর্শকে কোন কোন দিক থেকে প্রভাবিত করেছিল। ১৮শ শতকের বৈষ্ণব দার্শনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দ ভাষ্য' নামক বেদান্ত-সূত্রের টীকায় উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে দ্বৈতবাদী ভক্তিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তাঁর দুশো বছর আগে রূপগোস্বামী এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী দ্বৈতবাদী দর্শনের সাহায্যে ভক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপ্রণালীকে একটা সুবিহিত নিয়ম ও দার্শনিক মননের মধ্যে বিধৃত করেছিলেন।

বেদান্তানুশীলন ছেড়ে দিলে ১৬শ শতকের দিকে নব্যন্যায় ছাড়া সাংখ্য বৈশেষিক দর্শনের খুব বেশি চর্চা হয় নি। কেউ কেউ সাংখ্যকার কপিলকে গৌড়বাসী প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। বাংলাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাংখ্য দর্শন বড় একটা অনুশীলিত হয় নি। অথচ তন্ত্রের মূলতত্ত্বের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের (হরপার্বতী ও পুরুষপ্রকৃতি) সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায় সহজেই। রঘুনাথ তর্কবাগীশের 'সাংখ্যবৃত্তি

প্রকাশ' মৌলিক গ্রন্থ নয়— ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকার' টীকা মাত্র। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এর একখানি পুঁথি আছে, ১৪৪৮ খ্রীঃ অব্দে পুঁথিটির অনুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল। পরের যুগে 'সাংখ্যকারিকা'র আরও দু-একখানি টীকা পাওয়া গেলেও যোগ-দর্শনের আলোচনা এদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে দুর্লভ বললেই চলে।

নব্যন্যায় চর্চাতেই বাঙালীর বিস্ময়কর নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যাবে। গৌড় নৈয়ায়িকদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, তার্কিকতা ও বিচক্ষণতায় একদা সারা ভারতবর্ষই বিস্মিত হয়েছিল। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এক সময় ভারতের নানা অঞ্চল থেকে অসংখ্য পাঠার্থী নব্যন্যায় পড়বার জন্য নবদ্বীপে আসত— এখনও দু-একটি বাইরের ছাত্র এখানে এসে নব্যন্যায় পড়াশুনা করেন। প্রাচীন যুগে বাঙালী ন্যায়-শাস্ত্রের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নি, তা ঠিক বটে। মুসলমান অভিযানের আগে দেশে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিশেষ প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। গৌতমের 'ন্যায় সূত্র' এবং উদয়নাচার্যের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' এদেশে যৎসামান্য আলোচিত হয়েছে। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে যখন নব্যন্যায়ের প্রচণ্ড প্রতাপ, তখনও কেউ কেউ প্রাচীন ন্যায় চর্চা করতেন।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, বাঙালী-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান যে নব্যন্যায়, তা বাঙালীর সৃষ্টি নয়। প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় (১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামে নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙালী নৈয়ায়িকেরা বিশেষ কোন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন নি, তাঁরা ঐ 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকা রচনায় আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি, কালে মূলগ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি' অপ্রচলিত হয়ে পড়লে তার স্থানে অধিষ্ঠিত হল অসংখ্য টীকা-টিপ্পনী। বাঙালী নৈয়ায়িকেরা অনেক সময় গঙ্গেশের ভুলভ্রান্তি নির্দেশ করতেও পিছপা হতেন না, এবং গঙ্গেশের কোন কোন মতের প্রতিবাদ করে এঁরা নতুন যুক্তিক্রম ব্যাখ্যানে আনন্দবোধ করতেন। খ্রীঃ ১৫শ শতক থেকে ১৬শ শতাব্দী—প্রায় দু'শ বছর ধরে বাঙালী নব্যন্যায়ের চর্চা করেছে মহানন্দে, ১৭শ-১৮শ

শতাব্দীতেও সে ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয় নি। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার (১৫শ শতাব্দীর শেষ), জানকীনাথ ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ), রঘুনাথ শিরোমণি (১৬শ শতাব্দীর প্রথম), কণাদ তর্কবাগীশ (ঐ শতাব্দী), রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী (১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ), মথুরানাথ তর্কবাগীশ (১৬শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ) কৃষ্ণদাস সার্বভৌম ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ), রাজেন্দ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভট্টাচার্যদের নাম করা যেতে পারে।

বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য সম্বন্ধে একটা গল্প লোকমুখে খুব চলেছিল। তিনি নাকি ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় ন্যায় পড়তে গিয়েছিলেন, তখন মিথিলাই ছিল ন্যায় পঠন-পাঠনের কেন্দ্র। বাংলা থেকে বহু ছাত্র মিথিলায় যেত শুধু ন্যায় পড়বার জন্যই। বাসুদেব 'তত্ত্বচিন্তামণি'র একটি অনুলিপি আনতে চাইলে পাছে মিথিলার প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে যায়, এই জন্য এই ব্যাপারে তাঁকে মিথিলার পণ্ডিতেরা বাধা দিয়েছিলেন। তখন এই অসাধারণ শ্রুতিধর গোটা 'তত্ত্বচিন্তামণি' খানাকে কণ্ঠস্থ করে ফেললেন এবং ন্যায়ের এই অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থকে সূক্ষ্ম কৌশলে বাংলাদেশে নিয়ে এলেন। পরে এদেশে গঙ্গেশের এই গ্রন্থের অনেক টীকাটিপ্পনী রচিত হয়েছে। 'তত্ত্বচিন্তামণি'র কুড়িখানি বিখ্যাত টীকার মধ্যে বারোখানিই বাঙালীর রচনা। এই টীকাকারদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ হচ্ছেন রঘুনাথ ভট্টাচার্য শিরোমণি। মথুরানাথ তর্কবাগীশের খ্যাতিও সারা ভারতে বিস্তৃত। রঘুনাথ বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকা 'তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি' বাঙালী-মনীষার গৌরব প্রমাণিত করেছে। এতে তিনি গঙ্গেশের মতের তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনা করেছেন এবং কোথাও কোথাও গঙ্গেশের ভুল-ত্রুটি দেখাতেও পিছিয়ে যান নি। বহু বাঙালী পণ্ডিত রঘুনাথের টীকার টীকা রচনা করে ছিলেন। এমন কি, অনেক অবাঙালী টীকাকারও 'কাণ ভট্ট শিরোমণি'র (রঘুনাথের একটি চোখ কানা ছিল) টীকা রচনা করতে শ্লাঘা বোধ করতেন।

মধ্যযুগে বাংলাদেশে নব্যন্যায়ের আলোচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়েছিল। ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে যে ন্যায় জানত না, তাকে কেউ পণ্ডিত বলে স্বীকার করত না। অবশ্য কথা উঠবে, এদেশে যদি নব্যন্যায়ের এতই সমাদর, তা হলে টীকা-টিপ্পনীর চর্বিতচর্বণ ছাড়া ন্যায়ের কোন মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয় নি কেন? টীকা, তস্য টীকা—এইভাবে শুধু টীকা-টিপ্পনীর স্তূপ বেড়েছে, কিন্তু মিথিলার গঙ্গেশের মতো কোন বাঙালী নৈয়ায়িক কোন মৌলিক গ্রন্থ রচনায় সূক্ষ্ম প্রতিভাকে নিয়োগ করেন নি। ইদানীং কোন কোন সমালোচক এই ব্যাপারকে উল্লেখ করে বাঙালী মানসের গতানুগতিক পুচ্ছগ্রাহিতাকে নিন্দা করেছেন। সে যুগের পাণ্ডিত্য এতেই তৃপ্তিলাভ করত। সেকালের বিদ্যা-সমাজ মৌলিক আলোচনার চেয়ে পুরানো গ্রন্থকে পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করতে বেশী ভালোবাসতেন, প্রতিপক্ষের মত খণ্ড খণ্ড করে বুদ্ধির জয়ে স্ফীত হয়ে উঠতেন — কিন্তু নতুনভাবে কোন চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন না। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্তী এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে যথার্থ বলেছিলেন, রঘুনাথ শিরোমণি থেকে গদাধর ভট্টাচার্য পর্যন্ত নবদ্বীপে এমন সমস্ত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি মধ্যযুগীয় য়ুরোপের দার্শনিকদেরও পরাজিত করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে, এই সমস্ত সূক্ষ্মদর্শী প্রতিভা শুধু টীকা-টিপ্পনী রচনায়ই খরচ হয়ে গেল। এই বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ধারের দ্বারা পূর্বপক্ষকে ধরাশায়ী করা যায়, কিন্তু তাতে ধরাধামের কারও কোন লাভ হয় না—লাভ বলতে আমরা মননের কথাই বলছি।

এই যুগের নৈয়ায়িকেরা বোধহয় যাগযজ্ঞ ও স্মার্ত ক্রিয়া-কলাপে হতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। তার ওপর ভক্তিবাদী চৈতন্যসম্প্রদায়ও বৈধী ভক্তি ও স্মার্ত আচার বিচারের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। এই ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী স্মার্তগণ নৈয়ায়িক ও বৈষ্ণব উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। একজন স্মার্ত সে যুগে দুঃখ ক'রে বলেছেন যে, পণ্ডিতেরা হোম যাগযজ্ঞ না করে

রঘুনাথ শিরোমণির সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে মত্ত হয়েছেন, এবং অবধূত নিত্যানন্দের প্রভাবে কৃষ্ণনামেও সকলে উদ্বাহু। সুতরাং কলির আর বাকি কি? কিন্তু অনেক নৈয়ায়িক বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী হয়েও চৈতন্যের অনুরাগী এবং ভক্তিবাদী ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইনি 'বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ চতুর্ব্যূহ বিষ্ণুকে' প্রণাম করে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, নবদ্বীপের ভট্টসমাজ (অর্থাৎ নৈয়ায়িকেরা) নাকি চৈতন্য-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সে রকম কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তান্ত্রিক ও শাক্তেরাই ঘোরতর চৈতন্য-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী হয়েও আবেগ-বাদী চৈতন্য-ধর্মকে অশ্রদ্ধা করতেন না, বরং কেউ কেউ ব্যক্তিগত ধর্মমতে বৈষ্ণবই ছিলেন, তাঁরা চৈতন্যসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যান নি। সে যাই হোক, ১৬শ শতকে বাঙালী-মনীষার আশ্চর্য বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি, রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি, রঘুনাথের নব্যন্যায়, কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে মননচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীর আবির্ভাব হয়েছিল। অবশ্য নব্যন্যায় বিতর্ক-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করলেও, এর দ্বারা মননের ক্ষেত্রে বাঙালীর কতটা লাভ হয়েছে তা ভেবে দেখা দরকার। ১৭৪০ সালে ফাদার পন্স্ (Pons) নামে এক জেসুইট পাদ্রী এদেশে এসে সংস্কৃত শিখে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর মতে, এই নব্যন্যায় "stuffed with an endless number of questions, a great deal more subtle than useful." এই বিদেশীর উক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু বুদ্ধির ব্যায়ামে যে আনন্দ হয়, এখানে সেই নিভাঁজ বুদ্ধির অনুশীলন প্রাধান্য লাভ করেছে।

তবে বৃন্দাবনের চৈতন্যপন্থী গোস্বামী-সম্প্রদায়ের দার্শনিক চেষ্টা ১৬শ শতকের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে অবশ্যই স্বীকৃতি পাবে। চৈতন্যের নির্দেশে ১৬শ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাঙালী বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীদের চেষ্টাতেই প্রাচীন গলিত বৃন্দাবন নব-বৃন্দাবনরূপে পরিগণিত

হয়। চৈতন্যের অনুগত সনাতনগোস্বামী, রূপগোস্বামী, গোপালভট্ট এবং রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী বৃন্দাবনে অবস্থান করে এবং চৈতন্যসম্প্রদায়ের নীতি ও দর্শনের অনুশীলনে সারা জীবন ব্যয় করেছিলেন। যাকে গৌড়ীয় ভক্তিদর্শন বলে, এঁরা তাকেই আশ্চর্য তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং সুগভীর ভক্তির দ্বারা অবধারণ করেছেন। গোপাল ভট্টের 'হরিভক্তি-বিলাস' (সনাতনের নামেও প্রচারিত), সনাতন গোস্বামীর 'বৃহদ ভাগবতামৃত', 'বৈষ্ণবতোষণী', রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু', 'উজ্জ্বল নীলমণি' এবং জীবগোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' (তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতিসন্দর্ভ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছে। মধ্বমতের সঙ্গে চৈতন্য তত্ত্বাদর্শের কিঞ্চিৎ মিল থাকলেও বৃন্দাবনের গোস্বামী-চতুষ্টয়-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বাঙালী -মনীষার একটা চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। অবশ্য এই চারজন গোস্বামীই বাঙালী ছিলেন না, এঁরা দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী। এঁদের মধ্যে সনাতনেরা দু'পুরুষ বাংলাদেশে নৈহাটী ও রামকেলিতে (গৌড়ের কাছে) বাস করে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন; শ্রীরঙ্গমের অধিবাসী গোপালভট্ট বাংলা জানতেন কিনা জানা যায় না। খুবই কৌতূহলের কথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যাঁদের গ্রন্থ থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছে, তাঁরা বাঙালী ছিলেন না।

য়ুরোপে যাকে রেনেসাঁস বলা হয়, বাংলার ১৬শ শতক কতকটা সেই রকম। প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যাকে নতুন করে আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা এই যুগে বেশ দেখা গেছে। আত্মার বৃহৎ সত্তা, জীবনের ভৌমবন্ধন-ব্যতিরিক্ত নিষ্কস প্রকাশ, ভক্তির পাবনী ধারা —এ সমস্তই ১৬শ শতকের চেতনার স্বরূপলক্ষণ। অবশ্য এই শতকে জ্ঞান দিয়ে যার শুরু, প্রেমে তার পরিণতি। বুদ্ধির নিগূঢ় প্রকাশ ও আবেগের আর্দ্রতা —এই শতকের মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্যই নজরে পড়বে। এই দুই বৈপরীত্য ও বৈষম্য পরবর্তী কালেও দেখা গেছে। বোধহয় বাঙালীর মন ও স্বভাব এই দুই মেরুপথে সর্বদা সঞ্চরমাণ।

বাংলা সাহিত্যে মানবচেতনা

প্রথম পর্ব

১

ডিগ্রীকামী ছাত্র ছাড়া অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের পুরাতন কালের বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। চর্যাগানের যৌনা-সঙ্গমূলক অধ্যাত্মসাধনাকে রহস্যবাদী 'কাল্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত করে কেউ কেউ এই সম্পর্কে কিছু গবেষণা চালাচ্ছেন; কেউ এর ভাষাতত্ত্বের প্রতি অধিকতর কৌতূহলী। এ ছাড়া কিছু আউল-বাউল সাধনা এবং বৈষ্ণব-পদাবলীর ধ্বনিঝঙ্কার ও রূপকলার প্রতি একালের কোন কোন মরমী পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ প্রায় কোথাও গ্রাম্য পাঁচালীর স্তর ছাড়িয়ে আর্ষ-মহাকাব্যের সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারে নি। মঙ্গলকাব্যের কিছু সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও এগুলির পৃথুল কলেবরে শিল্পীর ছোঁয়া পড়েছে অল্প ক্ষেত্রে। যা একালের মানুষকে স্পন্দিত করে, নতুন শিল্পবোধের জন্ম দেয়, পুরাতন বাংলা সাহিত্যে তার পরিচয় নখাগ্রে গণনীয়। এ-যুগের রসিক পাঠক যদি সে যুগের বাংলা 'পাঁচালী প্রবন্ধ' ও পদগীতিকা সম্বন্ধে এই ধরনের বিরস মন্তব্য করেন, তা হ'লে তাঁকে বড় বেশী দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

যুগধর্মানুসারে মানসিক মূল্যবোধের হেরফের হয়—বিশেষতঃ সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে। কারণ যুগধর্ম মনোধর্মকে প্রভাবিত করে এবং সাহিত্য

যে হেতু মানসিক ব্যাপার, সেই হেতু পাঠকের সাহিত্য-সংক্রান্ত বোধ ও বৃত্তি যুগমানসের দ্বারা প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা একালের বাতাবরণের মধ্যে বাস করি। আমাদের দেহ-মন একালের অন্নবস্ত্রে লালিত-পালিত। সুতরাং সেকালের নাথ-গীতিকা, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদ, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ প্রভৃতি পুরাতন বাংলা কাব্য এ-যুগের মানুষের মনে বিস্ময়রস সৃষ্টি করতে পারে না। তবে কখনও কখনও পুরাতন কালের সাহিত্য যুগধর্মের সাময়িকতাকে অতিক্রম করে একালেও জনপ্রিয় হয়ে থাকে। তাকেই ব া হয় ক্লাসিক্স্ বা চিরায়ত সাহিত্য। বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু কিছু অংশ বাদ দিলে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যকে স্মরণীয় করে রাখবার মতো অসংখ্য ছত্র মিলবে না। অর্থাৎ যাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস, শিল্পশ্রী, রূপলাবণ্য বলা হয়, সেকালের বাংলা সাহিত্যে তার এমন কোন সর্বকালীন রূপ ফুটে ওঠে নি, যা একালের মানুষের মনে নান্দনিক ধ্বনিতরঙ্গ তুলতে পারে।

মহৎ সাহিত্যের কথা স্বতন্ত্র। তার দেশও নেই, কালও নেই। কিন্তু যে-সাহিত্য দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ, তার প্রভাব ও প্রসার স্থান ও কালের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ থেকে যায়। তবে একথাও স্বীকার করা যেতে পারে যে, সেকালের সাহিত্যের যথার্থ প্রাণতত্ত্বটি বুঝতে হলে সেকালের সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ফিরে যেতে হবে। একালের চশমা চোখে দিয়ে সেকালকে যথাযথভাবে বোঝা যাবে না। মুকুন্দরামকে বুঝতে হলে চারশ বছর আগেকার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার পটোত্তলন করতে হবে। বৈষ্ণব পদাবলীর রস গ্রহণ করতে হলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম, তার সাধ্যসাধনা ও রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সমাজজীবনের সঙ্গে অল্প স্বল্প পরিচয় না থাকলে পদাবলীর শিল্পের দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং নিছক রোমান্টিক কবিতার মাপকাঠিতে বৈষ্ণবগানের বিচারের ইচ্ছা হবে। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রহণে সাধারণ পাঠকের এইগুলি প্রধান বাধা।

বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্য শুধু কাব্যরসের দিক থেকে পড়তে

গেলে অতিশয় ক্লান্তিকর ও নীরস মনে হবে। ভোজ্য তালিকা, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌত্রিশ অক্ষরে দেব-দেবী বন্দনা ও গুণকীর্তন, উপকূল-বাণিজ্যের দূরস্মৃতিবহ কল্পকাহিনী, বীররসের হাস্যকর লম্ফঝম্ফ প্রভৃতি ব্যাপারে সমাজ ও ইতিহাসের অনেক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকতে পারে; কিন্তু যে-শিল্পগুণে মন খুশি হয়, অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই তার একান্ত অভাব।

একালে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে যখন জীবন, সমাজ ও আদর্শের মূল্য পরিবর্তন শুরু হল, তখন বাংলা সাহিত্যেও সেই ভাবতরঙ্গ আঘাত করল। দেবতারা তুঙ্গ মহিমার সিংহাসন থেকে স্খলিত হয়ে পড়লেন এবং সেই শূন্য স্থানে মর্ত্যবাসীরাই কায়েম হয়ে বসল। এই যে মর্ত্য চেতনার প্রতি এত আকর্ষণ ও গুরুত্ব, আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে রসধারায় অবগাহন করে আধুনিক হয়েছে, যাকে আমরা বলি মানবচেতনা—এটা যদি সাগরপার থেকে আমদানী করা ব্যাপার হত, তাহলে একালের সাহিত্য কিছুতেই বাঙালী-মনের ধাত্রী হয়ে উঠতে পারত না। তা হলে সৃষ্টি হত উদ্ভট, নীরক্ত ইঙ্গবঙ্গী সাহিত্য আঁতুড়ঘরেই যার দেহান্ত হ'ত। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র যে মানবিকতা, তা পূর্ব থেকেই পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বীজাকারে প্রচ্ছন্নাবস্থায় ছিল। অকস্মাৎ পশ্চিমের জীবনোল্লাস তাকে স্পর্শ করল। বীজটি তখন মাটির আবরণ ভেদ করে শাখাপত্র মেলে জেগে উঠল। এ মাটি হচ্ছে মনের মাটি, এ বীজ হল মানববোধ। বলা বাহুল্য, এটি পাশ্চাত্ত্য বিশ্বের মিল-বেন্থাম-কোঁৎ প্রভৃতি দার্শনিকদের তত্ত্বমার্গীয় মানব-চেতনা নয়, এর স্বরূপ ভিন্নতর। এ হচ্ছে মানুষের অন্তর্লোকের কথা, যে-মানুষ শুধু একটা সামাজিক সত্য নয় বা তত্ত্বের রূপক নয়।

২

বাংলা সাহিত্য বাঙ্‌ময় হবার পূর্বে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে যে পাঁচমিশেলি রচনা চলে আসছিল, তার মধ্যে জয়দেবের গীত-

'গোবিন্দ ছাড়া আর কোনটিই ধোপে টেঁকে নি। অথচ যাকে প্রত্যহের জীবনযাত্রা বলে, তার কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র পাওয়া যাবে এই যুগের সংস্কৃত-প্রাকৃত রচনায়—যাকে নিঃসংশয়ে বলতে পারি বাঙালীর রচনা। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ছবি নানা চুট্‌কি শ্লোকে বেশ মোটা দাগেই আঁকা হয়েছে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকত, মাঝখানে যদি সেনবংশ শ' খানেক বছর বাংলায় আধিপত্য বিস্তার না করত, তা হ'লে প্রাকৃত-অপভ্রংশের আঁচলের তলা থেকে যে-বাংলা সাহিত্য বেরিয়ে আসত, তা শুধু দেবলীলাকথায় পূর্ণ থাকত না, বা বৌদ্ধ-শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব—এঁরাই বাংলা সাহিত্যের ঘটনাসূত্র নিয়ন্ত্রণ করতেন না। আমাদের অনুমান, ভিন্ন দেশের অধিবাসী, ঘোরতর ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী, শাস্ত্রযাজী সেনরাজেরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে সমাজে ও জীবনে পৌরাণিক ও স্মার্ত সংস্কার দৃঢ়মূল করবার চেষ্টা করা হয়। সমাজের উচ্চবর্ণ এবং কিয়ৎ পবিমাণে জল-চল শূদ্রসমাজে এই ধারা প্রবেশ করল। এর পূর্বে শ' চারেক বছব ধবে মহাযান মতাশ্রয়ী পালবংশ রাজত্ব কবেছিল। তাঁরা ধর্মমতে সহিষ্ণু ছিলেন, স্মার্ত ও পৌরাণিক আচারানুষ্ঠানে কখনও বাধা দেন নি। তবু একথা মানতেই হবে, তাঁদের আমলেই বৌদ্ধ যান-উপযান সমাজের সর্বস্তরে উদারভাবে প্রবেশ কবেছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রেব সঙ্গে রফা কবে ভুক্তি-মুক্তি তত্ত্বকে নির্বাণে প্রয়োগ করলেন, তাঁরা শৌরসেনী অপভ্রংশে ও প্রথম যুগেব আধো-আধো গৌড়ীয় ও বঙ্গালবাণীতে দুরূহ গুহ্যকথা লিপিবদ্ধ করলেন। এই সমস্ত রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধ্যসাধনা; কাব্যরসটা অধিকন্তু। অবশ্য তাঁদের কারো কারো হাতে ছিল রসের কলম। তাই তত্ত্বের হলকর্ষণ করতে করতে কদাচিৎ দু-চারটি রসের বীজ হলের ফলায় উঠে পড়ত। রহস্যবাদী সাধনা আত্মগোপনে অতি-সতর্ক, প্রায়শই গোপনচারী ও গুহাহিত। পাল-শাসনের শেষভাগে চর্যাগান রচিত হতে আরম্ভ করে, এবং যেহেতু মহাযান ও তার শাখাপ্রশাখা রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয় নি, সেই হেতু তখন হিন্দুসমাজের কাছ থেকে তার

নিপীড়িত হবার আশঙ্কা ছিল না। তৎসত্ত্বেও তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকগণ এই ধরনের সংক্ষিপ্ত সাধনপদ্ধতিকে প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁরা রূপক-প্রতীকের আড়ালে-আবডালে, রহস্যময় ইঙ্গিতের সাহায্যে তত্ত্বকথা ও দেহকৃত্যকে যথাসাধ্য গোপনের চেষ্টা করেছিলেন। আসলে এই ধরনের কায়াকেন্দ্রিক মোক্ষমার্গ পৃথিবীর সর্বত্র সুগোপন-চারী হয়েই আছে। কারণ এই কায়াসাধনার মূল বিষয় স্থূল যৌন প্রতীক-তাকে সাধকেরা মোক্ষমার্গের প্রথম সোপান বলে গ্রহণ করে থাকেন, এবং নৃতাত্ত্বিকগণ অবহিত আছেন, অতি প্রাচীনকাল থেকে যৌন প্রতীকতা যেমন সাধনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি এর প্রতি সামাজিক মানুষের লজ্জা-সঙ্কোচও সভ্যতার ধাপে ধাপে বেড়ে গেছে। প্রাকৃত জন, যারা পাশব ভোগবাদী, তারা এই সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করে থাকে। সেইজন্য ঐ ভাবের কায়াপন্থীরা এই তত্ত্ব ও সাধনাকে সাধ্যমতো গোপন করে থাকেন। সে যাই হোক, সেনযুগে বৌদ্ধ আচারের প্রতি শাসক-শক্তির প্রতিকূলতার জন্য বাংলা ভাষায় লেখা চর্যাগানের ধারাটি বাহ্যতঃ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। বেদবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ নিরতিশয় বিরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হন নি। অবশ্য সহজিয়া, বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপগোষ্ঠীকে তাঁরা ঘৃণা করতেন সর্বাধিক। মহাযান মতাশ্রয়ী পাল-বংশের অবসান এবং সেইস্থানে স্মার্ত ও শাস্ত্রযাজী সেনবংশের আবির্ভাবকে বাংলার উচ্চ বর্ণেরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজ সোল্লাসে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, স্মৃতি-সাহিত্য চর্চা সেনযুগে পুরোদমে চলতে লাগল। কিন্তু রাজানুকূল্য-বঞ্চিত বাংলা ভাষায় সাহিত্য-রচনাকর্ম ক্রমেই লুপ্ত হ'য়ে গেল। অবশ্য বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে বাংলাদেশে যে সংস্কৃত চর্চা হয়েছিল তার মূল্য স্বীকার করতে হবে। তার মধ্যমণি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'।

'গীতগোবিন্দ' সারা ভারতবর্ষেই নানা ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও পবিত্র গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এই বিচিত্র কাব্যটি রচনার এক শ' বছরের মধ্যেই এর ধর্মীয় প্রভাব ও ভক্তির আদর্শ সমস্ত অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কালের পণ্ডিতগণ 'গীত-গোবিন্দে'র মূলে ভক্তি ভাব ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা আছে বলে মনে করেন না। নিছক কামচর্চা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির অভিপ্রায় ছাড়া এ কাব্যে কোন প্রকাশ্য বা গুহ্যাতিগুহ্য ভক্তিতত্ত্ব নেই— কেউ কেউ একথাও বলে থাকেন। যুগভেদে সামাজিকতার ভেদ ঘটে থাকে। এ কালের পাঠক 'গীতগোবিন্দে'র মধ্যে উগ্র তপ্ত ফেনিল কামরসের অসহ্য পুলক উপলব্ধি করতেই উৎসাহিত হবেন। কিন্তু সেকালের শ্রোতা এর থেকে ধর্মার্থকামমোক্ষাদি চতুর্বর্গ ফললাভেই কৃতার্থ হতেন। কে অধিকতর ভাগ্যবান বা লাভবান, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কে অধিকতর যৌক্তিক, তার রফানিষ্পত্তিও নিষ্ফল। কারণ সাহিত্য, মানসিকতা, নীতিসম্পর্কীয় মূল্যবোধ— সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমকালীন-তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একদা যা গভীরভাবে ধর্মীয় বা অধ্যাত্ম-বোধের সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে ছিল, এখন যদি কেউ তার মধ্যে বিশুদ্ধ মানবরসের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তা হলে তাই নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই। কারণ উক্ত দুই প্রকার মনোধর্মই কালধর্মানুসারে সমান সত্য। মধ্যযুগীয় মানসিকতায় তার ধর্মীয় অনুভাবনাই সেকালের শ্রোতাদের কাছে অধিকতর হৃদ্য মনে হয়েছিল। এ কালের মানসিকতায় লালিত পাঠকের কাছে এ-কাব্য শিরোধার্য পবিত্র গ্রন্থরূপে যদি স্বীকৃত না হয়, বরং কেলিকুঞ্জের 'হ্যাণ্ডবুক' বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সমালোচক এ দু' দলের মতামতকে একই মূল্য দেবেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে আদিরসকে আশ্রয় করে এক ধরনের রহস্যময় অধ্যাত্ম সাধনা প্রচলিত ছিল। যোগ, হঠযোগ ও তন্ত্র তাকে বলশালী করেছে। হয়তো অন্-আর্য নিষাদ

সংস্কৃতির সঙ্গেও এর আত্মীয়তা থাকা সম্ভব। বৌদ্ধ, জৈন ও বেদাচারী আর্যমত—সকলেই অল্পাধিক এই দেহ-দশাশ্রিত কামচর্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নারদীয় ও শাণ্ডিল্য সূত্র তারই সূক্ষ্ম ও ঊর্ধ্বায়িত ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু 'গীতগোবিন্দে'র অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম ও ধর্মীয় ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও এর কোন কোন অংশে (যথা- 'সামোদ দামোদর') যে আদিরসের বাধাহীন উল্লাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের লতাবিতান ছাড়িয়ে মানুষের দেহযন্ত্রেই আসন পেতেছে, তা এ কালের পাঠক স্বীকার করে থাকেন। এই দেহবোধ, যা হচ্ছে মানববোধের স্থূলভূমি, 'গীতগোবিন্দে'র মঞ্জুল শ্লোকাবলির মধ্যে তা বেশ স্পষ্টভাবেই আত্ম-প্রকাশ করেছে, এবং পরবর্তীকালের অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দেবনির্ভরতা সত্ত্বেও এখানে মানুষের কথাই কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও-বা কিছু প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

৩

মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে তার অন্তর্নিহিত সত্তাকে মর্যাদা দিয়ে বিশেষভাবে মানুষের কল্যাণ-চিন্তাকেই আমরা মানবিকতা বলে থাকি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানুষ কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানুষকে যথার্থ-ই একটা পার্থিব সত্তারূপে কী পরিমাণে দেখা হয়েছে, ইত্যাদি প্রশ্ন মনে জাগলেই আমাদের চোখের উপর ভেসে ওঠে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালায় সংরক্ষিত হাজার আটেক পুরাতন বাংলা পুঁথি, যার অনেকগুলি বহুকাল থেকে খেরোর লাল কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিস্মৃতির ঘুম দিচ্ছে। মধ্যযুগের আরও কয়েক হাজার পুঁথি বাংলাদেশের এবং ও-পার বাংলার নানা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হয়েছে। এ-সমস্ত পুরাতন পুঁথির অতি অল্পই মুদ্রিত হয়েছে। তুলোট কাগজে সেহাই কালিতে লেখা প্রায়-দুষ্পাঠ্য এই সমস্ত পুঁথির পত্রমর্মরের মধ্যে

যে একযুগের বাঙালী-চেতনার পরিচয় লুকিয়ে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত, চৈতন্য-জীবনীকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাহিনী, শাক্ত ভক্তি-গীতিকা, নাথগীতিকা, বাউল-মারফতী-মুর্শিদা গান—এইসব বিষয়ের অনেক পুঁথিপত্র ধ্বংসের হাত এড়িয়ে রক্ষা পেয়েছে, কিছু-বা মৌখিক ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে এযুগে এসে পৌঁছেছে। এই পুঁথি ও মৌখিক ধারার মধ্যেই বাঙালী-জীবনের যথার্থ পরিচয় রয়েছে। আর্দ্র বায়ুর দেশে কোনও স্থাবর কীর্তি বেশীদিন অক্ষত থাকে না। কিন্তু পুঁথিগুলিকে একদা বাঙালী শ্রোতারা পূজা করত এবং সযত্নে রক্ষা করত বলে এর কিছু অংশ ক্ষুধাতুর কীটপতঙ্গ এবং আর্দ্র প্রকৃতির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। বাঙালীর পুরাতন কুলপরিচয় এই পুঁথির সাহিত্যের মধ্যে ভূরিপরিমাণে রয়ে গেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মানবচেতনার ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। মানুষের ঘরসংসার, জীবনকথা, সুখদুঃখ - এ সবই হল সাহিত্যের মূল উপাদান। দেবদেবী, ভূতপ্রেত, যক্ষরক্ষ—সাহিত্যে তাও স্থান পায় বটে, কিন্তু সবকিছুকেই মানবচেতনার অঙ্গীভূত হতে হবে। পুরাতন যুগের বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় ব্যাপার যদি শুধু দেবদেবীর কথা-কাহিনীকেই উপাদান হিসেবে গ্রহণ করত এবং তার থেকে মানুষ নির্বাসিত হত অথবা গৌণ হয়ে পড়ত, তাহলে এ সাহিত্যের স্বাভাবিকভাবেই অবসান হ'ত এবং পরবর্তী কালের অর্থাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্যও কোনও দিন খঞ্জত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারত না। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের মূল উপাদান দেবদেবীকে কেন্দ্র করলেও তার পশ্চাদ্‌পটে মানবচেতনার ধারা বহমান, তা সতর্ক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাবে না। চর্যাগান থেকে শুরু করে শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সর্বত্র মানবচেতনার স্বরূপ বড় বিচিত্র আকারে ধরা পড়েছে। চর্যাগান তো সাধ্যসাধন-সংক্রান্ত রহস্যাচার সঙ্কলন, যেখানে অবিদ্যাবিমোহিত নশ্বর মানবজীবনকে

নস্যাৎ করা হয়েছে। নির্বাণ যেখানে অন্বেষ্টব্য, সেখানে পঞ্চতন্মাত্রের অধীন জীবদেহকে বাতিল করাই স্বাভাবিক। তাই এই গীতিসংগ্রহে বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনাই বেশী। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে, রহস্যবাদী নির্বাণতত্ত্বের অন্তরালে দেহদশাধীন মানুষই উঁকি দিচ্ছে। চর্যার সাধকগণ বাক্‌পথাতীত ব্যাপারকে ইঙ্গিতের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, যে-সমস্ত প্রতীক ব্যবহার করেছেন, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে মানুষের ঘরসংসার ও দেহমনকেই অবলম্বন করেছে। সর্বোপরি নিরীহ দরিদ্র মানুষের যে-সমস্ত রেখাচিত্র এর মধ্যে ফুটে উঠেছে তার গূঢ়ার্থ যাই হোক, তার মধ্য থেকে বাস্তব মানুষগুলিকে চিনে নিতে বিলম্ব হয় না। ঠিক এই ধরনটি লক্ষ্য করা যাবে পরবর্তী কালের বাউলগানে এবং শাক্তপদে।

তন্ত্রাশ্রিত শাক্তসাধনা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে প্রচলিত থাকলেও তার বাৎসল্য রস ও ভক্তির দিকটি এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সঙ্গীতের আকারে ফুটে উঠেছে। প্রসুপ্ত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলে তাকে সাধকের শিরঃস্থিত সহস্রার-সহস্রদলে অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত করা এবং শিবশক্তির সামরস্যসম্ভূত চিদানন্দময় উপলব্ধি থেকে মোক্ষমুক্তি খুঁজে নেওয়া শাক্ত তন্ত্রের মূল ব্যাপার। এ হচ্ছে একপ্রকার 'কায়াযান'—যা দেহকে অবলম্বন করে দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্ত শ্যামা-সঙ্গীতে রহস্যবাদী ধর্মকৃত্যের চেয়ে, সুখে-দুঃখে-গড়া, স্নেহবেদনাময় বাঙালীর ঘরসংসারের কথাই অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে এবং এর শিল্পরস, আবেগ ও বাস্তববোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীতে মানবচেতনার স্বরূপ কিছু বিচিত্র ধরনের। একথা বলাই বাহুল্য যে, চৈতন্যভাবাদর্শ, বৈষ্ণব পদাবলী, মহাজনজীবনী ও বৈষ্ণব তত্ত্বকাব্যকে দু'ভাগ করে ফেলেছে। 'কাল্ট্' অর্থাৎ গভীর রহস্যবাদী ধর্মসাধনায়-আসক্ত বৈষ্ণবদল-উপদল শ্রীচৈতন্যের পূর্বে দল হিসেবে গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করলে দেখা যাবে, দু'জনের রুচিতে 'আসমান-জমিন ফারাক' থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গীর

মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-সংক্রান্ত পদগুলি বৈষ্ণবসমাজে ভক্তির তুলসীমঞ্জরী বলে শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেছে বটে, কিন্তু একালের পাঠক এই সমস্ত গানে বাস্তব নরনারীর তৃষ্ণাতপ্ত মর্ত্যপিপাসাই উপলব্ধি করতে চাইবেন। বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মতোই কৃতবিদ্য কবি ছিলেন বলে মনে হয়। মানুষের পার্থিব জীবন ও সমাজ-সংসার-সংক্রান্ত নানা অভিজ্ঞতা তাঁরও ছিল। দৃষ্টিভঙ্গী অতিশয় সরস, কৌতুক-ময় ও তির্যক। তাঁর অমার্জিত গ্রামীণ মনোভাব—বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীকে প্রাকৃত জীবনের পটতলেই স্থাপন করেছে। এ কাব্যেও (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) দেখা যাচ্ছে, কোনও অধ্যাত্ম চেতনা বা ধর্মীয় অনুশাসন বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রামীণ চরিত্রগুলির চতুর্দিকে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার জ্যোতির্ময় আবরণ টেনে দেয় নি। এখানে কবি পৌরাণিক আধারে কয়েকটি চরিত্রকে এমন রূপ দিয়েছেন যে, রঙ্গব্যঙ্গ, নিন্দা-বিদ্রূপ এবং আদিরসের ঝাঁঝাল গৌড়ী সুরা রাধাচন্দ্রাবলী ও কাহ্নকে একালের দধিমন্থন-ধ্বনিঝঙ্কৃত গোপপল্লীতে এনে ফেলেছে। যদিও এ কাব্যের মানুষগুলি খুব একটা মহৎ বা বিস্ময়কর নয়, তবু তারা গ্রাম্য সরলতা ও অনাবৃতভাবের স্থূলতা দিয়ে পুরোপুরি বাস্তব মানুষের আকার ধারণ করেছে। এককালের শ্রোতৃসমাজ এই ঝুমুর ধরনের কাব্যকাহিনী থেকে বোধ হয় বাস্তব মানুষের ছবি দেখতে ভালোবাসত। কবিও তাই পুরাণকে লোকজীবনের কাছাকাছি এনে ফেলেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে নাথযোগীদের কথা উঠতে পারে। শিব যাঁদের পরম গুরু, শিবত্ব কামনা কিন্তু তাঁদের সাধনার মূল অঙ্গ নয়। তাঁরা আত্মা-বাদী। অপাপবিদ্ধ আত্মার সাধনাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। কায়া-সাধনার কথা তাঁরা গানে, ছড়ায় ও আখ্যানে বলেছেন। এর অর্থ—প্রাকৃতকায়া বা পিণ্ডদেহকে মন্থন করে যোগসিদ্ধ দেহ লাভ করা এবং ভৌতদেহের মধ্যেই মোক্ষ সন্ধান। একদা রসেশ্বর সাধনাও দেহের সাধনা ছিল, অর্থাৎ অপরিণামী ও অবিকারী নিত্য সত্তার সন্ধান। তাই নাথপন্থ যোগীরা ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে আদৌ ব্যাকুল হন নি; তাঁদের কাছে

হর-পার্বতী পার্থিব মানুষেরই মতো, কেবল কিছু অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। নাথযোগীদের কায়াসাধনা জৈবদেহ উত্তরণের সাধনা। তবু তাঁদের দৃষ্টি প্রাকৃত জগতে নিবদ্ধ, দেবদেবীরাও তাঁদের চোখে প্রকৃতিপরবশ। দেহভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড আছে বলে দেহকে এঁরা স্বীকার করেছেন দেহাতীত হবার জন্য।

একথা ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ভাষা, ভাবভঙ্গী, রূপকল্প ও আবেগের দিক থেকে চৈতন্যপ্রভাব মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। তবু একথা মানতে হবে, বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্যজীবনকাব্যে ঠিক যেন পরিচিত জীবনের প্রত্যক্ষ রূপটি যথেষ্ট পরিস্ফুট হতে পারে নি—চৈতন্য-ভাবাবেগের বন্যায় ভৌম-বৃন্দাবন ও ভাব-বৃন্দাবনের পার্থক্য ঘুচে গেছে। তবে এই প্রসঙ্গে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ এবং মঙ্গলকাব্য-গুলির কথা মনে পড়বে।

বাংলার জলবায়ুতে পৌরাণিক মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থের শুধু আকার-আয়তনই বদলায় নি, তার মধ্যে যে-সব চরিত্র আছে, এবং তা থেকে যে ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে, তা ঠিক পৌরাণিক গল্প-কাহিনী ও নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির পুরোপুরি অনুসরণ করে নি। অদৃষ্টবাদ, ঈশ্বরভক্তি, কর্মের আমোঘতা প্রভৃতি পুরাতন নীতি-আদর্শ পৌরাণিক গ্রন্থের বাংলা ভাবানুবাদে সুলভ হলেও বাংলা কাব্যের চরিত্রগুলি কোন কোন দিক থেকে বাঙালী হয়ে পড়েছে এবং দেশকালের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বাংলা রামায়ণে যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে আছে নৈষ্কর্ম্য, বৈরাগ্য ও শান্তির বাণী, আর আছে অদৃষ্টের অনিবার্যতা—সর্বশেষে নাম-ভক্তি। পুরাণকেন্দ্রিক প্রাচীন গ্রন্থের কৃষ্ণবাসুদেব বাঙালীর ভাগবত অনুবাদে শুধু ভক্তের ভগবান এবং গোপীজনবল্লভে পরিণত হয়েছেন। মানবচেতনা পুরোপুরি অধ্যাত্মসংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে জীবন ও সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে। কারণ যে-কোন অধ্যাত্মচেতনা অসংখ্য বহুর মধ্যে পরম 'এক'-কে সন্ধান করে। চাঞ্চল্যের স্থানে স্থৈর্য,

চলিষ্ণুতার স্থানে সহিষ্ণুতা—এগুলি অধ্যাত্মচেতনার লক্ষণ। মধ্যযুগীয় অনুবাদ-কাব্যে এই লক্ষণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য সমকালীন বাংলাদেশের অন্তর্ভাবনা রাম, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ—এঁদের মধ্যেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যাবে। অনুবাদ কাব্যের চারিদিকেও স্থানকালেরই বিশেষ প্রভাব পড়েছে। কৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে বিশেষ ধরনের অধ্যাত্ম-সংস্কার গড়ে উঠলেও রাম ও মহাভারতীয় মহৎ চরিত্রাদিকে কেন্দ্র করে কোন 'কাল্ট', বা উপধর্মসম্প্রদায় এদেশে বড়ো একটা প্রাধান্য পায় নি। রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্র তাই অধ্যাত্মভাব ভাবনা-মিশ্রিত না হয়ে তৎকালীন বাঙালী-জীবনকে কেন্দ্র করেছে।

৪

মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ইতিহাসকে নানাদিক থেকে তাৎপর্যময় করে তুলেছে। বস্তুতঃ অধিকাংশ মঙ্গলকাব্য কাব্য নয়; এগুলি বাংলায় লেখা ছন্দে-গ্রথিত 'পুরাণ' গ্রন্থ। এতে সংস্কৃত পুরাণের মতোই লৌকিক-অলৌকিক কথা-কাহিনী ও মানসিকতা স্থান পেয়েছে। 'কাল্ট'-বা উপধর্মসম্প্রদায়ের মনোভাব এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করলেও এর পশ্চাদ্‌পটে কোনও গভীর অধ্যাত্মসাধনা নেই। ভক্ত কবিরা ইষ্টদেবতার গৌরব প্রচারের জন্য কাহিনীকাব্য ফেঁদেছেন। এতে পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্র থাকলেও তাঁদের অনেকেই পৌরাণিক নন এবং নন বলেই সমস্ত ঘটনা-কাহিনী-চরিত্রের মধ্যে স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী মানববোধের চিহ্ন পাওয়া যাবে। অবশ্য অধিকাংশ চরিত্রই অতিপরিচয়ের জন্য কিছুটা নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ। কিন্তু তা হলেও চরিত্রগুলির মধ্যে প্রতিদিনের পরিচিত মানুষকেই নানা নামরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সমস্ত লৌকিক পুরাণকাব্যে একমাত্র চাঁদসদাগর ছাড়া আর কোন চরিত্র তির্যকতা লাভ করতে পারে নি। মহৎ ট্র্যাজেডির নায়ক হতে গিয়ে চাঁদসদাগর শেষ পর্যন্ত

যাত্রাগানের কুশীলব হয়ে পড়েছেন। তাঁর চরিত্রকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের মানসিকতার একটি দুর্লভ মানব-প্রতীক সৃষ্টি হতে পারত— যে-মানুষ অদৃষ্টের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় বারবার পরাভূত হয়, কিন্তু দৈবের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চায় না। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিরা ছিলেন সাধারণ চেতনায় লালিত, শ্রোতারা ছিল স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বর্ণপরিচয়-জ্ঞানবর্জিত। রাজনৈতিক কারণের জন্য তাদের ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যেত মাত্রাধিক পরিমাণে। অনেক বিরোধের পর চাঁদসদাগরের মনসাভক্ত হওয়া সেকালের শ্রোতৃসমাজের কাছে খুবই যুক্তিসম্মত মনে হয়েছিল। লেখক, পাঠক এবং শ্রোতৃসমাজ—কেউই বিশাল জীবনবোধের উচ্চসীমা স্পর্শ করতে পারেন নি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যও, সুবৃহৎ কলেবর সত্ত্বেও—শিল্পসম্মত ঊর্ধ্বায়ন লাভ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যযুগে একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্য-জীবনীকাব্য ছাড়া সাহিত্যের আর কোন বিভাগে বিশেষ কোন পরিশীলিত মনের সন্ধান পাওয়া যায় না। একথা একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলতে হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্যতার অবসান হয় নি। বোধকরি ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম সাহিত্যকে উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছেন। অবশ্য কোন গভীর প্রত্যয় তাঁর কাব্যেও সুলভ নয়। কেবল ধর্মমত-সংক্রান্ত উদার অসাম্প্রদায়িক অভিমত এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইতিহাস-চেতনার জন্য তিনি প্রশংসার পাত্র। সে যাই হোক, দেবতাবেশী প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারী শক্তির রুষ্টি-তুষ্টির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ মঙ্গলকাব্যের মানবচেতনাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে নি। আমাদের অনুমান, উপযুক্ত কবির হাতে পড়লে এবং তাঁর চারিদিকে মার্জিত পাঠকসমাজ থাকলে হয়তো কোন কোন মঙ্গলকাব্যে নরনারীর চরিত্রগুলি বিশেষ মানবসত্তারূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। কিন্তু ইষ্টদেবতার ভৌগোলিক সীমানা-বর্ধন যেখানে লেখক, পাঠক ও শ্রোতার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় নিষ্প্রভ হবেই। বিজয়গুপ্তের স্বপ্নাদেশ লাভ, মুকুন্দরামের ভিটা

ছাড়ার দুঃখ, ক্ষেমানন্দের বাস্তব জীবনচিত্র ইত্যাদি ব্যাপার কোনও প্রকারেই রসিক পাঠকের শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় আকর্ষণ করতে পারে না। তবে মঙ্গলকাব্যের অন্তরালে ছায়াধূসর অতীত জীবনের কিছু জীবন্ত ছবি আছে, যার মধ্যে প্রত্নযুগের আদিম কৌমজীবনের ইঙ্গিতও মিলতে পারে। দু'-একটি উচ্চতর ভাবকল্পনাও নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নয়। পাতিব্রত্যকে গৌরব দেবার জন্য নারীর স্বেচ্ছা-নির্যাতন (বেহুলা), সন্তানলাভের জন্য জননীর দুশ্চর তপস্যা (রঞ্জাবতী), বীরপুরুষের শারীরিক ও নৈতিক বলবীর্য (লাউসেন)—এইসব বৈশিষ্ট্য কখনও কখনও মানবধর্মে মণ্ডিত হয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। কিন্তু তার পরিমাণ অল্পই। মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ চরিত্রের মানবমহিমা অতি অল্পক্ষেত্রেই শিল্পের গৌরবে পরিণত হয়েছে। অবশ্য মধ্যযুগের জীবন, সমাজ ও মানবচিত্তের ধাতু-প্রকৃতি বিচার করলে এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না। সেজন্য নারায়ণদেব, মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্রকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

৫

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান কবিরা হিন্দু কবিদের মতোই কাব্যের প্রকাশভঙ্গী হিসেবে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বাঙালীর নিজস্ব সুরেলা ছন্দই বেছে নিলেন, কেউ কেউ ধর্মীয় প্রেরণার বশে ইসলামি গল্পকাহিনী বাংলা ভাষায় লিখলেন—এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজ। কিন্তু একথাও মানতে হবে, ইসলামি রোমান্টিক প্রেমের কিস্সা-কাহিনী অবলম্বন করে তাঁরা পুরাতন বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করেছিলেন। অবশ্য সে সমস্ত আখ্যানের অন্তরালেও মর্ত্যপ্রেমের বদলে সূফীসাধনার রূপক-প্রতীকও গৃহীত হয়েছিল। সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ পলাণ্ডুসংস্পর্শ বাঁচাবার মনোভাব নিয়ে মুসলমান লেখকদের রচনার প্রতি কৌতূহল দেখাবার প্রয়োজন বোধ

করতেন না। কারণ তখন পুরাণ-মানা হিন্দু ও ইসলামি তমদ্দুন-মানা মুসলমান সমাজের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। উচ্চ অভিজাত হিন্দু-মুসলমান, অর্থাৎ যাঁরা পুরাণ-স্মৃতি ও কোরান-হাদিসের দ্বারা দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করতেন, তাঁরা কখনও একে অপরের কাছে আসতে পারেন নি। বাধা ঘটিয়েছিল কৃত্যমূলক ধর্মাচরণের দুরপনেয় বেষ্টনী। অপরদিকে সূফীসাধনার রাগানুগা ধারা মুসলিম সমাজের একপ্রান্তে সুগোপনে বয়ে চলছিল—এই সাধনমার্গ বিশুদ্ধ ইসলামি আদর্শ রক্ষা করে চলত না। হিন্দুসমাজেও দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য-প্রভাবের ভাঁটার যুগে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) সহজিয়া মতের (ভাঙাচোরা তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের অবশেষ) সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের রাগাত্মিকা সাধনার মিশ্রণ ঘটিয়ে যে উপসম্প্রদায় গড়ে তুললেন তাঁরা সমাজে ও সাহিত্যে বৈষ্ণব সহজিয়া নামে পরিচিত। তাঁরাই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে হলেন আউল-বাউল সম্প্রদায়। তাঁরা আত্মার স্বরূপ সন্ধান করেছেন দেহের আধারেই। এই ধরনের দেহবাদী অধ্যাত্ম সাধনায় প্রায়শই যৌনপ্রতীকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সেইজন্য এঁরা হিন্দুসমাজে অবজ্ঞেয় হয়েছেন। জাত-পাঁত না মানার জন্য স্মার্ত হিন্দুসমাজের দ্বার তাঁদের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আচার-আচরণের দিক থেকে সহজিয়া বৈষ্ণবেরা সূফী-সাধকদের নিকট-আত্মীয়। ক্রমে সূফীমতের ভগ্নাংশ এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের রাগাত্মিকা সাধনার টুকরো-টাকরা মিশিয়ে নানা উপধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা দিল —তাদেরই চলতি কথায় বলা হয় আউল-বাউল। বাউলের দেহতত্ত্বঘটিত গান অদীক্ষিতের পক্ষে দুর্বোধ্য হলেও, এই সমস্ত গানেই মানবচেতনার একটি অনাস্বাদিতপূর্ব স্বরূপ ধরা পড়েছে। যে-মানুষের স্থানকাল নেই, যাদের চিত্তবৃত্তির মূলে শাস্ত্র নেই, মন্ত্রতন্ত্র নেই, রোজা-নমাজ-জাকাত নেই—আছে দেহভাণ্ডকে চিদানন্দময় ভাগবত তনুতে রূপান্তরিত করার দুশ্চর সাধনা এবং সেই তপঃসাধনার মধ্য দিয়ে 'মনের মানুষ'-কে বোধির পিঞ্জরে পুরবার ঐকান্তিক অভিলাষ,—আউল-বাউল দরবেশের সাধ্য-

সাধনার মধ্যে সেই ভাবগূঢ় মানবচেতনার ধারাটি এক আশ্চর্য মহিমা লাভ করেছে। মধ্যযুগীয় উপান্তভূমিতে এর আবির্ভাব হয়েছে অভিজাত সমাজের বাইরে। শাস্ত্রযাজী হিন্দুসমাজ এই 'উল্টা রীতি'কে ঘৃণা করেছে, বিশুদ্ধ 'সরা'পন্থী মুসলমানসমাজের মওলানা-উলেমা এই 'বেসরা'পন্থী সাধনাকে কখনই ইসলামি তমদ্দুন্ বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। তবু, সুগোপনচারী শারীরবৃত্তের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, এই সম্প্রদায়ের গানের মধ্যে মানুষের সমাজ-সম্প্রদায়হীন চেতনার আত্মস্বরূপটি প্রকাশিত হতে পেরেছে, এবং সেই প্রকাশ অশিক্ষিত কবির কণ্ঠেও সূক্ষ্ম রোমান্টিক চারুত্ব সৃষ্টি করেছে—বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যার বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের বাঙালীসমাজ কখনও রাজ্য হানাহানির দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে, কখনও আধিব্যাধি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে নীরবে মারা গেছে, কখনও মুকুন্দরাম এবং কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষের মতো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। দুর্দান্ত রাজনৈতিক উৎপীড়নে সেকালের বাঙালী ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারে নি—বিদ্রোহ, বিরোধিতা, বাধাপ্রদান, প্রতিবাদ এসব তো কল্পনাতীত। এই পটভূমিকায় দৈবের উপর একান্ত নির্ভরতা পরাভূত ও আশাহত মানুষকে কোনও প্রকারে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস প্রধানতঃ সুলতান, নবাব, সুবাদার, রাজা, জমিদার, ভুঁইয়াদের ইতিহাস—তাঁদের বংশলতিকা, জয়পরাজয়, হিংসা প্রতিহিংসার তালিকা মাত্র। বাঙালীর যথার্থ ইতিহাস কোথায়? সে ইতিহাস ইতিহাসে নেই, আছে গলিতপ্রায় বাংলা পুঁথির মধ্যে। এ সমস্ত পুঁথির অতি সামান্যই মুদ্রিত হয়েছে। এখনও হাজার হাজার পুঁথির কোনও পরিচয়ই নেওয়া হয় নি। এরই মধ্যে বাঙালী চেতনার যথার্থ স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই সমস্ত পুঁথি থেকে বোঝা যাবে, দেবপ্রভাবের দ্বারা মধ্যযুগীয় বাঙালীসমাজ আচ্ছন্ন হলেও মানুষের পার্থিব জীবনের

প্রতি এ জাতির একটা নিবিড় আকর্ষণ ছিল। এর প্রকৃত কারণ অনুধাবন করা দুরূহ। এর জন্য বাঙালীর তান্ত্রিক সংস্কার দায়ী কিনা সমাজতাত্ত্বিকগণ তার বিচার করবেন। নাথপন্থদের 'কায়াসাধনা', সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' তত্ত্ব, বাউলের 'অচিন পাখি' প্রভৃতি প্রতীকের অন্তরালে নিশ্চয় সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় নিহিত আছে। কিন্তু দেহকেই তাঁরা সাধ্যসাধনার মূলকেন্দ্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, পরিচিত জীবনের আধারেই লোকোত্তর জীবনকে অবধারণ করতে চেয়েছিলেন।

একালে যাকে আমরা মানবচেতনা বলি, অর্থাৎ মানুষের পার্থিব জীবনের প্রতি বিস্ময়রসাবিষ্ট কৌতূহল—মধ্যযুগীয় ভাগবতচেতনার অন্তরালেও এই ভাবটি সূক্ষ্ম বীজাকারে বর্তমান ছিল। তাই উনবিংশ শতকে পশ্চিম থেকে ভেসে-আসা ইহকেন্দ্রিক জীবনবাদী চেতনা যখন বাঙালীর মধ্যযুগীয় স্বপ্নভঙ্গ করল, তখন তাকে বাঙালীসমাজ অনাত্মীয় বলে ফিরিয়ে দেয় নি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে নব্য বাঙালী নতুন জীবনরস খুঁজে পেল। সেদিন কেউ অনুমান করতে পারে নি, উপলব্ধির এই অভিনবত্ব বাঙালীর নিজস্ব কুলধর্মের বাইরের ব্যাপার নয়, এর শিকড় মধ্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কার বাঙালীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যাপার হলে তার প্রভাবে এদেশে একটি কৃত্রিম ক্ষীণপ্রাণ ইঙ্গ-বঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি হত, তার দ্বারা এ জাতির সমগ্র অধিমানস এত আলোকিত হতে পারত না। (মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চিতাভস্ম থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ফিনিকস্ পাখি নবকলেবর নিয়ে বেরিয়ে এসেছে—একথা বললে উপহসিত হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙালীসমাজের কাঠামো, ইতিহাস, দার্শনিক প্রত্যয় ও কাব্যকাহিনীর অন্তর্লোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেটি হচ্ছে—সেকালের সঙ্গে একালের সেতু রচিত হয়েছে মানববোধের মারফতে। ইংরেজ আমলে বাঙালীর সমাজ ও মনের

বহিরঙ্গগত অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের চিত্তপ্রবাহের সঙ্গে একালের মানসিকতার গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সে পরিচয়টি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য থেকে সর্বাগ্রে খুঁজে নিতে হবে।

বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনোভূমি

প্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতক

১. সাহিত্য-শিল্পকলা, বস্তুজগৎ ও মনঃপ্রকৃতির সম্পর্ক

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্য, চারুশিল্প, সংগীতাদি চতুঃষষ্ঠিকলার প্রত্যেকটি মূলতঃ মানসসৃষ্টি। অবশ্য বস্তুতন্মাত্রের সঙ্গে মনের সম্পৃক্তি ঘটলেই তবে সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্ভব হয়। যে-মন দর্শনশাস্ত্রে *tabula rasa*, শিল্পের জগতে তাই বিচিত্র বর্ণরেখাময় হয়ে ওঠে। তত্ত্বদর্শনে বস্তুসংস্পর্শহীন চেতনাপ্রবাহ মোক্ষপথের অববাহিকা ধরে বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য নিরবয়ব লোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। শিল্পের জগতে বস্তুপ্রতীতি শিল্পসত্তার প্রধান উপাদান-কারণ। কিন্তু মর্মর প্রস্তরের পিণ্ডত্ব যেমন তাজমহল নয়, পিণ্ডত্বকে সুষম শিল্পে পরিণত করাই যেমন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য, তেমনি বস্তুপ্রত্যয়ই শিল্পের একমাত্র মাপকাঠি নয়। স্রষ্টার সত্ত্বগুণান্বিত যে-মন, সেই মনের সঙ্গে বস্তুপ্রত্যয়ের সংস্পর্শজনিত চিদানন্দময় অনুভূতি শিল্পতত্ত্বের গোড়ার কথা—শেষ কথাও বলতে পারি। সূক্ষ্ম সুকুমার আনন্দানুভূতি শিল্প ও সাহিত্যের যে চূড়ান্ত ফলশ্রুতি, একথা উপযোগবাদীরা না মানলেও রসিক মন অস্বীকার করতে পারবে না। ব্যাধি দেহ থেকে দেহে সংক্রামিত হয়। 'ফলং মড়কং'। শিল্প-সাহিত্যের আনন্দ একমন থেকে অপর মনে

সঞ্চারিত হয়। ফল—'অখণ্ড-স্বপ্রাশানন্দচিন্ময়ঃ। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ'—অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দময়, চিৎস্বরূপ, অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং ব্রহ্মাস্বাদসদৃশ রসোৎপত্তি ও রসাস্বাদন। ব্যাধি দেহকে মারে, ফলে দেহের মধ্যে বন্দী মনেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শিল্পের আনন্দ স্থূল মনকে মারে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বীজরূপী অপর মনকে জাগিয়ে তোলে। এককথায়—লৌকিক ভাববস্তুকে অলৌকিক রসবস্তুতে পরিণত করাই শিল্পতত্ত্বের শেষ কথা। সৌন্দর্যসৃষ্টি, নীতিপ্রচার, শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার-প্রস্তুতি—সাহিত্য-শিল্পকলার উদ্দেশ্য নিয়ে নানাযুগে নানা প্রশ্ন উঠেছে। যুগ বদলে গেছে, শিল্প-জিজ্ঞাসারও বদল হয়েছে, উত্তরেরও বদল হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের ইঙ্গিতবাহী ব্যঞ্জনাতত্ত্ব এবং আনন্দময় রসতত্ত্বকে স্থানচ্যুত করবার মতো কোনো শিল্পতত্ত্ব এখনও পশ্চিম-বিশ্বে উদ্ভাবিত হয় নি।

মন নামক ব্যক্তিটি, যিনি দর্শনে হয়েছেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', mindstuff, তিনিই শিল্পের জগতে হয়েছেন সহস্রলোচন; কিন্তু 'সকল খেলা আপন মনে' হলেও একমাত্র 'আত্মারাম' ভিন্ন শুধু মন নিয়ে কে খুশি থাকতে পারে? মনের চারিদিকে যে বাস্তব বাতাবরণ রয়েছে, তাকে শাস্ত্রবাদীরা যতই 'নেতি' বলুন না কেন, শোপেনহাওয়ার এই মায়াবিনীকে যতই অভিসম্পাত দিন না কেন, আসলে এই বস্তুর মায়াপুরীই শিল্পের প্রধান ভিত্তি। মনের চারিদিকে যে বস্তুমণ্ডল রয়েছে—তার সমাজ, ইতিহাস, প্রতিবেশ—এগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মনকে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতে উন্মুখ করে তোলে। অতএব সাহিত্যালোচনায় বস্তুজগৎকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাহিত্যের ইতিহাস দেশ ও কালপ্রবাহকে অবলম্বন করেই নানাপথে ধাবিত হয়। সেকথা প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের হিসেব নিলেই বোঝা যাবে।

২. পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি

বাঙালী-জীবনের মূলস্বরূপ পুরাতত্ত্ব-পুরাকীর্তির মধ্যে নেই, আর্দ্র মাটির দেশে কোনো স্থাবর কীর্তিই স্থাণু হয়ে থাকতে পারে না। ফলে যে সমস্ত প্রস্তরসাক্ষী কালান্তরের বুকেও অম্লান হয়ে থাকে, বাংলা দেশে তার একান্ত অভাব। এখানে পোড়ামাটির টেরাকোটা অচিরে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, ইটের মন্দিরের ফাটল দিয়ে নিজ আবির্ভাব ঘোষণা করে ন্যগ্রোধ শিশু। কিন্তু পুঁথি-আশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর যথার্থ পরিচয় প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। জলবায়ু ও কীটপতঙ্গের হাত এড়িয়ে যে সমস্ত পুরাতন পুঁথি হস্তগত হয়েছে, তার গলিত তুলোট কাগজের মধ্যেই পুরাতন বাংলার দেশ ও কালের যথার্থ পরিচয় লুকিয়ে আছে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অর্থাৎ শাসক-বংশের মোটামুটি একটা খসড়া পাওয়া যায়, যদিও সে-সব কাহিনীতে রাজন্যবর্গের হানাহানি ব্যতীত (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়— 'খিচুড়ি ভোজনের ইতিহাস') তাতে বাঙালীর যথার্থ ইতিহাস, তার অন্তরঙ্গ জীবনের কথা অতি অল্পই ফুটেছে। কিন্তু পুরাতন বাংলা সাহিত্যেই বাঙালীর প্রকৃত ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়েছে। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ছয়ের দশক পর্যন্ত পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক কালসীমা। এই কালসীমার মধ্যেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গৌড়বঙ্গের ঐতিহ্য-জীবনের যা কিছু বিকাশ হয়েছে।

এই আট শ' বছরের বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় নিলে দেখা যাবে, নানাধরনের ভক্তিবাদ ও ঈশ্বরচেতনা এ সাহিত্যের মূল প্রেরণা। নদী এ দেশের মাতা; বিভিন্ন দেবদেবী পুরাতন বাংলা সাহিত্যের জনক-জননী স্থানীয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে-উপসম্প্রদায়ে মিলে পুরাতনে বাংলা সাহিত্যের সবকিছু কুক্ষিগত করেছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধ, শৈব নাথযোগী, বৈষ্ণব ভক্ত (আচারী ও রাগানুগা), শাক্ত, (মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী), পৌরাণিক সাহিত্যের ছাঁদে গড়ে-ওঠা রাম-

কৃষ্ণাদি কেন্দ্রিক ভক্তসম্প্রদায়, পরবর্তী কালের আউল-বাউল-সাঁই-সহজিয়া-মারফতী-মুর্শিদা গানের স্রষ্টারা—এঁরা সকলেই কোনো না-কোনো প্রকার ঈশ্বরচেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের কলেবর পরিপুষ্ট করেছিলেন। ঈশ্বরচেতনা ও ভক্তিভাব সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য হলে সাহিত্যের বৈচিত্র্যের হানি হয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন,—"একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো একতারে বাঁধা ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" তাঁর এ মন্তব্য পুরাতন বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণে অতিশয় যুক্তিযুক্ত। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে অর্থহীন পুচ্ছগ্রাহিতা, পুরাতনের অক্ষম ও অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি—যা একালের নবীন পাঠকের চিত্তে শুধু বিরক্তি সঞ্চারিত করে, এর মূল কারণ—বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্তিতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-সাধনা সে-যুগের সাহিত্যের একমাত্র নিয়ামক শক্তি হয়েছিল। ঈশ্বর যখন শুধু সাধনভজনের বিষয়, তখন পন্থার বৈচিত্র্য বা নবত্বের দিকে কবি ও পাঠক-শ্রোতার বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। পয়ার-লাচাড়ীর ঘুমপাড়ানি সুরে, চণ্ডীমণ্ডপের ধূমান্ধকার পরিবেশে এবং কাংস্য-করতাল-মুখরিত দেবমন্দিরে ও 'থানে' সাহিত্যের অবাধ প্রবেশ ঘটেছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বরব্যতিরিক্ত বিশেষ কোনো স্বয়ং-স্বতন্ত্র শিল্পবোধ বা সাহিত্যবাসনা মধ্যযুগের কবিদের সচেতন করে নি। দেশের ওপর দিয়ে কত না ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। গৌড়-রাজমহল-তাঁড়া-জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা)-মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের অগ্নি ধূমায়িত হয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহে সাধারণ মানুষ কত বিপন্ন হয়েছে—মানুষের সেই দুঃখদুর্গতির কথা, বাস্তব জীবনের ছবি, ঐতিহাসিক কালের বিবরণী, ঐ যুগের সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায় নি। বাস্তবের প্রতি ঔদাসীন্য,

প্রত্যক্ষের প্রতি বীতরাগ এবং মানুষের প্রতি কৌতূহলের অভাব মধ্যযুগের দেবকৃপানির্ভর বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে বৈচিত্র্যরস সঞ্চার করতে সর্বদা সক্ষম হয় নি। তাতার-তুর্কী-হাবসী-পাঠান-মুঘল, ওলন্দাজ-দিনেমার-পর্তুগীজের লণ্ডভণ্ড সত্ত্বেও বাঙালী-নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে দেবকৃপা-গীতি গেয়ে গেছে, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কাছে ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রার্থনা করেছে, বৈষ্ণব শাক্ত বাউল গীতিকায় এরা কখনও রাধাভাবে কখনও সখীভাবে রসসাধনা করেছে, কখনও আদ্যাশক্তির অঞ্চলতল আশ্রয় করে 'যারে শমন, যারে ফিরি' বলে মৃত্যুর জগতে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা করেছে, কখনও বা 'মনের মানুষ' ও 'অচিন পাখি'র সন্ধানে একতারাটি মাত্র সম্বল করে পথে নেমেছে। কিন্তু এই দেবদেবীর শোভাযাত্রা ও সাধ্যসাধনের জগতে মানুষ কোথায়?

কথাটা আর একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। অতি প্রাচীন কাল থেকে পূর্বভারত তন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত। তন্ত্রের সূক্ষ্ম সাধনা মূলতঃ ভৌম দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত চৈতন্যে উদ্ধর্তিত হয়। ফলে দেহাশ্রয়ী ধর্মসাধনা—যার অনেকটাই গুহ্যপন্থী ও রহস্যময়, তারই প্রভাবে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ভক্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও, এ সাহিত্যের অন্তরালে মানববোধের অস্তিত্ব সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব-শাক্তপদাবলী পর্যন্ত, মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, কৃত্তিবাস মালাধর থেকে কাশীরাম দাস পর্যন্ত—সর্বত্র পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে। চর্যাগীতিকার অধ্যাত্মমার্গের কথাও মানবীয় প্রেমরসের প্রতীকতা গ্রহণ করেছে, গোরক্ষনাথ বারবার 'কায়া সাধ, কায়া সাধ' বলে যে হুঙ্কার দিয়েছেন, তার সূক্ষ্ম তাৎপর্য হল, একপ্রকার দেহাবলম্বী যোগাচার। তবু কায়া-সাধনার 'কায়া'কে বাঙালী সাধক ও কবিরা ভুলতে পারেন নি। বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহমিলনের সবটাই অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনের কল্পলীলা হলেও তার পশ্চাদপটে রয়েছে বাঙালী-সমাজের নরনারী এবং তাদের প্রেমজীবনের বাস্তব ইঙ্গিত। শাক্তপদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই সমসাময়িক বাঙালী জীবনের পটভূমিকা

স্বীকৃত হয়েছে! মঙ্গলকাব্যের তো কথাই নেই, এর পটভূমিকা ও দেবদেবীর চরিত্রগুলিতে সমকালীন race, milieu, এবং moment-এর স্বাক্ষর আছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদের পিছনেও বাস্তব প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। একদা প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধপ্রভাবের কবল থেকে আর্যসমাজ ও সংস্কৃতিক পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনেই বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ প্রচারিত হয়েছিল। তেমনি বাংলাদেশে মুসলমান শাসন ও ইসলামীয় 'তমদ্দুনে'র প্রচণ্ড আগ্রাসী নীতির কবল থেকে রক্ষা করে হিন্দু সমাজকে নিজ স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠার জন্যই মধ্যযুগে অনুবাদ-সাহিত্যের এতটা প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। বাউল গানের মরমীয়া সাধনায় যে প্রতীক-ব্যঞ্জনা ব্যবহৃত হয়েছে, তাও দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাব্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার পূর্বপ্রত্যন্ত সীমার মুসলমান কবিরা, বোধহয় বাংলায় প্রবাসী হিন্দুস্থানী কবি কুতুবনের 'মৃগাবতী'র আদর্শে মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করেই কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের এই অভিনবত্ব বিজাতীয় বলে হিন্দুসমাজে পরিত্যক্ত হয় নি; কারণ মানববোধের প্রভাব এ জাতির মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কোথাও পরোক্ষভাবে, কোথাও প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মধ্যযুগের দেবকৃপানির্ভর মনোভাব ও সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছিল। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আলমগীর বাদশাহের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে প্রহসন—এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাংলার মধ্যযুগীয় জীবন ও সাধনার চূড়ান্ত বিপর্যয় হল; সদাসন্তুষ্ট গ্রামীণ জীবনেও অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা প্রবেশ করল, বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ শ্মশান হয়ে গেল, বিদেশী বণিকের শোষণে জনসাধারণ সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়ল। এই যুগে লেখা হল গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'। ত্রিপুরার 'রাজমালা' ছেড়ে দিলে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস-কাব্য।

ক্রমে সমসাময়িক যুদ্ধবিগ্রহ, অনাচার, অভাব-অভিযোগে বাংলাদেশ

বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল ; মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার-হুগলী সুতোনুটি-গোবিন্দপুরকে কেন্দ্র করে এক ধরনের বৈশ্যতন্ত্রমূলক নাগরিক জীবন গড়ে উঠল, তারপর থেকে ধীরে ধীরে চণ্ডী-মনসা-ধর্ম প্রভৃতি দেবদেবীরা বিদায় নিলেন, মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিশ্বাসেরও আমূল রূপান্তর শুরু হল। ভারতচন্দ্র পুরাণোক্ত দেবদেবীকে ভাঁড়ামির দ্বারা মলিন করেছেন। কিন্তু তাঁদের দৈবমহিমা অ-ক্ষিত হলেও মানবচরিত্রের ধূলাবালি তাঁদের মর্ত্যের মাটিতে নামিয়ে এনেছে, ভারতচন্দ্রের দেবদেবীদের চরিত্রে তার প্রভাব পড়েছে। পূর্ববঙ্গের নদীনালা হাবড়ে যে-সমস্ত গাথাগীতিকা দৈনন্দিন জীবনের অশ্রুবেদনার ওপরে দাঁড়িয়েছিল, তার প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সংশয়পূর্ণ হলেও তার মধ্যে বাঙালীর ঘরের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আশাভঙ্গের বাস্তব ব্যঞ্জনা কি ভারতচন্দ্রের দু'একটি রুক্ষ উক্তির মধ্যে ফোটে নি, রামপ্রসাদের শাক্তগানেও কি কোনো কোনো স্থলে জীবন সম্পর্কে কবি সাধকের ব্যক্তিগত ইঙ্গিত নেই? ব্যথাহত রামানন্দ ঘোষ, দারুব্রহ্মের সেবক হয়েও, দারিদ্র্য-পীড়িত হয়ে যখন সক্ষোভে বলে ওঠেন ঃ

> দারুব্রহ্ম সেবা করি জেববাব হৈল।
> বৃথাকাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নাহি ভাল॥
> বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
> নিজ কষ্টদায় আর লোক মধ্যে লাজ॥

তখন কি মনে হয় না যে, মানুষের যে-বাস্তবজীবন ও প্রত্যয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল, তাই-ই কালগতিকে ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে রূপক-প্রতীকের অন্তরাল ত্যাগ করে প্রত্যক্ষভাবে বাইরে আসতে চাইছে?

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আদ্যন্ত দেবদেবীর কথায় পূর্ণ হলেও (এখানে ওখানে দেবদেবীর লীলার সঙ্গে মানবীয় ভাবপূর্ণ যে দু'একটি রচনার ইঙ্গিত আছে, তা— গোষ্পদ তুল্য) তার মধ্য দিয়ে যে মানবজীবনের ধারাই নানারূপে বয়ে চলেছে, তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা

যাবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মাঝেমাঝে যেভাবে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে তার ততটা পরিচয় নেই। মধ্যযুগের পাঠান আমলে চলেছিল সামন্ততান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রিক শাসনের মন্দীভূত প্রবাহ; ক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যবাদ এদেশের সংস্কৃতি ও জীবনকে প্রায় গ্রাস করে ফেলল। অবশ্য অন্য প্রদেশ ও সর্বভারতীয় জীবনের সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ ঘটল মূলতঃ মুঘল শাসনের একচ্ছত্র ছায়াতলে এসে। কিন্তু শাসনকার্য প্রধানতঃ ছিল অভিজাত সমাজের ব্যাপার, যুদ্ধবিগ্রহে এই সম্প্রদায়ই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত। গ্রামীণ জীবনের স্বয়ম্ভর সম্পূর্ণতায় গ্রামবাসীরা মোটামুটি খুশি ছিল। মাঝেমাঝে রাজনৈতিক কারণে এই শান্তি বিঘ্নিত হলে তাকে তারা দেবতার অকৃপা বলেই মনে করত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামজীবনে সে বিশৃঙ্খলা প্রবল বিক্ষোভ জাগাতে পারত না। প্রকৃতি ও দৈবের অভিশাপ স্বীকার করা নিয়ে, সুলতান সুবাদারকে সেলাম বাজিয়ে, চণ্ডী মনসার গীত গেয়ে, বৈষ্ণব রসাবেশে মত্ত হয়ে, বাউলের একতারায় দেহতত্ত্বের ব্যঞ্জনা দিয়ে বাঙালীসমাজ মধ্যযুগের উপান্ত-ভূমিতে এসে পড়ল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে বাঙালীর মধ্যযুগ ভেঙে পড়লেও বহু পূর্ব থেকে সে ন্যগ্রোধের মর্মমূলে শ্বেত বল্মীক প্রবেশ করে তার শাখাকাণ্ড, পত্রপল্লব- এমন কি মূলকেও নিঃশেষ করে ফেলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই শাঠ্য-ষড়যন্ত্র অমানুষিকতার অবর্ণনীয় অপঘাত সমগ্র জাতীয় জীবনকেই প্রায় বিনাশের শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, মহামারী, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্মম শোষণে সেই বিশাল বনস্পতি শত শাখাপ্রশাখাবিস্তারী বিপুলতা নিয়েই ভেঙে পড়ল। কলকাতার দূষিত বৈশ্যজীবনকে ঘিরে তখন কবিগানের নাগরালি খুব জমে উঠেছে। মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে শিক্ষা ঐতিহ্য-সাহিত্য-ধর্মসাধনার যে শুভ আদর্শ অনেক দিক থেকে ইসলামি শাসনের নীতিভ্রষ্টতার মধ্যেও বেঁচে ছিল, তার পালাশেষের ঘণ্টাধ্বনি

উঠল। কিন্তু যাত্রাভিনয়ের কুশীলবগণ বিদায় নেবার আগেই নতুন পালাগান আরম্ভ হয়ে গেল। সে যাত্রাগানের পটভূমিকা হল ইংরেজ বণিক-শাসকের কাছ থেকে পাওয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্রদর্শনের বিচিত্র সমারোহ। সে গাওনার 'অধিকারী' হলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বিচিত্র প্রতিভাধর বাঙালী সন্তান।

৩. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি (সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত)— এরই মধ্যে কলকাতার দীনরূপ ঘুচে গিয়ে নতুন জীবন ও ঐতিহ্য জেগে উঠেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব-পণ্ডিত-মুন্সীদের মুষ্টিভিক্ষায় বাঙালীর মন ভরে নি। রামমোহন, হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি প্রভৃতি ব্যক্তি, শিক্ষাকেন্দ্র, ঐতিহ্য এবং সংবাদপত্রের কলমরমরের মধ্য দিয়ে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে, কলকাতার নাগরিক জীবনে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের অনুকূল আদর্শ শিক্ষিত বাঙালীর মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে উন্মুখ। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর কালাপাহাড় শিষ্যসম্প্রদায়ের রণহুংকারের দ্বারা বোঝা গেল মহাভুজঙ্গের তমোনিদ্রা ভাঙ্গছে। রামমোহনপন্থীরা, ডিরোজিওর শিষ্যানুশিষ্যের দল এবং রাধাকান্ত দেববাহাদুরের 'ধর্মসভা'র দলাদলি বিচার করলে উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালী-মনের যথার্থস্বরূপ ধরা যাবে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে নব্যন্যায় বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত আবেগমূলক বৈষ্ণবানুরাগ জনমানসে প্রবল ভাবাতিরেকের সঞ্চার করেছিল।

এমন কি, কোনো কোনো যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক, যাঁরা মীমাংসকদের ব্যঙ্গ করতেন, তাঁরাও শচীনন্দনকে শ্রদ্ধা করতেন, গোপনন্দনের প্রতি প্রণাম জানিয়ে গ্রন্থ বা টীকা-টিপ্পনী রচনায় প্রস্তুত হতেন।* কিন্তু মুসলমান যুগে, বিশেষতঃ মুঘল শাসনের অবক্ষয়ের যুগে বাঙালার নৈয়ায়িক সংস্কার বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়, তার স্থলে ব্রাহ্মসমাজে বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, দ্বৈতবাদী ভাষ্য, তার সঙ্গে স্মৃতিমীমাংসার কিছু আলোচনা এবং পৌরাণিক সংস্কৃতির (প্রাচীন মহাপুরাণ এবং অর্বাচীন উপপুরাণ) ধারা হিন্দুসাজে প্রচলিত হয়। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক চেতনা। রামমোহনের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই হারিয়ে-যাওয়া কুশাগ্রতীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক বদ্ধি আবার জেগে উঠল। বস্তুতঃ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতকেই বুদ্ধির অসাড় ভাব ও যুক্তির মূর্ছা থেকে উদ্ধার করে রামমোহন এদেশে বুদ্ধিমার্গীয় আধুনিকতাকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন। (রাজা রামমোহন সতীদাহপ্রথা বিদূরণে ধৃতাস্ত্র ক্ষত্রিয়ের মতো অগ্রসর হয়েছিলেন, নানাবিধ প্রগতিশীল সমাজসংস্কারে পাশ্চাত্ত্য সমাজনেতৃবৃন্দের মতোই বাস্তববুদ্ধি ও সামাজিক হিতবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, বেদান্ত-উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচারের দ্বারা শাস্ত্রবাদী ব্রাহ্মণদের খুঙ্গিপুঁথির বন্দিশালা থেকে তিনি মোক্ষ-বিদ্যাকে উদ্ধার করেছিলেন- যদিও নিজে মোক্ষাভিলাষী ছিলেন না।) ব্রহ্মবাদকে একেশ্বরবাদ বলে প্রচার করলেও (দুটি কিন্তু এক ব্যাপার নয়) কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সংস্কারপন্থী হন নি। এদেশের মধ্যযুগীয় সন্তসাধক বা য়ুরোপের প্রাক্-রেনেসাঁস খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের ধর্মসাধনা ও কৃত্যের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, তাঁর সেরকম কোনো 'ধর্মীয়' আগ্রহ ছিল না। সমগ্র ভারতের

* 'ষোড়শ শতকের বাংলায় জ্ঞানচর্চা' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা আছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের জন্য তিনি ধর্ম ও সমাজসংস্কারে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। বেদান্ত-উপনিষদ-তন্ত্রের ভক্ত হলেও তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের মোতাজেলা ও মুওয়াহিদ্দিন শাখার অনুরাগী। মিশনারীদের ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টানী মতকে আক্রমণ করলেও তিনি নীতির ক্ষেত্রে খ্রীস্টের নীতি ও উপদেশকে অধিকতর শ্রদ্ধা করতেন। আসলে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, মানবহিতৈষী, সংস্কারকামী। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেন নি। মানুষের জন্যই ধর্ম ও সমাজের প্রয়োজন। মানুষের উপযোগের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রয়োজনস্থলে তার পরিবর্তন অবশ্যকাম্য। এদিক থেকে তিনি প্রাচ্যভুবনের প্রথম 'মর্ডার্ন ম্যান'। আধুনিক মহাগরুড়ের দুটি পক্ষ—একটি যুক্তি, অপরটি মানবতাবাদ। রামমোহন এই দুই পক্ষে ভর করে পৌরাণিক বৈনতেয়ের মতো জ্ঞানলোক থেকে অমৃতকুম্ভ সংগ্রহ করেছিলেন, আলোকভিক্ষু মানুষের জন্য প্রমিথ্যুসের মতো তিনি তমোহর অগ্নি চয়ন করেছিলেন। পরবর্তী কালের বাঙালী যা হতে চেয়েছিল, রামমোহনের মধ্য দিয়ে তার পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে।

মানুষের যে-ঐহিকতা যুক্তিনির্ভর, রামমোহনের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলকথা হল সেই আধুনিক, বৈজ্ঞানিক, উপযোগবাদী মানবতা। তাঁর শিক্ষা ধর্ম সমাজ সংস্কারের মূলকথাও এই ঐহিকতা। একেশ্বরবাদী তত্ত্বে তিনি এতটা উৎসাহী হয়েছিলেন কেন? একেশ্বরবাদে বিশ্বাস হলে, এক ব্রহ্মের উপাসক হলে তবেই, জাতি-সম্প্রদায়-শ্রেণীতে বিভক্ত ও অনৈক্যের বিষে জর্জরিত ভারতীয় সমাজ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তা হলেই রাজনৈতিক ঐক্য অনায়াসে আয়ত্তে আসবে। সুতরাং স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন বা রেচক-পূরক-কুম্ভকের ক্রিয়াকর্ম এই কঠোর কর্মযোগী ও অতন্দ্র মানবহিতবাদীর রুচিকর ছিল না, একথা তাঁর ইংরেজি ও বাংলা রচনা থেকেই বোঝা যাবে। উনিশ শতকের প্রথম উজ্জীবনমন্ত্র তিনিই প্রথম উচ্চারণ করলেন। যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ 'অভিজ্ঞা'র দ্বারা মানুষের ইতিহাসকে বুঝে নেওয়া, বাস্তব বিশ্বসকে ছায়া-মায়া

না বলে তার প্রতীতিগত বস্তুসত্তা অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া—এককথায় মানুষের বাস্তব জীবনকে পরমগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রামমোহনের প্রধান কর্ম ও সাধনা।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই দেখা যাচ্ছে, দেশীয় মিশনারী সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাদিতে রাজনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক ব্যাপার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বাঙালীর মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যাবতীয় রহস্যের সমাধান করতে হবে, প্রতিক্ষেত্রে জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন —হোক তা বায়বীয় বৃথা আস্ফালন, তবু তাকেই জীবনে জয়মাল্য দিতে হবে। ডিরোজিওর শিষ্যের দল যে-কোনো ঐশ্বরিক চেতনা ও প্রাচীন ভারতীয় ট্রাডিশনে, বিশেষতঃ সনাতন হিন্দুধর্মে ঘোরতর-অবিশ্বাসী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আন্দোলন ও আক্রমণ ডন-কুইক্সোটের মতোই হাস্যকর হয়েছিল। তবু তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গলেরা'—হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তারুণ্যের রক্ত পতাকায় ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার-ঘোষণাপত্র, টমাস পেনের *The Age of Reason* এবং অ্যাডাম স্মিথের *The Wealth of Nations*-এর সূত্র উল্লেখ করে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা পৌগণ্ডের সীমা পার হতে না হতেই দশম দশায় পৌঁছে গিয়েছিল তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এঁরা যে পুরাতন গলিত সংস্কারকে নস্যাৎ করে নবজীবনের জয়ধ্বনি করেছিলেন, তার রুশো-সুলভ বালকোচিত উচ্ছ্বাস বাদ দিলে তাঁদের ক্রিয়াকর্ম ও ভাবাদর্শকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। জর্জ টমসনের নির্দেশে এঁরা, বিশেষতঃ এঁদের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ এদেশে আন্দোলনমূলক রাজনৈতিক আচরণের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এঁদের কেউ কেউ শাসক ইংরেজের সুকঠোর সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

রামমোহনপন্থী ও ডিরোজিওপন্থীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'ধর্মসভা'র দল (রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার কর্ণধার

ছিলেন) দক্ষিণে ও বামে, রামমোহন ও 'ইয়ংবেঙ্গল'দের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং তথাকথিত সনাতন ভারতবর্ষের মহিমা প্রচার করে যা কিছু প্রাক্তন তাকেই একমাত্র শরণ্য বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ইতিমধ্যে বিদেশে রামমোহনের দেহান্ত হল। বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের কর্ম ও সাধনা আলোচনা করলে নবযুগের প্রভাবে বাঙালী-চেতনার স্বরূপ বোঝা যাবে।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মারফতে দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের অপূর্ণ কর্মকে পূর্ণতর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার বৈদিক সাহিত্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ এবং দেশ-সমাজহিতৈষণার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। ডাফ সাহেব প্রভৃতি মিশনারীদের ধর্মান্তরাকরণের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে তিনি অন্যান্য হিন্দুসম্প্রদায়ের সহায়তায় বাঙালী সমাজের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করেছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন শান্তরসের ভক্ত। বৈষ্ণব দ্বৈতভাবের সঙ্গে তাঁর ভক্তিসাধনার বেশ মিল দেখা যায়। অবশ্য বৈষ্ণবগণ কান্তাপ্রেমের মধ্য দিয়ে রসসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পিতা-পুত্রের বাৎসল্যরসের (উপনিষদের প্রভাবে) মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরানুরক্তি তাঁর আত্মার অত্যাজ্য ধর্মে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ভক্ত হলেও তিনি উনিশ শতকের ভাববলয়ের বাইরে যেতে পারেন নি। আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানাত্মক প্রত্যভিজ্ঞাই ছিল তাঁর অন্বেষ্টব্য। তাই উপনিষদের স্তন্যরসে লালিত হলেও তিনি উপনিষদের সমস্ত বাক্যকেই শিরোধার্য করতে পারলেন না। উপনিষদের যে বাক্যগুলির সঙ্গে তাঁর মনের মিল হল, তিনি শুধু সেইগুলিকে ব্রাহ্মধর্মের 'ক্রীড্' হিসেবে গ্রহণ করলেন, যে বাক্যগুলি তাঁর মনোমত হল না সেগুলিকে তিনি অক্লেশে বর্জন করলেন। অর্থাৎ যুক্তিবাদী আত্মবিবেকই হল তাঁর

পথের দিশারী। নিজের মনের কাছে গ্রহণের যোগ্য মনে না হলে তিনি ঔপনিষদিক মহাবাক্যকেও পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগী ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের মনঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তিনি মূলতঃ ছিলেন নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিক ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী তাত্ত্বিক। তাঁর কাছে বস্তুপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভরশীল অভিজ্ঞতাই একমাত্র গ্রহণীয় হয়েছিল। যাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদ বলে অক্ষয়কুমার ছিলেন সেই দলভুক্ত। সুতরাং বৈজ্ঞানিকতা, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানমূলক বাস্তবচেতনা এবং যৌক্তিক পারম্পর্যের দ্বারা তিনি বিশ্বতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তিনি শাস্ত্রগ্রন্থকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলে মানতে চান নি; ঈশ্বরকে মানতেন বটে, কিন্তু দেবকৃপার প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। এই বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে মহর্ষি অক্ষয়কুমারের যুক্তি মানতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বেদবেদান্তের প্রতি 'ভক্তিরহৈতুকতা' ত্যাগ করেছিলেন। যৌক্তিকতার মধ্য দিয়ে বিশ্বকে বুঝে নেওয়া, চিদাত্মক জগৎপ্রত্যয়কে সকলের ওপরে স্থান দেওয়া, অপ্রাকৃত-অলৌকিক ও অধ্যাত্মরহস্যকে ভৌমবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে দেখা এবং প্রয়োজন হলে যাবতীয় আপ্তবাক্য ও শাস্ত্রবচনকে অস্বীকার করা এক কথায় সমস্ত জগদ্ব্যাপারকে বিশুদ্ধ বস্তুপ্রতীতি বলে গ্রহণ করা এবং ঐহিক জীবনকে তার দিকে চালিত করা এই ছিল তত্ত্বদর্শী অক্ষয়কুমারের একমাত্র বাসনা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের যুগে তিনি নিরঞ্জন জ্ঞানকে যাবতীয় অশরীরী ভাবকল্পনার ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, এর জন্য তিনি বাংলার মননশীল সাহিত্যে ও সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের কথা বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর জীবন ও সাধনার প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের

বাঙালীমনের এমন একটি বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে যে, সেটি তুলনারহিত বলে মনে হয়। চরিত্র, আদর্শ, মনোবল, বীর্য —সর্বোপরি সীমাহীন মানবপ্রীতির কথা ভাবলে বিদ্যাসাগরকে আমাদেরই একজন বলে ভাবতে সংকোচ বোধ হয়। শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে তাঁর দান ও প্রাণের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়কে-ই বা কে নির্ধারণ করতে পারে? মনুষ্যত্বের এতবড় জীবন্ত আদর্শ, মানব-প্রেমের এমন একটি সজীব প্রতীক কোনো দেশেই দলে দলে আসে না। বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত নির্মোহ মন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিবেচনা, বাস্তববোধ সম্বন্ধে সচেতনতা, আবার তারই সঙ্গে অপরিমেয় প্রেম গত দেড়শ বছরের মধ্যে এদেশে তার আর জুড়ি মিলল না। তিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান; তাঁর বাল্য-কৈশোর সংস্কৃত কলেজের রক্ষণশীল আদর্শেই অতিবাহিত হয়েছিল। অথচ তিনি হিন্দুর সনাতন আদর্শ ও সামাজিক সংস্কারের প্রতি প্রায়ই উদাসীন ছিলেন। কিন্তু তাই বলে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মতো ভারতীয় সংস্কার ও হিন্দুর আচার আচরণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি বা ব্রাহ্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন নি যদিও তত্ত্ববোধিনী সভা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। (হিন্দুর সামাজিক ও স্মার্ত আচার তিনি অস্বীকার করেন নি, আবার অনেক সময়ে ঈশ্বর-সম্বন্ধে সংশয়বাদীর মতো, কখনও বা নাস্তিকের মতো এমন মতামত ব্যক্ত করতেন যে, সে যুগের অনেকে, যাঁরা বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁরা তাঁকে অহিন্দু ও নাস্তিক বলতে দ্বিধাবোধ করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার সংঘাতে, পাশ্চাত্ত্য ইহমুখী আদর্শের প্লাবনে এবং ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজকে মানবীয় উপভোগবাদের মাপকাঠি দিয়ে মাপবার ফলে নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবক প্রাচীন ঐতিহ্যে আস্থা হারিয়েছিল এবং শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বাস্তববোধের দ্বারা যাবতীয় মানবিক ব্যাপার বিচার করতে প্রস্তুত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর এই যুগাদর্শের আলোকে বর্ধিত হয়েছিলেন। তার ফলে সমগ্র জীবন ও কর্মযোগের মধ্য দিয়ে

মানবপ্রেম এত অকৃপণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, পাশ্চাত্ত্য হিউম্যানিস্ট, পজিটিভিস্ট ও ইউটিলিটারিয়ানদের মধ্যেও সেরকম উত্তাপ, কবোষ্ণ হৃদয়ের আন্তরিক স্পর্শ পাওয়া যায় না। কারণ কোঁৎ, মিল, বেন্থাম, জেরিমি টেলর—এঁরা তত্ত্বের বাতায়ন থেকে মানুষকে, তার কল্যাণকে বিচার, বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মানব-প্রীতি কোনো দার্শনিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; মানুষকে সেবা করা, ভালোবাসা —এই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান ও সাধনা। গ্রন্থ ও তত্ত্বের মারফতে মানুষকে না দেখে তিনি মানুষের দুঃখপীড়নের মর্মস্থলে নেমে গিয়েছিলেন। দেহদশাধীন ও দুঃখযূপে-বদ্ধ হতভাগ্য মানবজীবনের প্রতি তাঁর হৃদয়ে যে করুণা সঞ্চিত হয়েছিল, এবং যে করুণা তাঁকে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে বিশাল হৃদয় ঊনবিংশ শতাব্দীরই দান। বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মবেশী সত্তা কমলাকান্তের কণ্ঠে বলে উঠেছিল -“প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।” এ কথা বিদ্যাসাগরেরও অন্তর্বাণী। উনিশ শতকের মানবতাবাদ, নির্মোহ সংস্কারমুক্ত মানববোধ--তাই ছিল বিদ্যাসাগরের আত্মার খাদ্য-পানীয়। এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যথার্থ বলেছেন,— “স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না, কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন।” ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়—সবই তিনি মানুষের কল্যাণের দিক থেকে বিচার করতেন।* বলাই বাহুল্য, এই মানবতাবাদই নব্য বাংলার প্রাণমন্ত্র, এবং সে মানবতাবাদের প্রধান অবলম্বন পুঁথি বা আপ্তবাক্য নয়। মানুষের হৃদয়ই হল যে মানবদর্শনের পীঠস্থান -বিদ্যাসাগর সেই নরদেবতার শ্রেষ্ঠ ভক্ত-পূজারী।

---

* এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ‘বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন ?’ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৪. ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও নব্য রেনেসাঁস

উনিশ শতকের প্রথমার্থে বাঙালীর সমাজমানসের যে আমূল পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছিল, তাতে কিছু কিছু সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চারিত হলেও, বাঙালীর মনঃপ্রকৃতির যথার্থ স্বরূপটি শতশাখায় ও অযুত ফুলপল্লবে বিকশিত হল এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। পলাশীর যুদ্ধের এক শ' বছর পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হল এবং ব্যর্থও হল। এই সময় থেকে বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টি অভিনব পথে অগ্রসর হল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কোর্টের দোভাষী মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করলেন, ঐ বৎসরেই প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' 'মাসিক পত্র'-এর পৃষ্ঠা ছেড়ে উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত হল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে পুরাতন ধরনের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হল[১], ঐ বছরেই 'শর্মিষ্ঠা' মুদ্রিত হল। ইতিমধ্যে রঙ্গলালের বীররসপূর্ণ ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮) প্রকাশিত হয়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, কাব্য, নাটক ও উপন্যাসে নবযুগের প্রবর্তনা হল ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে। এর কয়েক বছর পরে যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) এবং 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) প্রকাশিত হল, সেদিন বোঝা গেল -দিগন্তে ধ্রুবতারার উদয় হয়েছে, যাকে লক্ষ্য করে বাঙালী সারস্বত সমুদ্রে সহজেই পাড়ি জমাতে পারবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, প্রায় একশ' বছর ধরে আধুনিক-শিক্ষিত বাঙালী রাষ্ট্র, সমাজ, ঐতিহ্যাদি নিয়ে অনেক লীলা করেছে। এতে তার মনের যথার্থ স্বরূপ সব সময়ে ধরা পড়ে নি, অনেক আন্দোলন আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টিতে তার মনের গড়নটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, ঐতিহ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার স্বরূপ সেভাবে প্রকট হতে পারে নি। সুতরাং একথা

১ এর একশ' বছর পূর্বে মধ্যযুগীয় বাংলার শেষ সার্থক কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রেরও মৃত্যু হয় (বঙ্গাব্দ ১১৬৭ সাল অর্থাৎ ১৭৬০ ৬১ খ্রীঃ অঃ)।

বলা যেতে পারে যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা সাহিত্যের রূপগত ও ভাবগত যথার্থ বিকাশ হয়েছে, শিল্পের দিক থেকে নানা বৈচিত্র্য দেখা গেছে, যা আজও অম্লান হয়ে আছে। কিন্তু এ সাহিত্য মূলতঃ বাঙালী মানসের নবজাগরণকেই ত্বরান্বিত করেছে— অবশ্য সে জাগরণ ইংরেজি-জানা মুষ্টিমেয় ভদ্র পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং কলকাতা হয়েছিল এর 'আদ্যাপীঠ'। আমাদের নব্য বঙ্গসংস্কৃতি, বৃহত্তর সংজ্ঞায়— দ্বিভাষী। শুধু বঙ্গসংস্কৃতি নয়, গোটা ভারতের আধুনিক সংস্কৃতিও দ্বিভাষী। ইংরেজি না জানলে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথাযথ মূল্যবিচার বা রসভোগ করা যায় না। খ্রীস্টানী ধর্মতত্ত্বে 'Original Sin' এর মতো এ হলো নব্যভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির মৌলিক ত্রুটি। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালার সংস্কৃতিকে কেউ কেউ উনিশ শতকী রেনেসাঁস বলতে চান, কেউ বা তাতে আপত্তি করে বলেন, এ হল 'রিভাইভাল' পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। সাহিত্যাশ্রয়ী এই নবজাগরণকে হয়তো য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের আদর্শে এবং অভিধেয়ার্থ ধরে পুরোপুরি রেনেসাঁস বলা যাবে না। কারণ য়ুরোপীয় রেনেসাঁস শুধু সাহিত্যগত নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, দেশে এবং কালে, চিন্তায় এবং আবেগে, ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সমাজপ্রকরণে, ভৌগোলিক সীমা সম্প্রসারণে য়ুরোপীয় রেনেসাঁস যথার্থই বিশাল এবং ব্যাপক। সেদিক থেকে সম্প্রসারিত অর্থে উনিশ শতকী বাঙালী রেনেসাঁস য়ুরোপীয় রেনে-সাঁসের কৌলীন্য দাবি করতে পারে না। কিন্তু অভিধেয়ার্থ ছেড়ে দিয়ে অন্বিতার্থ ধরলে দেখা যাবে, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর যে মন প্রকৃতি গড়ে উঠেছে, তা হচ্ছে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসেরই সহোদর। মনের বিস্ফোরণ, চৈতন্যের জাগরণ, যৌক্তিকতা ও মানবিকতার যে আদর্শ এ যুগের সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে ফরাসী 'রনেসাঁস' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করতে শুচিবাতিকে বাধা পেলে স্বচ্ছন্দে 'নবজাগরণ' বলা যেতে পারে।

বাংলার এই নবজাগরণকে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলাও পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়। 'হিন্দু-রিভাইভাল' কথাটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' কাব্য আলোচনায়। তাঁর মতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌরাণিক প্রভাব-বৃদ্ধির ফলে হিন্দুয়ানিব উৎকট chauvinism-এব তাড়নায় নব্যশিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায় পৌরাণিক সংস্কারকে ছদ্ম-বৈজ্ঞানিকতা ও অর্ধ-ঐতিহাসিকতার বকযন্ত্রে নতুন করে পরিশ্রুত কবতে আরম্ভ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র পুরাণ-মহাকাব্যের কৃষ্ণকে বিস্‌মার্ক-মাটসিনি গ্যারিবল্ডির ছাঁচে নবযুগেব উপযোগী করে নিতে চাইলেন। বঙ্কিমেব আদর্শে 'বঙ্গদর্শন'গোষ্ঠী পৌরাণিকতার পিছনে ইতিহাস সন্ধান করতে লাগলেন এবং চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনেব দল হিন্দুধর্মকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো স্থলে অযুক্তির আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। একদল মুষ্টিমেয় ইংরেজিজানা ও ইংরেজের তল্পিবাহক বাঙালী এই শতকের যাবতায় প্রগতিশীল আন্দোলন করেছিলেন এবং কেউ বা সংকীর্ণতর হিন্দুয়ানির বাতায়ন থেকে এই প্রগতিকে লক্ষ্য করেছিলেন বলে আধুনিক কালে কেউ কেউ উনিশ শতকের এই নব জাগরণকে সংকীর্ণ ও হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রভাবিত বলে মনে করেন। কারণ এই নবজাগরণে বাংলার জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ মুসলমানেরা যোগদান করেন নি; কেউ কেউ যোগ দিলেও মনে মনে সমস্ত ব্যাপারকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। সুতরাং একে একপ্রকার ধর্মঘেঁষা হিন্দু রিভাইভাল বলতে অনেকেই উৎসাহিত হবেন। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্য - মধুসূদনবৃত্ত ও বঙ্কিমগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি-গুলিকে শুধু হিন্দুয়ানিরই অনুবৃত্তি—সংকীর্ণ সমাজসম্প্রদায়ের ব্যাপার —একথা বলা কি যুক্তিসঙ্গত?

মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করে আচার-আচরণে ও বৈবাহিক সূত্রে পুরোপুরি ইংরেজি ধরণ-ধারণ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু বাংলা কাব্য-নাট্য রচনায় তিনি মূলতঃ ভারতের পৌরাণিক ঐতিহ্য থেকেই

উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মহাকাব্য, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য— এতে কি বিশুদ্ধ হিন্দুমনোভাব ফুটেছে? কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যসংস্কারের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য জাতি ও ভারতীয় আদর্শকেই বরণ করেছিলেন। শুধু কাব্যরীতি ও প্রকরণেই নয়, তার প্রাণরসের মধ্যে যে প্রজ্ঞা সঞ্চারিত করেছিলেন, তা কি হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতির অনুকূল? রাবণের চরিত্রে যে ট্র্যাজিক হতাশা ফুটেছে, এর মূল এদেশের মাটিতে ছিল না; সেযুগে নব্য প্রাণধর্মের সংঘর্ষে বাঙালীসমাজ মনেপ্রাণে যে অগ্নিদাহ উপলব্ধি করেছিল, মধুসূদন তাঁর সারস্বত সাধনায় তারই বার্তা নিয়ে এলেন। এতদিন ধরে বাঙালীমানস যে-ধরনের মনঃপ্রকৃতির নির্ভর নিরাপদ দুর্গে বাস করতে অভ্যস্ত ছিল, তাতে ইতিপূর্বে আঘাত হেনেছিলেন রামমোহন-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর। এবার সেই ভাঙা ভিতের ওপর নতুন সৌধ নির্মাণের চেষ্টা করলেন মধুসূদন। ('মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমাপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি গভীর অর্থবহ—"যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারাই গলায় পরাইয়া দিল।") বাস্তবিক মধুসূদন এবং তাঁর শিষ্যের দল পূর্বতনকে পূর্বরূপে ও পুরাতনভাবে পুরোপুরি গ্রহণ করতে চান নি। (মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র উপাদান নিয়েছেন প্রাচীন কাব্যনাটক থেকে। কিন্তু নারীচরিত্রগুলিকে প্রেম-কাম-মান-অভিমান-লোভের মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা সব সময়ে পৌরাণিকতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নি।) তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' যে-রাধাকে আঁকা হয়েছে, তিনি বৃন্দাবনের 'শ্রীমতী রাধা' নন, যদিও "They (অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলি) are all about poor old Radha and her বিরহ" (রাজনারায়ণ বসুকে লেখা কবির পত্রাংশ), তবু সে রাধা হলেন, "the poor lady of Braja" (কবির পত্রাংশ)। একটি চিঠিতে কবি তাঁকে বলেছেন, 'Mrs. Radha.' মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

"If she had a Bard like your humble servant from the begining, she would have been a diffcrent character." এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণীকে তিনি 'Mrs. Radha'—অর্থাৎ ভারতীয় আধ্যাত্ম প্রেমকে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে মানবীয় প্রেমে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। শোনা যায়, কোনো নিষ্ঠাবান ভক্ত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পাঠে মুগ্ধ হয়ে "পরমভক্ত বৈষ্ণবশেখর পুণ্যবান মধুকে" দেখবার জন্য নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় এসে তাঁর বিজাতীয় বেশভূষা দেখে সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, "বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট" (মধুস্মৃতি)। এ ভুল অনেকেই করেছেন। 'Poor lady of Braja' যে বিশুদ্ধ মানবীয় আবেগ থেকে পরিকল্পিত হয়েছিলেন, এবং মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মূলেই ছিল মানবীয় ভাবের উচ্ছল প্রবাহ, তা তাঁর কাব্যনাটকগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে।

মধুসূদনের শিষ্যস্থানীয় নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র পুরাতন ঐতিহ্য ও পৌরাণিক উৎসকে সোৎসাহে গ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদনের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি 'এস্টাবলিশমেন্ট' ও 'ট্র্যাডিশন'-এর পক্ষপাতী ছিলেন। তাই মধুসূদনের সাহিত্য সম্বন্ধে 'সিদ্ধরসে'র ব্যতিক্রম হয়েছে বলে সনাতন ও ভারতীয় অলংকারবাদী আলোচকের দল যে আপত্তি তুলেছেন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র সে পথ পরিত্যাগ করে পৌরাণিক সংস্কারের আনুগত্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে বাস করে বাতাসের চাপ এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাঁরাও উনিশ শতকের মনঃপ্রকৃতির বাইরে যেতে পারেন নি। নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' কাব্যে (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস) কৃষ্ণের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার বহুস্থলেই তো আধুনিক সংস্কারের প্রগাঢ় ছায়া পড়েছে। রাজনৈতিক ঐক্য পরিকল্পনায় কৃষ্ণের সংলাপ ও চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে কবি যে তত্ত্বকথা বিবৃত করেছেন, তা উনিশ শতকের জার্মানি ও ইতালির ভাগ্যবিধাতৃগণকে স্মরণ করিয়ে দেবে। কৃষ্ণের মানব-হিতবাদ বহুলাংশে পাশ্চাত্ত্য হিতবাদ, উপযোগবাদ ও ধ্রুববাদের দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য কাব্যত্রয়ীর শেষাংশে নবীনচন্দ্র

বৈষ্ণবভক্তির দৃষ্টিতেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারে পঞ্চমুখ হয়েছেন। আবার তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধে' পরাধীনতার মর্মবেদনা ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করেছে। এদিক থেকে তাঁর মহাকাব্য ('বৃত্রসংহার'), ঐতিহাসিক ('পলাশীর যুদ্ধ') আখ্যানকাব্য, কাল্পনিক আখ্যানকাব্য ('রঙ্গমতী') এবং মহাপুরুষ-জীবনী-কাব্যে ('অমৃতাভ' ও 'অমিতাভ') এই মানবিক আদর্শ নতুনরূপ লাভের চেষ্টা করেছে।

হেমচন্দ্র ও মধুসূদনের খনিত পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যরূপে কতকটা সফল হয়েছে তা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এতে দেবাসুরের সংগ্রামের মারফতে কবি পৌরাণিক ঘটনার মধ্যে উনিশ শতকী স্বদেশপ্রেমের উত্তাপ সঞ্চার করেছেন। তাঁর 'দশমহা-বিদ্যা'তেও পুরাণের আধারে আধুনিক দর্শনবিজ্ঞান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। কবি হিসেবে হেম-নবীনের স্থান যেখানেই হোক, এঁদের কাব্যকবিতায় যে উনিশ শতকের বাঙালীমানস নব নব অভিজ্ঞতার আস্বাদ লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

কেবল বিহারীলাল ও তাঁর শিষ্যানুশিষ্যের গীতিকাব্যে বিচরণ—মনে হবে এ বঝি পুরাতন ঐতিহ্যের, আদিম গীতি-প্রবণতার এক নতুন সংস্করণ। দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন ও তাঁর শিষ্যের দল মহকাব্যের রণদামামা ও দর্শনবিজ্ঞানের নানা ঘোষণা নিয়ে বাংলা কাব্যপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হলেও ঐ একই কালে বিহারী-লালের গীতিকাব্য এবং তাঁর সমপন্থীদের গীতিকবিতাগুলিতে যেন গোত্র-বহির্ভূত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রভৃতি গীতিকবিরা ব্যক্তিগত প্রবণতা থেকে যে সমস্ত গীতি-কবিতা রচনা করেন, তার অবলম্বন ছিল নারী, প্রকৃতি ও স্বাদেশিকতা। এই যে নারীর একটি পৃথক রোমান্টিক স্বাতন্ত্র্য, প্রকৃতির সঙ্গে কবিচেতনার মানবিক সম্পর্ক এবং স্বাদেশিক আবেগের রক্তিমা— এগুলি উনিশ শতকের পরিবেশেই সম্ভব হয়েছিল। পূর্বতন

যুগে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ও বাউল গীতিসাহিত্য ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল মুখ্যতঃ সাধ্যসাধনতত্ত্বের অঙ্গীভূত, বিশেষ ধরনের ধর্মীয় চেতনার বাহন হিসেবেই তার যা কিছু মূল্য। উপরন্তু এ সমস্ত গীতিসাহিত্য মূলতঃ ছিল আদিম অর্থেই গীতিসাহিত্য। অর্থাৎ গীত হওয়াই ছিল এর প্রধান পরিচয়। রচনাকারের মর্ত্যভাবানুরঞ্জিত ব্যক্তিগত উপলব্ধি এর মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যাবে। কবিব্যক্তিত্ব অর্থাৎ কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য— এ হল আধুনিক গীতিকবিতার মূল বৈশিষ্ট্য।

এই শতকের শেষভাগে অর্থাৎ সপ্তম দশক থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব যে সুদৃঢ় হল তাই নয়, বাঙালীর চিত্তজাগরণের অগ্রদূত হয়ে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর শিষ্যের দলও তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে নবযুগের পূর্ণতাসাধন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর জীবনে কথারসের যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন, তার জন্য তিনি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর পূর্বে প্যারীচাঁদ, ভূদেব এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কথারস সৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ সার্থক হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনো অভাবনীয় ঐশ্বর্যের চমক ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে রোমান্সকে বড়ো-একটা ছাড়তে পারেন নি, চানও নি। কিন্তু এই কাহিনীগুলিতে মানবজীবনের রসটি পাঠকচিত্ত বিস্ময়ানন্দে পূর্ণ করে তুলল। বাংলা সাহিত্যে নবীনতা সঞ্চারে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র দুই বিচিত্র দিক থেকে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একজন বিশুদ্ধ কল্পনা ও পৌরাণিকতাকে আধুনিক আধারে সংমিশ্রিত করেছিলেন, আর একজন ইতিবৃত্ত, কল্পকথা ও ঘরের কথাকে কল্পনার বর্ণাঢ্য-বৈচিত্র্যের দ্বারা এক অভিনব গদ্যসাহিত্যে রূপায়িত করেছিলেন - যার মূলকথা মানুষের বিচিত্র জীবনচিত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিক হিসেবেই নন, উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ হিসেবে তিনি বাঙালীর মনঃ-প্রকৃতিকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, তার কথা এখনও শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে বাঙালীকে চক্ষুষ্মান করতে চেয়েছিলেন, প্রাচীন ও নবীন বাঙালীর মধ্যে আত্মীয়তার সেতু রচনার বাসনা করেছিলেন। ইতিহাস, সমাজ, রাজনৈতিক চেতনা, সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিনির্ভর তত্ত্ব সমাবেশ করে তার দ্বারাই তিনি নব্য বাঙালীর অন্তর্লোকে স্থায়ী আসন লাভ করলেন। প্রাবন্ধিক বঙ্কিম মূলতঃ ছিলেন যুক্তিবাদী। য়ুরোপীয় পাঠশালা থেকেই তিনি যুক্তিবাদের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন; কিন্তু শুধু যুক্তিবাদী হলে তিনি বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে প্রাচীন ঐতিহ্যের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ বোধ করতেন না। মিল-বেন্থাম-কোঁৎপন্থার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরক্তি ছিল, য়ুরোপীয় সমাজ বিপ্লবের প্রত্যেক সংবাদই তাঁর নখদর্পণে ছিল। সাম্যবাদী সমাজ পরিকল্পনার প্রতি তিনি প্রথম জীবনে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুকাল কোঁৎপন্থায় নিরঙ্কুশভাবে পদচারণা করেছিলেন। মানবতাবাদ ও যুক্তিমার্গ— এই ছিল তাঁরও মূল সিদ্ধান্তের দুটি প্রধান সোপান। প্রাচীন পৌরাণিক ঐতিহ্যকে নব্যশিক্ষিত তরুণের দল এবং ব্রাহ্মসমাজের মতো এক কথায় উড়িয়ে না দিয়ে তিনি যুক্তি ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক অতিরঞ্জন ও অলৌকিকতার মধ্যে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। সেই সন্ধানের শ্রেষ্ঠ ফল হল 'কৃষ্ণচরিত্র'। পুরাণ, মহাকাব্য ও ভক্তিকাব্যের অলৌকিক কৃষ্ণকে তিনি নতুন মানবিকতার আদর্শে মহামানবের পীঠস্থানে স্থাপন করলেন। কৃষ্ণই হলেন তাঁর উপাস্য [২] এবং সে

২. এই প্রসঙ্গে যীশু, শাক্য ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে— "আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শপুরুষ নহেন।" ('ধর্মতত্ত্ব'—ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়) এই উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, মানুষের পূর্ণ গার্হস্থ্যজীবনকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কৃষ্ণ তাঁর সৃষ্টি, যিনি পূর্ণমানব, মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। *

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে এই ভাবাদর্শ শিক্ষিত নবীন সমাজে কিছু হীনবল হয়ে পড়ল, এবং সেই সময়ে বাংলা সাহিত্য ও সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হল। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র নন, 'নববিধান'-এর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষ মানবিকতার আদর্শেই চৈতন্যজীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন। আসল কথা, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী একজন আদর্শ মানবকে সন্ধান করছিল, যাঁকে অবলম্বন করে জীবনে অগ্রসর হওয়া যায়। সেই আদর্শ মানব হলেন শ্রীকৃষ্ণ। আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখে প্রশ্ন করেছিলেন,—"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে।"[৩]

সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি সমস্ত বাঙালীকে শুনিয়েছেন। 'কৃষ্ণ-চরিত্র'-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন,—"কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।" আবার 'ধর্মতত্ত্ব'-এর উপসংহারে শিষ্যকে অনুশীলনতত্ত্ব বোঝাবার পর গুরু আশীর্বাদ করলেন "ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।"

* এ কথা 'বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা' প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. 'ধর্মতত্ত্ব', একাদশ অধ্যায়।

এই মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, অনুশীলনতত্ত্বের (religion of culture) মধ্য দিয়ে মানবধর্মের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দেখানো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি সেই পূর্ণমানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। কোঁৎ-ভক্ত হয়েও তিনি ঈশ্বরচেতনা পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বরং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করে কৃষ্ণের ভগবৎ-সত্তায় তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে।[৪] কিন্তু তবু স্বদেশপ্রীতিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন। নিরীশ্বরবাদী কোঁৎতত্ত্বে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হলেন এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'য় তাঁর এই অভিনব ধর্মাদর্শ ব্যাখ্যা করলেন। উনিশ শতকে বঙ্কিম-গোষ্ঠীরা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিকেই অবলম্বন করেছিলেন—যা শুধু সাধ্যসাধনতত্ত্বের বা আচার-আচরণের বিষয় নয়, যার সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম মনঃপ্রকৃতির যোগাযোগ ঘটেছে।

মননের সঙ্গে সংস্কারের সংঘাত ঘটলে মননকেই জয়ী করতে হবে, এ-কথাটাই উনিশ শতকের গদ্যসাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হল। এই তাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ভূদেবের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন ভারতের আচার-নিষ্ঠা ও নবীন য়ুরোপের কর্মোদ্যম —এই দুই বিপরীত ব্যাপারকে নিজ জীবনে সমভাবে গ্রহণ করে ভূদেব ব্যক্তি ও পরিবার-জীবনের একটি স্থিতধী রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। একদিক থেকে তিনি প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকারী। আবার অপরদিকে ভারতীয় সংস্কারকে অব্যাহত রেখে পাশ্চাত্ত্য জীবনের যতটা গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে তিনি নানাভাবে চিন্তা

৪. "আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।" ('কৃষ্ণচরিত্র', প্রথম পরিচ্ছেদ)

করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনা 'প্রাগম্যাটিক'—যদিও তা গভীরভাবে চিন্তা উদ্রেককারী। বঙ্কিম-গোষ্ঠী মননপ্রধান গদ্যসাহিত্যে সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা করেছিলেন তা ঠিক ব্যক্তিজীবন বা পারিবারিক জীবনের প্রয়োগসামর্থ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত হয় নি। সে যাই হোক, মনের ও চিন্তার মুক্তি– মননের দ্বারা বেঁচে থাকার সার্থকতা[৫] বঙ্কিমপ্রভাবে শিক্ষিত মনে বদ্ধমূল হয়েছিল এবং তার যথার্থ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়েছিল সাহিত্যে।

পরিশেষে বাঙালী-মনের মানচিত্র বিচারে নাটকের কথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। নাটক একপ্রকার মিশ্র শিল্প, যা প্রকৃত প্রস্তাবে সূক্ষ্ম রসশিল্প, আবার নিছক চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির ফলশ্রুতিরূপেও গ্রহণযোগ্য। উনিশ শতকের বাংলা নাটকের গোড়ার কথা হল, জনমনোরঞ্জনের নগদবিদায়। কিন্তু ধীরে ধীরে নাটকের ভরাপালেও উনিশ শতকের হাওয়া লাগল। তাই দেখা যাচ্ছে উমেশ মিত্রের 'বিধবা বিবাহ,' রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'নবনাটক', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-- এ সমস্ত নাটকের পশ্চাদপটে রয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ কালের সমাজ। সে যুগের (এবং এযুগেও) অভিনয় মূলতঃ দর্শকদের তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হলেও তদানীন্তন দেশ ও কালের আবহাওয়া নাটককেও বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। মধুসূদন ইতিহাস অবলম্বন করে নতুন নাটকের ('কৃষ্ণকুমারী') আদর্শ সৃষ্টি করলেন। তাঁর প্রহসন দু'খানিতে সমাজের কানাগলির চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

৫. যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বলা হয়েছে,—'তরবোঽপি হি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ; স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।'

তরু, মৃগ, পক্ষী সকলেই জীবনধারণ করে, কিন্তু মননের দ্বারা যার মন জীবিত, সেই-ই প্রকৃতপক্ষে জীবিত থাকে।

দীনবন্ধুর নিমে দত্ত ('সধবার একাদশী') যখন মদমত্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, —"ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পেনাল কোড, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাত ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি"—তখন উনিশ শতকের ভ্রষ্টাচারী ইয়ং বেঙ্গলদের হতাশা ও আর্তনাদ নিমে দত্তের চাপা বেদনাময় রহস্যোক্তিতে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকে অবতীর্ণ হয়ে বাঙালী-মানসের আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি কৌতূহলী হলেন। জ্যেতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং তার সঙ্গে প্রচুর কল্পনার ভেজাল দিয়ে যে সমস্ত নাটক লিখেছিলেন, নাটক হিসেবে তার মূল্য সম্পর্কে হয়তো এখন আর আমাদের বিশেষ কোনো মোহ নেই। কিন্তু দেশাত্মবোধের পটভূমিকায় জাতি-সম্প্রদায়ের ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় যে শিক্ষিত মন বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিল, তা উনিশ শতকের শেষভাগে রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে। ইতিহাস-চেতনা উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই বাঙালীর মনে আশানিরাশার দোলা দিয়েছিল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র -সকলেই ইতিহাসকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অতীতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন এবং স্বদেশগৌরবের পটভূমিকায় ভাবীভারতের চিত্রাঙ্কন -এটা নাটকাভিনয়েই বিশেষভাবে ফুটে উঠল। এই সঙ্গে পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের দানও ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমাদের পূর্বযুগের যাত্রাভিনয় মূলতঃ ভক্তিভাবরঞ্জিত পৌরাণিক আখ্যানকেই অবলম্বন করেছিলেন। ভক্তি, করুণা, আবেগ প্রভৃতিকে ঘিরেই যাত্রাভিনয়ের একটি নৈতিক ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে গড়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র তাঁর গোড়ার দিকে সেই সুলভ ভক্তি ও উচ্ছ্বসিত করুণরস, পুরাণের মোটা মোটা নীতিকথাকে ভিত্তি করে যে সমস্ত পৌরাণিক নাটক লিখলেন, তার শিল্পমূল্য যেমন হোক না কেন, তার পশ্চাদপটে বাঙালীর যে-মন

উঁকি দিচ্ছে, তার স্বরূপ-বৈচিত্র্যই অধিকতর কৌতূহলজনক। বঙ্কিমযুগে পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি যখন শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তখন গিরিশচন্দ্র সেই পৌরাণিক ভক্তির আবেগ ও সুলভ তত্ত্ব-কথাকে নাটকে প্রচার করে বাঙালী-মানসের আর একটা দিকের পরিচয় তুলে ধরলেন। যুক্তিবাদী বাঙালীর মনে যেমন ক্ষুরধার মননের অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি আবার ভক্তি, করুণরস, প্রাক্তন, নিয়তি প্রভৃতির প্রতিও তার আকর্ষণ প্রবল। গিরিশচন্দ্র নাটকে সেই ভক্তিভাব-ব্যাকুল বাঙালী চিত্তের চিরকালীন বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুললেন। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, উনিশ শতকে বাংলা নাটকের অভিনয়-মূল্য যতটা ছিল, বা তার দিকে 'অধিকারী' মহাশয়েরা যতটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তার শিল্পকলা বা সাহিত্যগুণের দিকে ততটা সচেতন হন নি। কারণ নাটক উপভোগের যারা ছিল 'সামাজিক', তাদের অধিকাংশের মানসিক পরিমণ্ডল উচ্চতর কলাকৌশল বা গভীরতর সারস্বত মূল্যের প্রতি উদাসীন ছিল। কাজেই জনরুচিকে নাটকের একমাত্র মূলধন করা হয়েছিল বলে উনিশ শতকের বাংলা নাটকে সুস্থায়ী শিল্পাদর্শ বড়ো-একটা গড়ে উঠতে পারে নি। তা সে যাই হোক, উনিশ শতকের শেষভাগে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের মারফতে যে সাধারণ বাঙালীমনের প্রবণতার যথার্থ সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ শেষাংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনা, বিতর্ক, ও দ্বন্দ্ব বাঙালী মনে যে নানা প্রশ্ন, সমস্যা জাগিয়ে তুলেছিল, জীবনকে নানা মাপকাঠির সাহায্যে মাপবার দিকে ঝোঁক পড়েছিল, তার সাক্ষাৎ-পরিচয় পাওয়া যাবে এ যুগের সাহিত্যকর্মে, লেখক ও পাঠকের মন-বিনিময়ের মধ্যে। সে পরিচয়ের মূল কথা হল মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিস্ময়, যৌক্তিকতার প্রতি অনন্য শরণাগতি, আধুনিক জীবনপ্রবাহের স্বীকৃতি-ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রচেতনায় বস্তুপ্রত্যয়কে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা।

জীবনের সীমা সম্প্রসারণ, চৈতন্যের মর্মমূলে গভীর আলোড়ন, ভূগোল-ইতিহাসের স্থানকালসীমা লঙ্ঘন করে চিদাকাশে অবাধ মুক্তির অপার আনন্দ এবং অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিষণ্ণ বেদনা—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তারই অমলিন স্বাক্ষর রয়ে গেছে। তারপর শতাব্দীর আয়ুর পরিধি শেষ হয়ে এল, বঙ্কিমচন্দ্র অস্তমিত হলেন—রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে দিগন্তে নবীন সূর্যোদয়ের মাঙ্গলিক ঘোষিত হল, ধর্ম-কর্ম-সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান-সম্প্রদায় নতুন করে বহ্ন্যুৎসব শুরু করে দিলেন। তার অয়নরেখা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশেই স্বতন্ত্র।

দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো

সাগর পাড়ি দিয়ে যে-সমস্ত পাশ্চাত্ত্য জাতি ভারতবর্ষে এসেছিল, প্রথমে তাদের নিছক উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশ থেকে ধনরত্ন সংগ্রহ করে আবার সমুদ্রপারেই ফিরে যাওয়া। ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দের দিকে পর্তুগীজ বণিকেরা বাংলাদেশে যৎকিঞ্চিৎ বাণিজ্য বিস্তার করেছিল, কিন্তু শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিল মালাবার ও করোমোণ্ডল উপকূলে। বাংলাদেশে তাদের প্রয়াস বহুদিন অর্ধস্তিমিত হয়ে ছিল। ক্রমে ওলন্দাজ বণিকেরা এ-দেশে বাণিজ্য বিস্তার করতে শুরু করে এবং ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হলেও ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে তারা বিশেষ কোনো সুবিধা করতে পারে নি। দিনেমার ও জার্মান বণিকেরা এ-দেশে বাণিজ্যের বাসনায় যাতায়াত করলেও ইংরেজ বণিকের সুচতুর বুদ্ধি ও কুটিল কৌশলের কাছে পরাস্ত হল। কালক্রমে বাণিজ্য ও দেশশাসনে পর্তুগীজ আধিপত্য খর্ব হলেও বাংলা ভাষা ও জাতীয় চরিত্রে তাদের যৎকিঞ্চিৎ প্রভাব রয়ে গেছে। বাংলাদেশে তারা ধর্মপ্রচারের জন্য বাঙালী জমিদারদের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিল। প্রতাপাদিত্য পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের নিজ রাজ্য-মধ্যে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রজারা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁরা কিছুমাত্র বিচলিত হতেন না।

পর্তুগীজ পাদ্রীরা রোমান ক্যাথলিক (জেসুইট ও অগাস্তিনীয়)

ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং সেই ধর্মমত বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ছলে বলে কৌশলে প্রচার করে কিছু উচ্চশ্রেণীর এবং অনেক নিম্নশ্রেণীর বাঙালীকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ক্রমে দেশীয় খ্রীস্টান এবং আগন্তুক পর্তুগীজদের সংমিশ্রণের ফলে যে 'মেটে-ফিরিঙ্গী' নামক বর্ণ-সঙ্কর শ্রেণীর উদ্ভব হয়, রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান মত প্রধানতঃ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্তুগীজ পাদ্রীগণ বাংলাদেশে নানা স্থানে গির্জা স্থাপন করেন, দেশীয় ব্যক্তিদের এই ধর্মে দীক্ষা দেন এবং প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য নিজেরা মোটামুটি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। পর্তুগীজদের নিকট-সংস্পর্শে আসার ফলে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু পর্তুগীজ শব্দ ঠাঁই পেয়েছে।[১]

পর্তুগীজ পাদ্রীগণ এ-দেশীয় ভাষা শিক্ষা করে বাংলা ভাষার প্রচারগ্রন্থ, ব্যাকরণ ও অভিধান বচনা করেছিলেন, তার কিছু কিছু মুদ্রিতও হয়েছিল--অবশ্য রোমান হরফে। কারণ তখনও (১৮শ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক) বাংলা হরফ মুদ্রণেব জন্য সৃষ্টি হয় নি, যদিও ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে কোচিনে তামিল অক্ষর নির্মিত হয়েছিল ('*Linguistic Survey of India*', Vol. IV. p. 301)। জেসুইট পাদ্রীসম্প্রদায়ের জোয়ানেস গন্‌সাল্‌ভেস (Joannes Gonsalves) এই সাট নির্মাণ কবেন। কিন্তু বাংলাদেশে ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি

১. কাম্পোজ (J. J A. Campos প্রণীত '*A History of the Portuguese in Bengal*') এবং দালগাদো (R. Dalgado প্রণীত '*Influencia do Vocabulario Portugues em Linguas Asiaticas*') বাংলা ভাষায় গৃহীত ১৭৪টি পর্তুগীজ শব্দেব তালিকা দি.য়ছেন। তার মধ্যে অনেকগুলিই এখন ব্যবহৃত হয় না। এ বিষয়ে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের '*The Origin and Development of the Bengali Language*'-এর প্রথম খণ্ডের ২১৪-২১৫ এবং ৬২০-৬৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হলহেডের (Nathaniel Brassey Halhead, 1751–1830) *The Grammar of the Bengal Language*'-এর পূর্বে বাংলা হরফ ছাপায় ব্যবহৃত হয় নি।* পর্তুগীজ পাদ্রীদের বাংলা গদ্যচর্চা ও গ্রন্থ রচনার প্রথম সংবাদ দেন ফাদার হস্টেন (*Bengal Past and Present*, Vol. XI, 1914)। এ-বিষয়ে তিনি কিছু কিছু অজ্ঞাত-পূর্ব তথ্যের সন্ধান দেন। ফাদার থিরসো লোপেস নামে এক স্পেনদেশীয় ধর্মযাজক হস্টেনকে যে তথ্য সরবরাহ করেন, তার থেকে জানা গেল যে, মানোয়েল দা আসুস্সুম্পসাঁও নামে এক পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বাংলা ভাষায় একখানি ধর্ম-গ্রন্থ (*Crepar Xaxtrer Arthbhed*) এবং একখানি বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ অভিধান (*Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez*) সঙ্কলন করেন। দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো নামে একজন ধর্মান্তরিত বাঙালী খ্রীস্টান রোমান ক্যাথলিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করেন এবং বাংলা ভাষায় একখানি প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তিকা রচনা করেন। এটি সাধারণতঃ 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে পরিচিত হলেও মূল পাণ্ডুলিপিতে এ ধরনের কোন নাম নেই; তার বদলে পর্তুগীজ ভাষায় এইভাবে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছেঃ "Argumento e Disputa sobre a Ley entre hu Christao, ou Catholo Romo, e hu bramene ou Me dos gentios"—অর্থাৎ "জনৈক খ্রীস্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার।"[২]

মানোয়েল দা আস্সুম্পসাঁও-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং পর্তুগীজ-বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। 'কৃপার শাস্ত্রে'র অন্ততঃ তিনটি সংস্করণ হয়েছিল। কিন্তু দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' সেকালে মুদ্রিত হয় নি, যদিও মুদ্রণের জন্য মানোয়েলের গ্রন্থের সঙ্গে লিসবনে প্রেরিত হয়েছিল। দোম আন্তোনিয়োর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (রোমান হরফে লেখা) এখনও পর্তুগালের অ্যাভোরা নগরীতে আছে। এর প্রথম মুদ্রিত সংস্বরণ বাংলা লিপ্যন্তরীকরণসহ ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তার পূর্বেই (১৯৩১) মানোয়েলের ব্যাকরণ অভিধান *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez'*) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সর্বশেষে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়। এই দু'জন লেখক— মানোয়েল দা ও দোম আন্তোনিয়ো, একজন বিদেশী পর্তুগীজ খ্রীস্টান, অপরজন ধর্মান্তরিত বাঙালী খ্রীস্টান— এঁদের বাংলা বিতর্কমূলক প্রচারগ্রন্থ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো (Dom Antonio do Rozario) বাঙালী হিন্দুসন্তান— ভূষণার রাজপুত্র। আরাকানের মগ বোম্বেটেরা বাল্যকালে তাঁকে আরাকানে চুরি করে নিয়ে যায়। সেখানে ফা মানুয়েল দো রোজারিয়ো নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী তাঁকে অর্থ বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেন এবং কিশোর রাজপুত্রকে খ্রীস্টানী মতে শিক্ষিত করে রোমান ক্যাথলিক মতে দীক্ষা দান করেন। তখন তাঁর নাম হল দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো। তাঁর আসল নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নি, তিনি খ্রীস্টান নামেই পরিচিত হয়েছেন। শোনা যায়, দোম আন্তোনিয়ো পরে পিতৃভূমিতে ফিরে এসে প্রবল বিক্রমে খ্রীস্টানী মত প্রচার করতে থাকেন, অনেককেই খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন।

তাঁর গ্রামেই সন্ত নিকোলাস দে তলেন্তিনো মিশন (Santo Nicolas de Tolentino) স্থাপিত হয় এবং সে স্থাপনার তিনিই যে উদ্যোগী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর মৃত্যুর পর স্থানীয় হিন্দুদের প্রতিকূলতার জন্য মিশনটি ঢাকার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত নাগরী গ্রামে স্থানান্তরিত হয় (১৬৯৫)। মিশনের পরিচালক ফাদার লুইস দোস আঞ্জোস বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দোম আন্তোনিয়ো ও মানোয়েলদা আসসুম্পসাঁও সম্পর্কে ফাদার হস্টেন যে বিবরণ সংগ্রহ করেন (*Bengal Past & Present*-এ প্রকাশিত), সেটি স্পেনীয় ফাদার থিরসো লোপেস প্রদত্ত, তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। লোপেসের বিবরণ থেকে হস্টেন মনে করেছিলেন, মানোয়েলের দুখানি গ্রন্থ এবং দোম আন্তোনিয়োর একখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে লিসবন থেকে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভার মুদ্রাযন্ত্রে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু পরে সন্ধান করে জানা গেছে, থিরসো লোপেস পরিবেশিত এই সমস্ত তথ্য এবং হস্টেন কর্তৃক তার অবিকল অনুবৃত্তির সবটা তথ্যসঙ্গত নয়। কারণ 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এর সম্পাদক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন স্বয়ং লিসবন ও অ্যাভোরায় গিয়ে দেখে এসেছেন, দোম আন্তোনিয়োর গ্রন্থটি অদ্যাপি পাণ্ডুলিপির আকারে (রোমান হরফে লেখা) অ্যাভোরার সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, তার সঙ্গে আছে মানোয়েল কৃত উক্ত পুস্তিকার পর্তুগীজ অনুবাদ। পুঁথিটিতে মোট ১২০ পৃষ্ঠা আছে। প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি কলম, বাম দিকে রোমান হরফে লেখা বাংলা, এবং দক্ষিণ দিকে তার পর্তুগীজ অনুবাদ। ডঃ সেন ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে মোট ৮৫ পৃষ্ঠা নকল করে এনেছেন, সময়াভাববশতঃ বাকি অংশ নকল করার অবকাশ পান নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করবার সময়ে ডঃ সেন রোমান হরফের সঙ্গে বঙ্গাক্ষরে লিপ্যন্তরীকরণও করেছেন।

হস্টেনকে স্পেনদেশীয় পাদ্রী থিরসো লোপেস এই সংক্রান্ত যে

বিবরণী পাঠিয়েছিলেন তার উৎস হচ্ছে পর্তুগীজ ভাষায় প্রকাশিত এই তালিকাগুলি ঃ—'Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborensa' ordenado pelo Bibliotheca iro Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, 'Bibliotheca Lusitana Historica, Critica and Chronologica' (Edited by Barbosa Machado), Bibl. August (Ossinger), 'Revista La Ciudad de Dios' (Edited by Bonifacio Moral)। বারবোসা মাসাদো (Barbosa Machado) ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে *Bibliotheca Lusitana*-র তৃতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন যে, মানোয়েল দা আসুম্পসাঁও *Cathecismo do Doutrina Christa'a ordenando por modo de Dialogo em idioma Bengala e Portuguese* নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করেন, সেটি ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভা লিসবন থেকে মুদ্রিত করেছিলেন। এই সমস্ত যৎসামান্য তথ্য থেকে মানোয়েলের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেলেও দোম আন্তোনিয়ো বা তাঁর রচিত কোন বাংলা গ্রন্থের নির্দেশ এই পর্তুগীজ গ্রন্থতালিকা থেকে পাওয়া যায় না। কুন্হা রিভার অ্যাভোরার গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন ১৮৫০ সালে (*Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense*)। তাতে দোম আন্তোনিয়োর পাণ্ডুলিপির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে ফাদার আম্ব্রোসিয়া 'সন্ত আগুস্তিনো নিকোলাস তলস্তিনো মিশন'-এর যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে আন্তোনিয়োর পাণ্ডুলিপির কথা আছে। অ্যাভোরায় রক্ষিত রোমান হরফে লেখা এই বাংলা পুঁথিটির একটি কপি ভিন্ন এর আর কোন দ্বিতীয় অনুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এর পর্তুগীজ অনুবাদ করেছিলেন মানোয়েল দা আসুম্পসাঁও। এ সম্পর্কে স্পেনের

অধিবাসী ধর্মযাজক ফাদার থিরসো লোপেস বাংলাদেশে ফাদার হস্টেনকে যা লিখেছিলেন, হস্টেন তাই অবলম্বনে ১৯১৪ সালের *Bengal Past and Present*-এর একাদশ খণ্ডে উক্ত গ্রন্থেরও অনুবাদের এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

> A catechism of the Christian Doctrine, in the form of a dialogue. It was printed in 8vo at Lisbon in 1743 by Francisco da Silva. The contents are : A discussion about the Law between a Christian Catholic Roman, and a Bramene or Master of the Gentoos. It shows in the Bengalla tongue the falsity of the Gentoo sect and the infallible truth of our Holy Catholic faith in which alone is the way of salvation and the knowledge of God's true Law. Composed by the son of the king of Busna, Dom Antonio, that great Christian Catechist, who converted so many Gentoos, it was translated into Portuguese by father Frey Manoel da Assumpsao, a native of the city of Evora, and a member of the Indian Congregation of the Hermits of St. Augustine, actually Rector of the Bengalla Mission, his object being to faciliate to the Missionaries their discussion in the said tongue with the Bramenes and Gentoos. It is a dialogue between the Roman Catholic and the Gentoo Bramene written in two columns, Bengala and Portuguese.

এই পাণ্ডুলিপিতে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলমের এক দিকে রোমান হরফে লেখা বাংলা এবং অপর দিকে তার সংক্ষিপ্ত পর্তুগীজ অনুবাদ—এই

অনুবাদটি মানোয়েলকৃত। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৯২৬ সালে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানের জন্য পর্তুগালে গিয়েছিলেন; তখন তিনি উক্ত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এর রোমান হরফে লেখা বাংলা অংশের অধিকাংশ নকল করে আনেন, কিন্তু পর্তুগীজ অনুবাদ লিখে নেবার অবকাশ পান নি। ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজি খাতার তু'কলমে বইখানি রচিত, গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও প্রস্তাবনাটি পর্তুগীজে লেখা। ফাদার আন্তোনিয়ো ভাওয়ালের নাগরী গ্রামের তলেন্তিনো গির্জায় যে পুঁথি দেখেছিলেন তাঁর বাংলা অংশ কিন্তু বাংলা হরফেই লেখা হয়েছিল। অ্যাভোরার পাণ্ডুলিপিতে বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অ্যাভোরার পুঁথিটি মূলের নকল। এটি সানুবাদ মুদ্রণের জন্য লিসবনে প্রেরিত হয়েছিল; বাংলা হরফ তখনও ছাপাখানায় ওঠে নি, এবং পর্তুগীজ মিশনারীগণ বাংলা হরফ বুঝতে পারবেন না অনুমান করে বোধ হয় মানোয়েলদা-ই অ্যাভোরার পাণ্ডুলিপির মধ্যে বাংলা হরফের বদলে রোমান হরফ ব্যবহার করেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ঢাকা অঞ্চলে ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান-সমাজে পর্তুগীজ-বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হয়—যার মূল লক্ষ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার। জেসুইট পাদ্রী মার্কস্‌ আন্তোনিয়ো সাতুচি (Marcos Antonio Satuchi) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৬৭৯-১৬৮৪) বাংলার রোমান ক্যাথলিক মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সময়ে পর্তুগীজ পাদ্রীগণ বাংলা ভাষা শিখে অভিধান, ব্যাকরণ, প্রার্থনাপুস্তক প্রভৃতি রচনা করেছিলেন।[৩] তারও পূর্বে ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে দোমিনিক সোসা (Dominic Sosa) নামে এক জেসুইট পাদ্রী বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম

৩. দ্রষ্টব্য : সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৩ (পৃঃ ১৮০)

প্রার্থনাপুস্তক রচনা করেন।[৪] সুতরাং এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত যে, ১৫৯৯-১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে পর্তুগালের জেসুইট ও আগস্তিনীয় শাখার পাদ্রীগণ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, খ্রীস্টীয় প্রার্থনাপুস্তক ও তত্ত্বকথা-সংবলিত একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। অবশ্য তার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এর লেখক দোম আন্তোনিয়ো যে ভূষণার রাজপুত্র ছিলেন, তা থিরসো লোপেসের বিবরণী থেকে জানা যায়। তাঁর বিবরণীটি হস্টেন ইংরেজীতে অনুবাদ করে *Bengal Past and Present*-এ প্রকাশ করেন। অ্যাভোরায় এই পুঁথির শিরোনামায় আছে "ilho do Rey Busna," অর্থাৎ ভূষণার রাজার পুত্র। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে ফাদার আম্ব্রোসিয়ো-প্রদত্ত বিবরণেও তাঁকে ভূষণার রাজপুত্র বলা হয়েছে। এখানে তিনি সবিস্তারে দোম আন্তোনিয়োর জীবনকথা উল্লেখ করেছেন। সেই বিবরণী থেকে দেখা যাচ্ছে, আন্তোনিয়ো প্রথমে পিতৃধর্ম ত্যাগ করতে সম্মত হন নি—যদিও রোমান ক্যাথলিক ধর্মসাধনা ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন। তখন একদিন রাত্রে সন্ত আন্তোনিয়ো স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে রাজকুমারকে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। তিনি যে সত্যই রাজপুত্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে এই আদেশ দিয়েছিলেন তার চিহ্নস্বরূপ রাজপুত্রের গণ্ডদেশে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়ে যান। পরদিন প্রভাতে আন্তোনিয়ো সত্যই নিজের গণ্ডে পবিত্র ক্রুশচিহ্ন দেখতে পেলেন। এই চিহ্নটি তাঁর গণ্ড থেকে কোনও দিনই মুছে যায় নি। অতঃপর পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করতে রাজপুত্রের আর কোন আপত্তি রইল না। সন্ত আন্তোনিয়োর এই কৃপার জন্য রাজকুমার দোম (অর্থাৎ ধনী

৪. দ্রষ্টব্য : *Purchas—His pilgrimages*, Vol. X (ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ,' পৃঃ ২।৶০)

সম্মানিত ব্যক্তি) আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো (তাঁর ধর্মগুরুর নাম রোজারিয়ো) নামে পরিচিত হন।

অতঃপর দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আরাকান ত্যাগ করে পিতৃরাজ্য ভূষণায় উপস্থিত হন। তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনকে সর্বপ্রথমে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত করলেন। তাঁর গ্রামেই 'সন্ত নিকোলাস তলেন্তিনো মিশন' শুরু হল। অতঃপর তিনি প্রকাশ্যেই হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন চালাতে লাগলেন। আম্ব্রোসিয়োর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা নানাভাবে তাঁর ক্ষতির চেষ্টা করেন, এমন কি তাঁর প্রাণবিনাশেরও চেষ্টা হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ আম্ব্রোসিয়ো অবশ্য অনেক অলৌকিক গালগল্প লিখেছেন। যথা--একদা ব্রাহ্মণেরা বললেন, ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র ও বাইবেলের মধ্যে কোনটি যথার্থ সত্যধর্মপ্রতিপাদক, তা অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হোক। পুরাণ ও বাইবেলকে এক-সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করা হল। কিন্তু দেখা গেল, অগ্নিদেব অক্লেশে হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ উদরসাৎ করলেন, কিন্তু বাইবেলের উপর দন্তস্ফুট করতে পারলেন না। এই অলৌকিক ব্যাপারের পর বহু হিন্দু এবং কিছু মুসলমান, যারা দোম আন্তোনিয়োর পিতার প্রজা ছিল, তারা আন্তোনিয়োর কাছে খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কিছুতেই নিজেদের গোঁ ছাড়লেন না, তাঁরা পৌত্তলিকই রয়ে গেলেন। আন্তোনিয়োর মৃত্যুর পরেও মিশনারীরা ঐ গ্রামে অনেক দিন অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সন্ত নিকোলাস তলেন্তিনো মিশন আন্তোনিয়োর গ্রামেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবতঃ আন্তোনিয়োই তার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মৃত্যুর পরে স্থানীয় হিন্দুরা আশ্রিত মিশনারীদের নানাভাবে উৎপীড়িত করতে শুরু করলে এই মিশনের অধ্যক্ষ ফাদার লুইস দোস আঞ্জোস (Father Luis dos Anjos) ঢাকার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত নাগরী গ্রাম ক্রয় করে সেখানে মিশন স্থানান্তরিত করেন।

যশোহর ও খুলনার ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইসলাম খাঁয়ের শাসনকালে রাজা সীতারাম রায় যশোহর-খুলনা-ভূষণার জমিদারী পাবার পূর্বে সত্রাজিত রায় ভূষণার জমিদার ছিলেন। ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঢাকায় নিহত হন। তাঁর হত্যার পরে সংগ্রাম সিংহ (সংগ্রাম শাহ্) নামে এক অবাঙালী রাজপুত উক্ত জমিদারী পান। তাঁর সন্তান ছিল না বলে মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারী নবাবসরকারে অন্তর্ভুক্ত হয়। দোম আন্তোনিয়ো কি এঁদের কোন শাখাসম্ভূত? সংগ্রাম সিংহ মগ-বোম্বেটেদের দমন করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। দোম আন্তোনিয়ো খুব সম্ভব বাল্যে মগদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আরাকানে নীত হয়েছিলেন। তাহলে তিনি কি সংগ্রাম সিংহের বংশে জন্মগ্রণ করেছিলেন? এবং যেহেতু তিনি অপহৃত হয়েছিলেন সেই হেতু কি তাঁর পিতা (?) সংগ্রাম সিংহের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারী শাসক সরকারের খাস হয়ে গিয়েছিল? অথবা উক্ত দুটি রাজবংশ ছাড়াও ভূষণায় অন্য কোনও রাজবংশ ছিল, যে-বংশে দোম আন্তো-নিয়োর জন্ম হয়েছিল? আপাততঃ এ সমস্ত জল্পনার অবসান হবার মত তথ্য-উপাদান নেই। তবে পর্তুগীজ উৎস থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি ভূষণার রাজপুত্র ছিলেন। খ্রীস্টান হবার পর তিনি ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে আরাকান থেকে স্বদেশে পিতার জমিদারীতে ফিরে আসেন। এখানে তাঁদের অনেক হিন্দু-মুসলমান রায়তও খ্রীস্টান হয়েছিল। বলা বাহুল্য তিনিই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর গ্রাম কোষাভাঙা থেকে যখন সন্ত নিকোলাস দে তলেন্তিনো (Santo Nicolas de Tolentino) মিশনটি ঢাকার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত নাগরী গ্রামে স্থানান্তরিত হয় (এ-গ্রাম এবং এর গির্জা ও খ্রীস্টান সম্প্রদায় এখনও আছে), তার পূর্বেই আন্তোনিয়োর মৃত্যু হয়েছিল, তা না হলে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় ও প্রভাব থেকে মিশন ঢাকায় চলে যাবে কেন? আম্বোসিয়ো তাঁকে ভাওয়ালের মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বললেও তা যথার্থ

বলে মনে হয় না। উক্ত মিশনে আন্তোনিয়োর বাংলা পুস্তিকাটি ('ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ') ব্যবহার করা হত, সেকথা আম্ব্রোসিয়ো গোয়ার শাসককে জানিয়েছিলেন। কারণ ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঐ মিশনে আন্তোনিয়োর পুঁথিটি দেখেছিলেন। তাতে মূল পুঁথিটি বাংলা হরফে লেখা ছিল, তার সঙ্গে পর্তুগীজ অনুবাদও ছিল। মুদ্রণের জন্য লিসবনে যে পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হয়, তাতে বাংলা হরফের বদলে রোমান হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি, যেটি মুদ্রণের জন্য লিসবনে প্রেরিত হয়েছিল, সেটি সম্ভবতঃ প্রথম পুঁথির নকল। পুঁথির কোন বাংলা আখ্যাপত্র নেই, সুতরাং এর যথার্থ বাংলা নাম কি ছিল জানা যাচ্ছে না। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' নামটি পরবর্তী কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুদ্রণের সময় প্রদত্ত হয়েছে। পুঁথির শুরুতে পর্তুগীজ ভাষায় এইভাবে পুঁথির পরিচয় দেওয়া হয়েছে ঃ-

> 'Argumento e Disputa sobre a Ley entre hu Christao, ou Catholo Romo, e hu bramene ou Me dos genitos, em q se mostra na Lingua benga a falside da seita dos genitos, e a verdade infalivel da nossa Sta Fee Catholica em q so ha o camo da salvacao e o conhe cimto da verdadra Ley de Do.'

অর্থাৎ—"জনৈক খ্রীস্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার, তাহাতে বঙ্গভাষায় হিন্দুধর্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। একমাত্র এই ধর্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সন্ধান আছে।"[৫]

৫. ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন অনূদিত। ব্রা. রো. ক্যা. সং. পৃঃ ৩।৵০

এর পর বলা হয়েছে : 'Compos to par aqa grde Cathequista Christao q converteo tantos gentios chamado Dom Antonio fo do Rey de Busna...' অর্থাৎ "ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো নামক বিখ্যাত খ্রীস্টান শাস্ত্রবিৎ (যিনি বহু হিন্দুকে দীক্ষিত করিয়াছেন) কর্তৃক বিরচিত" (সুরেন্দ্রনাথ সেন অনূদিত)। অতঃপর পুঁথিটি যিনি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে : 'Vertida em portugues pelo P. Fr. Manoel da Assumpsao religo de Congregasao dos Ermitas de S Ago da India natal da Cidade d' Evora sendo actualmte Reitor da missao de Bengapa os Missionarios pudere disputar na dita lingua co os bramenes e gentios Vai por modo dialogo entre o Romano Cato e o bramene gentio.' অর্থাৎ "যাহাতে মিশনারী প্রচারকেরা উক্ত (বঙ্গ) ভাষায় ব্রাহ্মণ হিন্দুদিগের সঙ্গে বিচার করিতে পারেন তাহার জন্য ভারতীয় সাধু আগুস্তিনীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বাঙ্গালার প্রচারকমণ্ডলের বর্তমান অধ্যক্ষ এভোরা সহরনিবাসী পাদ্রী ভাই মানুয়েল দা আসুম্পসাঁও কর্তৃক পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। রোমান ক্যাথলিক এবং ব্রাহ্মণ-হিন্দুর মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত।" (অনুবাদ—ঐ)

এই তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে- হিন্দুধর্মের অসারতা এবং ক্যাথলিক খ্রীস্টানধর্মের অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠার ('falside da seita dos gentoos, e a Verdade infalivel da nossa Sta Fee Catholica') জন্যই ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো কাল্পনিক খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মণের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় এই পুস্তিকা রচনা করেন। ফাদার হস্টেন এই পুস্তিকার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'A catechism of the Christian Doctrine in the from of a dialogue,'— সুতরাং এই প্রচারধর্মী বিতর্কপুস্তিকার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হবে না।

যে সমস্ত পর্তুগীজ মিশনারী বাংলাদেশে প্রচারকার্যের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা যাতে দোম আন্তোনিয়োর বাংলা পুস্তিকাটি ভালো করে অধিগত করে খ্রীস্টানধর্মের অভ্রান্ততা ও হিন্দুধর্মের অসারতা ব্যাখ্যার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হতে পারেন, সেইজন্য মানোয়েল দা আস্‌সুম্পসাঁও এটির পর্তুগীজ অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ ও মূল বাংলাগ্রন্থ (রোমান হরফে লেখা) মুদ্রণের জন্য লিসবনে প্রেরিতও হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ আন্তোনিয়োর বাংলা মূল এবং মানোয়েল-কৃত তার পর্তুগীজ অনুবাদ কোনোটাই মুদ্রিত হয় নি। শুধু মানোয়েলের দুখানি গ্রন্থ৬ মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' বাংলা গদ্যের বিবর্তন বিচারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে পাঠকের কৌতূহল উদ্রেকের জন্য মূল পুঁথির রোমান হরফে লেখা বাংলা গদ্য এবং তার বাংলা লিপ্যন্তরাকরণ উল্লিখিত হচ্ছে।

Bramane—Tomi care bhoso ?

Romo—Poromexorere Purno Bromere.

B—Tobe tomora boro utom bhosona bhoso, amora tahare bhusi.

R—Zodi tomora xei Purno Bromere bhoso tobe queno eto cubit cudhoram nana odhorma bhosona deqhi ?

B—Tomi emot guiamonto hoia amardiguer Poromexorere ninda coroho ? ehate tomardiguer xastre oparniman nahi.

R—Amarghore xastre liqhiasen ze zon dhormo

৬. (ক) *Crepar Xaxtrer Arth'bhed*

(খ) *Vocabulario em idioma Bengalla, e Portuguez*

ninda core, xe boro naroqui; ebons ze zon odhormere dhormo bole xe moha naroqui.

B—Tobe to tomardiguer xastre *** ze ninda corile moha naroqui hoe; tobe queno ninda corila ?

R– Amito dhormo ninda corina, dhormere dhormo cohi; odhormere odhormo cohi; zononire zononi cohi; strire stri cohi; Bromere Bromon cohi; Chondalere chondal cohi; dhugdere dhugdo cohi; Gochonere gochona cohi; Omertere omerto cohi; bixere bix cohi; emot cothae punio bade pap nahi; ehate protoquie na zanile dhormadhormo zanite na parc; poriname mucti na hoe eha na zanile e caron ehare ninda na cohi.

বাংলা লিপ্যন্তরীকরণ [৭] :

ব্রাহ্মণ—তুমি কারে ভজো ?

রোম পরমেশরেরে পূর্ণো ব্রমেরে।

ব্রা—তবে তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি।

রো—যদি তোমোরা সেই পূর্ণো ব্রমেরে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত (কুরীত ?) কুধরান নানা অধর্মো ভজোনা দেখি ?

ব্রা—তুমি এমত গিয়ামন্তো হইয়া আমারদিগের পরমেশরেবে নিন্দা করহ ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমাণ (অপরিণাম ?) নাহি ?

৭. লিপ্যন্তরীকরণে রোমান হরফে লেখার যথাসম্ভব অবিকল উচ্চারণ ব্যবহৃত হয়েছে।

রো— আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্ম্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যে জন অধর্ম্মেরে ধর্ম্মো বলে সে মহা নারকী।

ব্রা—তবে তো তোমারদিগের শাস্ত্রে * * * যে নিন্দা করিলে মহা নারোকী হএ, তবে কেনো নিন্দা করিলা ?

রো— আমি তো ধর্ম্মো নিন্দা করি না, ধর্ম্মেরে ধর্ম্মো কহি ; অধর্ম্মেরে অধর্ম্মো কহি ; পুণ্যোরে পুণ্যো কহি ; জননীরে জননী কহি ; স্ত্রীরে স্ত্রী কহি ; ব্রমেরে ব্রমন কহি ; চণ্ডালেরে চণ্ডাল কহি ; ধুগদেরে ধুগদো কহি ; গোচোনেরে (গোরোচনা ?) গোচোনা কহি ; অমেরতেরে অমেরতো কহি ; বিষেরে বিষ কহি ; এমত কথাএ পুণ্যো বাদে পাপ নাহি ; এহাতে প্রতক্ষ্যে না জানিলে ধর্ম্মাধর্ম্মো জানিতে না পারে ; পরিণামে মুক্তি না হএ এহা না জানিলে, এ কারোণ এহারে নিন্দা না কহি।

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এর প্রারম্ভভাগ থেকে এই যে নমুনা উদ্ধৃত হল, তাতে দেখা যাচ্ছে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক হিন্দুধর্মকে মিথ্যাধর্ম ও অযথার্থ প্রমাণের জন্য গোড়া থেকেই সুতার্কিকের মতো যুক্তি-জাল বিস্তার করেছেন। বলা বাহুল্য দোম আন্তোনিয়ো খ্রীস্টান পাদ্রীর যুক্তিকে অধিকতর শাণিত ও ভারসহ করেছেন এবং ইচ্ছা করেই ব্রাহ্মণ-টিকে যুক্তিতর্কে শোচনীয়রূপে হারিয়ে দিয়েছেন। লেখক নিজে হিন্দু-সন্তান ছিলেন, বাল্যে অপহৃত হলেও হিন্দুর আচার-আচরণ ও ধর্মকর্মের যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ রাখতেন। হিন্দুর শাস্ত্রাদি সম্পর্কে নানা ভ্রমপ্রমাদ করলেও তার বিরুদ্ধে বেশ জোরালো প্রতিযুক্তি দিয়েছেন। যে মুক্ত বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে দোম আন্তোনিয়ো রোমান ক্যাথলিক যাজককে দিয়ে হিন্দুধর্ম নস্যাৎ করতে চেয়েছেন, সেই যুক্তিতর্ক তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হলে তিনি কি জবাব দিতেন জানি না। সে যাই হোক, এই রোমান ক্যাথলিক বাংলা সাহিত্য বাংলা গদ্য ও বাঙালী সমাজের সঙ্গে যে যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কযুক্ত তা স্বীকার করতে হবে।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী

ইদানীং বাঙালী সমাজে চেতনা ও ঐতিহ্যের অবনমন হয়েছে। শতাব্দীকাল পূর্বে শিক্ষার স্বল্পতা, হানিকর অজ্ঞতা ও পাশ্চাত্ত্য রীতির হাস্যকর অনুকরণ সত্ত্বেও এ জাতি তখনও দেহে-মনে সজীব ছিল। হয়তো তখন শিক্ষিতজন মদ্যপান করে হতচেতন হয়ে খোলা ড্রেনে আশ্রয় নিত, ইয়ং বেঙ্গল দল ভারতীয় জীবনবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করে আকাশবিহারী কল্পনাকে সুদূরবর্তিনী শ্বেতদ্বীপের দিকে উধাও করে দিয়ে এক ধরনেব কবন্ধ জীবনকে সত্যকার শিক্ষাদীক্ষা বলে আনন্দে স্বীকৃতি দিয়েছিল। একদল দলবেঁধে খ্রীস্টান হয়েছিল, আর এক দল প্রাচীন ও বিগত হিন্দু সংস্কৃতিকে পুরাতন আকারে-আয়তনে ফিরিয়ে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। তা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী যথার্থ ই বাঙালী ছিল। আধুনিক কালেব মতো 'বকচ্ছপে' পরিণত হয় নি।

বিদ্যাসাগর প্রাচীনপন্থী গ্রামীণ টুলো পণ্ডিতের ঘরে জন্মালেন, বাল্যে পুরাতন শিক্ষাধারায় লালিত হলেন, সংস্কৃত কলেজে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের উষাকাল অতিবাহিত হল। মহেশ ন্যায়রত্নাদির মতো শুধু সংস্কৃত বিদ্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও তিনি দেশমান্য পণ্ডিত বলে সম্মান লাভ করতেন, কিন্তু কালে বিস্মৃত হয়ে যেতেন। আজ যে তিনি দেশের হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, নিত্যস্মরণীয় দেবমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন— শুধু সংস্কৃত বিদ্যা নিয়ে থাকলে তিনি নিশ্চয় সে-স্থান অধিকার করতে পারতেন না। তাঁর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যে বহ্নিদীপ্তি প্রকাশ পেত, সে

অরণিমন্থনের উত্তপ্ত স্বাদ তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন তা নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন।

১৮৬৪ সালে ২রা সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে বিষণ্ণ, বিপদাপন্ন মধুসূদন সপরিবারে অর্থাভাবে দারুণ দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই সময়ে কলকাতা থেকে বিদ্যাসাগরের প্রেরিত দেড় হাজার টাকা তাঁর হাতে এল। কৃতজ্ঞ মধুসূদন তাঁর সম্বন্ধে লিখলেন, "the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother." মধুসূদন বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রাচীন জ্ঞানতপস্যা, য়ুরোপীয়ের উদ্দীপনা এবং বাঙালী মায়ের স্নেহব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছিলেন। মহাপুরুষের চরিত্র অতি বিচিত্র, অনেক সময়ে ব্যাখ্যাতীত। তবু মধুসূদন বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আংশিক পরিচয় পেয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রথম দুটি গুণ বুদ্ধিগত এবং সার্বজনীন, অর্থাৎ এই দুই গুণকে বুদ্ধি দিয়ে যে-কোনও ব্যক্তি বুঝতে পারবেন। কিন্তু বাঙালী মায়ের সন্তানের প্রতি অপরিমেয় মমতার স্পর্শ মধুসূদন বিদেশে বসে লাভ করেছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। এটি হল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

এরপর নানা জনের স্মৃতিকথা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের পুরাতন সংস্কারের প্রতি অনীহা সঞ্চারিত হয়েছিল, অবশ্য তার মূল কারণ মানবপ্রেম – লোকাচারকে আঘাত দেবার মতো দুঃসাহস এবং সুদৃঢ় ঋজু চারিত্রমূর্তি—এই গুণগুলি সেকালের অনেককে তাঁর প্রতি প্রবলবেগে আকৃষ্ট করেছিল। কেউ-বা তাঁকে মনে করতেন, ইনি বোধহয় ঠিক আমাদের মতো নন। এরগুসভায় তিনি সদর্পে ন্যগ্রোধের মতো যোজন-বিস্তারী হয়েছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচারের দ্বারা দেশের পুরাতনপন্থীদের বিষনজরে পড়েছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ক্রুদ্ধ হতে পারে, এমন কাজ তিনি কর্তব্য অথবা মানবপ্রেমের বশে অবলীলাক্রমে করতে পারতেন। হিন্দু স্মৃতি মতে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় কৃত্যগুলি অনুসরণ করতেন বটে, কিন্তু এ-সমস্ত আচার-আচরণের প্রতি তাঁর যেন শ্রদ্ধা

ছিল না। তিনি আস্তিক ছিলেন কিনা তাই নিয়েও কথা উঠেছে। যথেচ্ছাচারী মধুসূদন, যিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কিন্তু এ অভিযোগ ওঠে নি। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর সীমাবদ্ধ বাঙালীয়ানার পিঞ্জর ভাঙতে পেরেছিলেন, অথচ ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদের মতো 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল' হতেন না, হিন্দুধর্মের নামে ক্ষিপ্ত হতেন না। আবার রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণের মতো ধর্ম নিয়ে আদৌ কৌতূহলী ছিলেন না। হিন্দুর সমাজ-সংস্কার সব সময়ে মেনে চলতেন না, কায়স্থ বন্ধুব পাত থেকে মাছের মুড়ো কাড়াকাড়ি করে খেতে কৌতুক-রঙ্গই বোধ করতেন, ব্রাহ্মণসুলভ কোন সঙ্কোচই তাঁর ছিল না। কাশীধামে বিশ্বনাথ দর্শনে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কিন্তু জনক-জননীকে হর-পার্বতী রূপে দর্শন করতে চেয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের একনিষ্ঠ ছাত্র হয়েও প্রয়োজনস্থলে সংস্কৃত কলেজ থেকে বেদান্ত-মীমাংসাদি তুলে দিতেও আপত্তি করেন নি এবং 'লীলাবতীর' স্থলে ইউক্লিড্ প্রচলন করতেও কুণ্ঠিত হন নি। সেইজন্য সেকালের বাঙালীরা দূর থেকে তাঁকে ভয় করত, শ্রদ্ধা করত। মনে করত, নিত্য সাহেবদের সঙ্গে সহবাস করে ব্রাহ্মণ সন্তান বিদ্যাসাগর অহিন্দু আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গোপনে গোপনে কেউ কেউ তাঁকে খ্রীস্টানও বলতেন। বিহারীলাল সরকার এবং তাঁর প্রতিধ্বনিকার সুবলচন্দ্র মিত্র, বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখলেও তাঁর উক্ত আচরণ তাঁরা আদৌ সমর্থন করতে পারেন নি, প্রয়োজন স্থলে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন। তাই সেকালের বাঙালীরা তাঁকে কতটা আপনজন করে নিয়েছিলেন, তাতে গভীর সন্দেহ আছে। কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে বাঙালীয়ানার সুদূর পার্থক্যও দেখেছেন। ১৩০২ সালে ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগর-চরিত' নামে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন তাতে তিনিই সর্বপ্রথম এই মনোভাব ব্যক্ত করেন। সেকালের অতি সাধারণ অতি নগণ্য 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব' ও 'মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালী সন্তান' এবং বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ

ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতি বিরল…।" এখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন যে, অপদার্থ অসার বাঙালীসমাজে এমন সারবান মহামহিম উত্তুঙ্গ দেবদারুর আবির্ভাব কেমন করে হল তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। উক্ত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে য়ুরোপীয়-সুলভ "নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এবং আত্মনির্ভরতা" লক্ষ্য করেছেন। তৎকালে প্রচলিত বাঙালী সমাজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘোর বৈপরীত্য দেখে রবীন্দ্রনাথ সক্ষোভে বলেছেন, "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" এ ক্ষোভের অর্থ, সেকালের বাঙালী চরিত্রে যে-সমস্ত সদ্‌গুণের একান্ত অভাব ছিল, বিদ্যাসাগরের মধ্যে তার ভূরি-পরিমাণ দৃষ্টান্ত ছিল--যে সদ্‌গুণের কিছু কিছু স্বাধীনচেতা য়ুরোপীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। অথচ তিনি বাঙালীই ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না রেখেই বলেছেন, "বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব।" আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এই vertebrate অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীর ঋজুতা লক্ষ্য করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এই ঋজুতা তৎকালীন বাঙালী-চরিত্রে বড়ো-একটা ছিল না। এর স্পষ্ট পরিচয় পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যেই স্ফুটতর হয়েছিল। তাঁর মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারেঃ "ইউরোপীয়দের আমরা যত নিন্দাই করি না কেন, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের

মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকটে নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়দের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল" ('চরিত-কথা')। রবীন্দ্রনাথের মতে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই যে য়ুরোপীয়সুলভ পৌরুষ-দৃঢ়তা, এটি তাঁর কৌলিক সংস্কার এবং পৈতৃক দায়াদ। এ-গুণ য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে পাওয়া নয়, বিদ্যাসাগর তাঁর পিতামহের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এই অভিমতের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের মতামতের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই" (তদেব)। তাঁরও মতে, বিদ্যাসাগর য়ুরোপীয়দের সংস্পর্শে আসবার পূর্বেই উক্ত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন এবং সে অর্জনের ধনভাণ্ডার হল তাঁর পৈতৃক সংস্কার ও পারিবারিক আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ ছিলেন যেন সাক্ষাৎ জাতবেদা অগ্নি। তাঁর পৌত্রের চরিত্রে সেই বহ্নিমহিমা সঞ্চারিত হয়েছিল। এটি য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে পাওয়া দাক্ষিণ্যের দান নয়।

একালের একজন রসিক সমালোচক বাঙালী বিদ্যাসাগরের চরিত্রে বাঙালী স্বভাব-বহির্ভূত সদ্‌গুণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন এবং বাঙালী চরিত্রের স্বার্থপরতা ও নীচতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। মধুসূদন বিদেশে সপরিবারে ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে যখন দেউলিয়ার শেষ আশ্রয় কয়েদখানায় প্রেরিত হবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন স্বদেশের এক বাঙালী অর্থাৎ বিদ্যাসাগর নিজে ঋণ করে তাঁকে প্রার্থিত অর্থসাহায্য পাঠিয়ে আসন্ন দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেন। তার পূর্বে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সেই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তির্যক ব্যঙ্গের সুরে এই সমালোচক ঊনবিংশ শতকের বাঙালী-

চরিত্র এবং বিদ্যাসাগরের তদতিরিক্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর বাঙালী ছিলেন না; বিদেশগত বন্ধুকে তিনি মনে রাখিতেন; তাঁহার সমবেদনা মৌখিক ও লজ্জা কেবল চাক্ষুষ ছিল না; কথা দিয়া তাহা রক্ষা করিতেন; দানের প্রয়োজন বুঝিলে ঋণ করিয়া টাকা দিতেন; সুখের দিনের বন্ধুর বিপদ দেখিলে কাজের ছুতায় সরিয়া পড়িতেন না; গাঁছে তুলিয়া দিয়া মই টানিয়া লইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না; এক কথায় তিনি বাঙালী ছিলেন না।"*

এই ব্যঙ্গও রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সেকালে বাঙালীচরিত্রে অনেক অসাধারণ মহত্ত্বের সঙ্গে কিছু কিছু ভ্রষ্টতাও ছিল। এই সমালোচকের মতে, চতুর, স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী বাঙালীর সঙ্গে বাঙালী বিদ্যাসাগরের আশমান-জমিন ফারাক্। পৌরুষ ও দয়া এ দুটি গুণই বিদ্যাসাগরের মহত্তম বৃত্তি; ছোট-খাট স্বার্থ ও নীচতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন; যে ধরনের চারিত্রিক ত্রুটি সেকালের অনেক বিখ্যাত বাঙালী চরিত্রে অভাব ছিল না, তা বিদ্যাসাগরের চরিত্রে দেখা যায় না।

এই সমস্ত মন্তব্য থেকে মনে হতে পারে, অতি সাধারণ, অতি স্বার্থপর বাঙালীর যে-ধরনের স্বভাবপ্রকৃতি সেকালে প্রায়শই দেখা যেত, সেই সঙ্কীর্ণচেতা বাঙালীত্বের মলিনতা বিদ্যাসাগরের শুভ্রসমুজ্জ্বল চরিত্রকে স্পর্শও করতে পারত না। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই যে পাশ্চাত্ত্য জাতিসুলভ ঋজুতা, এ হল বিদ্যাসাগরের কৌলিক অধিকার। এ-ভাব তিনি পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শ থেকে সংগ্রহ করেন নি। রামেন্দ্রসুন্দরও প্রায় অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক কালের সমালোচক বিদ্যাসাগর চরিত্রে যে-সমস্ত সদ্‌গুণ লক্ষ্য করেছেন, সেকালের বাঙালী সমাজে তার বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। অবশ্য উক্ত সদ্‌গুণ শুধু বাঙালী কেন, সাধারণভাবে কোন ভারতীয়

* প্রমথনাথ বিশী—'মাইকেল মধুসূদন'(জীবন-ভাষ্য), ১৩৪৮ পৃ. ১৩২

চরিত্রেই পাওয়া যেত না - এমন কথাও কেউ কেউ বলতে পারেন, এবং সেদিক থেকে, বিদ্যাসাগর ভারতীয়ই ছিলেন না, এমন কথা বললে তা 'পরিহাস বিজল্পিতম্' বলে মনে না হতেও পারে। সেকালের উনবিংশ শতাব্দীর বহু শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্ত্য ভাব-রসেই নিমজ্জিত ছিলেন, ইংরেজী ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করেছিলেন, অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে এবং বিলেতি সুরা পান করে উন্মত্ততাকেই সুস্থতা বলে মেনে নিয়েছিলেন। আর একদল শঙ্কিতচিত্তে পশ্চিমী সভ্যতা-ঐতিহ্যকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রাচীন ও গতায়ু হিন্দু সভ্যতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের চরিত্রে বিদ্যাসাগরের মতো মহত্ত্ব ও ঋজুতা অতি অল্পই দেখা গেছে। তাই বিদ্যাসাগরকে যেন একটি বিচিত্র ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে বলেছেন, "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়- আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য।" এখানে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী ও মানুষ বলে যে দুই শ্রেণী নির্দেশ করেছেন, তার তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে মনুষ্যত্ববোধ অনেক হ্রাস পেয়েছিল। "রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করো নি"- কবির এই খেদোক্তিও উক্ত মনোভাবের অনুরূপ।

এই সম্পর্কে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে কেউ কেউ 'জনবুলের' অন্যায় জেদও লক্ষ্য করেছেন। এ-ও অনাবশ্যক। যজ্ঞাগ্নি থেকে দ্রুপদকন্যার জন্ম হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-দেশের যজ্ঞভূমি থেকে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। তাঁর অস্তিত্বের জন্য য়ুরোপীয় জাতিচরিত্রের সাদৃশ্য সন্ধান নিরর্থক। বাঙালী চরিত্রের সংকীর্ণতা ও অন্যান্য হানিকর প্রভাব তাঁর চরিত্রে ছিল না বলে

বাঙালীর আত্মনিন্দাও নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্যক্তিরা (রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রাদি)—এঁদের যে বিচিত্র চরিত্র ও কৃতিত্ব, এবং অসাধারণ মানসিকতা আমাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় আকর্ষণ করে, তাও কি য়ুরোপীয়সুলভ গুণের ফলশ্রুতি বলে গ্রহণ করতে হবে? য়ুরোপের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ কোন কোন দিক দিয়ে কিছু প্রতীচ্য ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেযুগের সমাজ-নেতারা কেউ-ই বাঙালীত্ব হারান নি। যদি তাঁরা বাঙালীর কুল-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে শিরোধার্য করতেন তা হলে এদেশে একটি বিচিত্র Anglo Bengali ভাবের জন্ম হত—যার অর্থ হত আত্মহত্যা। ডিরোজিও-পন্থী এবং রামগোপাল ঘোষের দলবল নিজেদের পায়ের তলার মৃত্তিকাকে অস্বীকার করতে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও শুধু উপরিস্তরে যৎসামান্য আঁচড় কেটেছিলেন, ভিতরে নখরাঘাত করতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগরের যে অদ্ভুত চারিত্রমূর্তি আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে বাঙালীর কৌলিক অধিকার। সে স্বভাবধর্ম অটুট ছিল বলেই পাশ্চাত্ত্য প্লাবন সত্ত্বেও শিক্ষিত বাঙালী দিগন্তে ভেসে যায় নি। স্বভাবধর্মের অর্থ হল, বাঙালীর বহুকালাশ্রিত শীল, সদাচার ও অন্যান্য মানসিকতা, যা একটা জাতিকে জলপ্লাবনের সময়ে 'নোয়ার নৌকা'র মতো আশ্রয় দান করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী যদি যথার্থই চরিত্রভ্রষ্ট হত তাহলে শুধু বিদ্যাসাগর কেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—কারও আবির্ভাব হত কিনা সন্দেহ। হলেও তাঁদের অরণ্যে রোদন করতে হত। বিরোধ ও বরণের মধ্য দিয়ে সেকালের বাঙালী এঁদের গ্রহণ করেছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে দারুণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জাতি যে জাগ্রত, সজীব ও সচেতন ছিল তার প্রমাণ হল কখনও বিরোধিতা, কখনও আনুকূল্য। যদি জনসাধারণ এঁদের আবির্ভাব ও ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে নীরব ঔদাসীন্য পোষণ করত, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হত, বাঙালী সমাজ জুলু-বাণ্টু-হটেনটট্-

মাওরির মতো মৃত্যুর সাধনা করেছে, জীবনের সাধনা নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা বহমান, যার ধারাবাহিকতায় শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, নব্যন্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও তন্ত্রাশ্রিত শক্তিসাধনার ক্রমবিকাশ, লোকযান, আউল-বাউল-সাঁইগুরু-কর্তাভজা-মুর্শিদা-মারফতি প্রভৃতি প্রতীকী রহস্যসাধনার অনুশীলন-- তারই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর কৌলিক মেলবন্ধন, তার সঙ্গেই রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের নাড়ির যোগ। সে-কথা ভুললে বিদ্যাসাগরকে ভিন্ন গ্রহের আগন্তুক বলে মনে হবে এবং তাঁর অস্তিত্বকে apocryphal বলে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হবে। বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালী-মনের ধাতু দিয়েই গঠিত, এক কথায় বিদ্যাসাগর বাঙালীই ছিলেন। তবে যে তাঁর চরিত্রে য়ুরোপীয়-সুলভ কিছু প্রকট গুণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে মহাপুরুষের সাধারণ লক্ষণ, তা য়ুরোপের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। আমরা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী বলে বিদ্যাসাগরের কৌলিক অধিকারকে বাঙালীর স্বভাবধর্ম না বলে তাকে বিদেশী-প্রভাবিত বলে ভাবতে ভালোবাসি, তাঁকে অবাঙালী-সুলভ চরিত্রমূর্তি বলতে পারলে মানসিক স্বস্তি বোধ করি। আত্মদূষণ একালের বাঙালীর একপ্রকার ফ্যাশনে পর্যবসিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীরা বাঙালীই ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্য থেকে যে-সমস্ত মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল, এখনও আমরা তাঁদের আলোকেই আলোকিত। বাঙালীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ গুণ, তা তাঁদের মধ্যে পুরো মাত্রায় বর্তমান ছিল। পরবর্তীকালে আমরা তা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি বলে বিদ্যাসাগরের মহৎ গুণগুলিকে য়ুরোপীয় সদ্‌গুণ বলে মনে হচ্ছে। আসলে যেদিন বাঙালী দেহে-মনে সুস্থ ছিল, স্বাভাবিক ছিল, সেদিন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষের আবির্ভাব আমাদের বিব্রত করে নি। গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে বাঙালী ক্রমাগত অধঃপতনের পিছল পথ বেয়ে নেমে চলেছে। তাই বিদ্যাসাগরের মধ্যে আমরা য়ুরোপীয় সদ্‌গুণের প্রতিবিম্ব দেখতে অভিপ্রয়াসী। চরিত্র, বীর্য, পৌরুষ, মহত্ত্ব, প্রেম ও

করুণা—এ-সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। একদা এ-সমস্ত গুণ বিদ্যাসাগরের মতো দেশনেতাদের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিল। আজ আমরা ভীরুতার জড়ত্বে ডুবে আছি বলে তাঁকে ঠিক আমাদের বলে মেনে নিতে পারছি না।

বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন ?

বিদ্যাসাগরের তিরোধানের প্রায় আশী বৎসর পরে তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জল্পনার হেতু ও তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। মানবপ্রেমে আকণ্ঠমগ্ন দেশহিতব্রতী বিদ্যাসাগর আজ দেবমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। একাধিক স্থলে তাঁর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর আসল অধিষ্ঠান মানুষের চিত্তলোকে। জ্ঞান, কর্ম, প্রেম ও পৌরুষের এমন সমন্বয় একব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, গ্রামীণ সংস্কারবিজড়িত পটভূমিকায় লালিত হয়ে এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী শিক্ষা-দীক্ষার অনুশীলন করে তিনি যে কীভাবে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম, লোকহিতৈষণা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মানবতাবাদের অনুরূপ মানুষের কল্যাণচিন্তা নিজের অন্তর্লোকে স্থাপন করলেন, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

সে-যুগে বিদ্যাসাগরকে কী দৃষ্টিতে দেখা হত, তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর ছবি ছাপিয়ে বিক্রয় করা হত, এবং তা বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থানলাভ করেছিল—সে-যুগে আর কোনও বাঙালী জননায়কের জীবিতকালে এ সৌভাগ্য ঘটেনি। তাঁর অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য, করুণাঘন মানবকল্যাণব্রত এবং অনমনীয় পৌরুষ সে যুগেই তাঁকে বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গসমাজে বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে কত গল্পকাহিনী কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীরা তাঁর সম্বন্ধে পরবর্তীকালে অনেক ছোট-বড়ো স্মৃতিকথা

লিখে গেছেন। তা থেকে তাঁর একটি দিক সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক নতুন দৃষ্টিলাভ করতে পারেন। সেটি হল ধর্মমত, ঈশ্বরসত্তা ও পারমার্থিক চেতনা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান-বিশ্বাস।

তাঁর জীবিতকালে যেমন তাঁর ভক্তসংখ্যার সীমা ছিল না, তেমনি আবার কেউ কেউ অন্তরালে তাঁর সমাজসংস্কার-সংক্রান্ত মতামত নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনাও করতেন। হিন্দুর অনেকগুলি সযত্নলালিত সামাজিক আচার-আচরণকে বিদ্যাসাগর মানবপ্রেম ও করুণার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহের বিরোধিতা দ্বারা নিজ অন্তরশায়ী অগ্নিগর্ভ পৌরুষের দিব্যালোকে অর্থহান, মূঢ় ও নির্মম সমাজ-প্রকরণকে অযৌক্তিক, ঘৃণার্হ ও বিনাশযোগ্য প্রমাণ করেছেন। সংস্কার এমন গভীরভাবে যুগযুগান্ত ধরে আমাদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে, প্রাজ্ঞজনও সেই সমস্ত অভ্যস্ত আচার-আচরণের নাগপাশে জড়িত হয়ে কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হন। বিদ্যাসাগর তারই বিরুদ্ধে যে-অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তা শুধু 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য শিক্ষিতজনের পশ্চিমঘেঁষা 'রিফর্মেশন' নয়। তিনি যুক্তির চেয়ে মানবপ্রেমের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে এবং নারীর অশ্রুমোচনের সংকল্পে অটল থেকে মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো বীরবিক্রমে অগ্রসর হয়েছেন। প্রেম ও করুণাই তাঁর সমগ্র চেতনাকে অধিকার করেছিল বলে তিনি অতি সহজেই সংস্কার ত্যাগ করে নিরঞ্জন সত্যকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন—যেরকম অনুরাগ ও মমতার সঙ্গে জননী তাঁর সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেন।

তবু প্রশ্ন উঠেছে, সে-যুগেও উঠেছিল। বিদ্যাসাগর কি প্রচলিত হিন্দু মতাদর্শানুসারে ঈশ্বরবিশ্বাসী আস্তিক্যবাদী পুরুষ ছিলেন? বাহ্যতঃ তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কোন কোন আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিছু উদাসীন ছিলেন; উপরন্তু যে সমস্ত পুরাতন সংস্কারের উপর আঘাত হেনেছিলেন সেগুলি ছিল সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের প্রাণের সামগ্রী। সুতরাং তাঁর জীবিতকালেই তাঁর ধর্মমত নিয়ে আড়ালে-আবডালে

অনেক আলোচনা হত। ছদ্মনামে লেখা তাঁর ‘ব্রজবিলাস’-এ তিনি বলেছেন যে, সে-যুগের সমাজপতিরা তাঁকে গোপনে খ্রীস্টান অপনাম দিয়ে নিন্দা করতেন। কারণ তিনি হিন্দুর সামাজিক সংস্কারগুলিকে সর্বদা শিরোধার্য করতেন না।[১]

বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলে প্রথম প্রচার করেন তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের বহুকাল পরে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন ঃ

> "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধ হয় তোমরা জান না ; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাও কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। ··· পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশের ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকাল-পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?"[২]

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার (‘বিদ্যাসাগর’) এবং সুবলচন্দ্র মিত্র (*Iswar Chandra Vidyasagar--Story of his life and works*) রক্ষণশীল মনোবৃত্তিবশতঃ তাঁদের গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের কোন কোন সমাজসংস্কারেচ্ছার প্রশংসা করতে পারেন নি। তাঁদের ধারণা, বিদ্যাসাগর প্রবৃত্তিমুখী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে হিন্দুর নিবৃত্তিমুখী সনাতন সংস্কারে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিহারীলাল তো মুক্ত-কণ্ঠেই বলেছেন, "অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক

---

১. "এমন কি পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয়, বহুদর্শী, বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে) খৃষ্টান বলিয়া থাকেন।" —ব্রজবিলাস (দেবকুমার বসু সম্পাদিত ‘বিদ্যাসাগর রচনাবলী’ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩)

২. বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’ পৃঃ ১৩১-১৩২, (বিদ্যা-ভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ)

দৃষ্টি রাখিলেন না কেন? ···বিদ্যাসাগর কালের লোক।[৩] কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্মে আঘাত লাগিয়াছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"[৪] বিদ্যাসাগর দয়া ও করুণার বশে হিন্দুর সনাতন ধর্মের অন্যথাচরণ করেছিলেন, এমন কি উপনয়নের পর সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্রও ভুলে গিয়েছিলেন।[৫] এর থেকে বিহারীলাল অনুমান করেছেন যে, বাল্যকাল থেকেই হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছিল। উত্তরকালে শ্বেতাঙ্গ-সান্নিধ্যে এসে তিনি হিন্দুর নিত্যকর্মের প্রতি কিছু উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন, এবং সেজন্য বিহারীলাল অনুযোগ করেছিলেন।

৩. সুবলচন্দ্র মিত্রও এই মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "Vidyasagar was a man of the age; he followed the course indicated by it. No doubt this course has brought on a greater mischief to the real Hindu and has materially injured Hindu Religion, has propelled the Hindu Society with great force in the direction of disorganisation; but Vidyasagar ought not to be blamed for it. God alone, who made him with such materials, knows why he did so."— *Iswar Chandra Vidyasagar—Story of his life and works*. P. 275,

৪. এই প্রসঙ্গ তিনি আর একবার উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. চণ্ডীচরণ ('বিদ্যাসাগর', ১ম সং, পৃঃ ৪৮) এবং শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ('বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত', বুকল্যাণ্ড প্রকাশিত নূতন সংস্করণ, পৃঃ ৩০) এ বিষয়ে একই কথা বলেছেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে ('বিদ্যাসাগর, ১৮৯৫) এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরের অতিশয় স্নেহভাজন ছিলেন। সুতরাং তাঁর মতামত তথ্যসঙ্গত বলে গৃহীত হতে পারে। তাঁর মতে—

"তাঁহার (বিদ্যাসাগর) আচার-আচরণ হইতে যতদুর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোন-এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সুক্ষ্মতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার নিত্য-জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।" ('বিদ্যাসাগর', পৃঃ ৫২০)

অর্থাৎ চণ্ডীচরণের মতে, বিদ্যাসাগর ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বোধ হয় সম্প্রদায়চিহ্নহীন মধ্যপথ ধরেছিলেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুর আচার-বিচারের প্রতি তাঁর যেমন খুব একটা আস্থা ছিল না, তেমনি অন্যদিকে 'রিফর্মড হিন্দু' অথবা প্রগতিশীল ব্রাহ্মমতের প্রতিও তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না।[৬]

স্বল্পকথায় বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দুধর্মের লোকাচারের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না, এমন কি স্মার্ত আচারের প্রতি প্রত্যক্ষতঃ প্রতিকূলতা না করলেও এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর পুরো বিশ্বাস ছিল না। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় কৃত্যের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। একবার তিনি কৌতুকের বশে ভাটপাড়া-নিবাসী তাঁর কায়স্থ-বন্ধু অমৃতলাল মিত্রের অন্নের থালা থেকে কাড়াকাড়ি করে মাছের মুড়ো খেয়েছিলেন; এজন্য ভট্টপল্লীর

৬. চণ্ডীচরণের মতে প্রথমদিকে বিদ্যাসাগর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, "কিন্তু নানা প্রকার মতভেদ-নিবন্ধন যখন অপ্রিয় সংঘটন হইতে লাগিল, তখন আর সেই সকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতবিভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইলাম" (বিদ্যাসাগরের উক্তি)।—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৫২০

ভট্টাচার্যগণ তাঁর উপর বিরূপ হয়েছিলেন বলে শোনা যায়।[৭] এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও স্মৃতিসংহিতার আলোচনার মধ্যে ডুবে থাকলেও দৈনন্দিন আচার-বিচারে ঠিক স্মার্ত পণ্ডিত বা শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন না। ধর্মকর্ম সংস্কার প্রভৃতিকে তিনি মানব-কল্যাণের বাতায়ন থেকে দর্শন করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাই বলে তিনি ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্যগণের মতো হিন্দুধর্ম ও আচারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ান নি। ব্রাহ্মণ সন্তানের যে সমস্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান মানা কর্তব্য, তিনি মনে মনে তার পোষকতা করুন আর নাই করুন, বাইরের দিকে তার অন্যথাচরণ করেন নি জনন-মরণাদি স্মার্ত ক্রিয়াকর্মেরও তিনি যথাবিধি অনুষ্ঠান করতেন; আজীবন উপবীতধারী ব্রাহ্মণই ছিলেন। চিঠিপত্রাদির শিরোদেশে শ্রীহরির নাম স্মরণ করতেন, জনক-জননীর দেহান্ত হলে বিদ্যাসাগর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তানের মতোই ঔর্ধ্বদৈহিক অনুষ্ঠান ও কৃচ্ছ্র-শৌচকর্মাদি নির্বাহ করেছিলেন। সুতরাং তিনি যে তৎকালীন ধর্মসংস্কারকদের মতো হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তা মনে হয় না। অভ্যাস ও সংস্কারের বশে তিনি বাহ্যতঃ হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান মানতেন, কিন্তু লোকাচার-দেশাচারের সঙ্গে মানবধর্ম ও হৃদয়ধর্মের বিরোধ বাধলে মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে লোকাচারকে নস্যাৎ করতে পারতেন।

তাঁর জীবনীকার ও অনুরাগী-অন্তরঙ্গেরা তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এমন দু-একটি মন্তব্য করেছেন যে, বাহ্যতঃ তাঁকে পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী বলতে দ্বিধা হয়। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁকে নাস্তিক বলা না গেলেও সংশয়বাদী বললে সত্যের অপলাপ হবে না। এ

---

৭. দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১৯

বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ কোন মতামত প্রকাশ করে যান নি। তাঁর আত্মচরিত অসম্পূর্ণ রচনা। এটি সম্পূর্ণ হলে তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হতে পারত। শোনা যায়, দুই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, ধর্ম, পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গূঢ় অভিমত তিনি প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেই সময়ে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে কিছু আলাপ ও মতবিনিময় হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মযোগী ও করুণাময় বিদ্যাসাগরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। উভয়ের সাক্ষাৎকার ও আলাপের কিছু নমুনা 'শ্রীম' "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" (৩য়) লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে নানা তত্ত্বকথার আলোচনা করে সর্বশেষে একটি গূঢ় প্রশ্ন করলেন ঃ

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) —"আচ্ছা তোমার কি ভাব ? বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "আচ্ছা সেকথা আপনাকে একলা একদিন বলব।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য়, পৃঃ ১২, ১৩৭৪ সালের সং)

এই উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, সকলের সম্মুখে বিদ্যাসাগর নিজের মনোগত গূঢ় কথা খুলে বলতে চান নি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নটি অতি সহজ, সরল। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যাখ্যা করছিলেন ঃ

"তুমি যেসব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।" (ঐ, পৃঃ ১৫)

তারপর তিনি বিদ্যাসাগরকে উপদেশ দিলেন ঃ

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। আরো এগিয়ে যাও।" (ঐ, পৃঃ ১৫)

একথা বলার তাৎপর্য, নিষ্কাম কর্মযোগী বিদ্যাসাগর যেন উপায়কে লক্ষ্য ভেবে থেমে না যান। নিষ্কাম কর্ম হল উপায়, ঈশ্বরলাভই জীবের লক্ষ্য। আধারকে আধেয় ভাবলে সত্যদৃষ্টি স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য বিদ্যাসাগরকে বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য চিন্তিত করে তুলেছিল। বোধ হয় তিনি নিজের মানসসাগরতলে ক্ষণিকের জন্য ডুব দিয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাই সকলের সামনে নিজের চিত্তপট মেলে ধরতে চান নি।

আর একবার নিজের গভীর প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন এইভাবেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একদা কাশীধামে উপস্থিত হলে কোন-এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এসে বলেন, "ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।" তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, "আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই, তবে এই কথা বলি, গঙ্গাজলে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম।"[৮] এখানে লক্ষণীয় যে, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর জোর দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ যে যেভাবে খুসি আচার-আচরণ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতীকতা বা ঈশ্বর-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় নয় তাঁর উক্ত উপদেশের এই হল তাৎপর্য। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর-সংক্রান্ত তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা ও নিজস্ব বিশ্বাস প্রকাশে তিনি বিরত হয়েছেন। বিশুদ্ধভাবে নাস্তিক্যবাদী হলে বা ঈশ্বরচেতনায় তাঁর পুরোপুরি অনীহা থাকলে নিজস্ব ধারণা ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হবার পাত্র তিনি ছিলেন না। বস্তুতঃ ঈশ্বরচেতনা ও পারমার্থিকতা সম্বন্ধে তাঁর লেখনী-নিঃসৃত কোন ব্যক্তিগত অভিমত পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে মাঝে

৮. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৬

মাঝে যে সমস্ত আলোচনা করতেন এবং এখানে-সেখানে সে-সম্পর্কে যা বলতেন, তা থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

তাঁর 'বোধোদয়' সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রচার করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিতের পরিশিষ্টে উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক তা স্বীকারও করেছেন। 'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে নানা পার্থিব জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও ঈশ্বর-সংক্রান্ত' কোন কথাই নেই। থাকবার কথাও নয়; এখন যিনি পদার্থবিজ্ঞানে বা অন্য কোন বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ লেখেন, তাতে কি তিনি পরম কারুণিক শ্রীভগবানের জয়ধ্বনি করেন ? কিন্তু 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরের উল্লেখ নেই দেখে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রশ্ন তুললেন, "মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন ?"[৯] তার উত্তরে বিদ্যা-সাগর বললেন, "যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।"[১০]

পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরবিষয়ক ক্ষুদ্র নিবন্ধ যোগ করে দেন।[১১] হয়তো তিনি বিজয়কৃষ্ণের কথায় মনে করেছিলেন,

৯. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৫২১

১০. ঐ, পৃঃ ৫২১

১১. বিদ্যাসাগর উক্ত অনুচ্ছেদে "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" এই মন্তব্য যোগ করেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর সম্পাদকের মতে, ১৮৪১ সালের এক বক্তৃতায় মহর্ষি ঈশ্বর বিষয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর 'বোধোদয়ে' সেটি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর 'বোধোদয়'-এর নানা সংস্করণে ঠিক এই ধরণের মন্তব্য নেই। মনে হয়, গ্রন্থ সম্পাদনা কালে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র কিছু কিছু পাঠ সংস্কার

ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত যাই হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তক যথাসম্ভব নিঃস্পৃহভাবে রচনা করা উচিত। সাধারণ বালক-বালিকারা যেমন পদার্থজগৎ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করবে, তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধেও তারা কিছু কিছু জানবে, পাঠ্য পুস্তকের সেই রকম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই ভেবেই বোধ হয় তিনি বিজয়কৃষ্ণের মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোন অনমনীয় প্রতিকূল ধারণা থাকলে তিনি বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন না। কারণ যুক্তিবিরোধী বা তাঁর অভিমতের বিরুদ্ধে কোন কথা তিনি কিছুতেই মানতে পারতেন না, অন্তরঙ্গ জনের জন্যও না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু এককথায় এর মীমাংসা করা দুরূহ। নির্মম দেশাচারের তিনি ঘোর শত্রু ছিলেন। মানুষের দুঃখ দূরীকরণের জন্য তিনি অযৌক্তিক শাস্ত্রবচনকে তুচ্ছ করতে পারতেন, সেরকম দৃঢ় মনোবলের তিনি ছিলেন অমিত অধিকারী। মানবপ্রেম তাঁকে চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি উদাসান করে তুললে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকবে না। নিজের উইলে বিদ্যাসাগর নানা হিতকর কর্মে অর্থ বরাদ্দ করে গেছেন বটে, কিন্তু দেবসেবা, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্মে এক কপর্দকও ব্যয়ের নির্দেশ দেন নি।[১২] পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী হলে এবং এতৎ-সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ পথের অনুবর্তন করলে, এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত বা নির্দেশ দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি ভক্ত ও অনুচরদের সঙ্গে এ বিষয়ে যা দু'চার কথা আলোচনা করতেন এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে :

করে থাকবেন। অবশ্য ঐটি ছাড়াও 'বোধোদয়' ও 'আখ্যান মঞ্জরী'-র (৪র্থ) একাধিক স্থলে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। সুতরাং নাস্তিকের মতো ঈশ্বরের নাম শুনলেই তিনি 'উদ্যত মুষল' হতেন না, এ একপ্রকার সুনিশ্চিত।

১২. চণ্ডীচরণের ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৫-৪৩৭

"এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব ? একতো নিজে কতশত অন্যায় কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ দেখাতে গিয়া, তাহাকে বিপাকে চালাইয়া কি শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব ? নিজের জন্য যাই হোক পরের জন্য বেত খেতে পারবো না বাপু। এ কার্য আমাকে দিয়ে হবে না। নিজে যেমন বুঝি, সেই পথে চলতে চেষ্টা করি, পীড়া-পীড়ি দেখিলে বলিব এর বেশী বুঝিতে পারি নাই।"[১৩]

এই মন্তব্য থেকে বিদ্যাসাগরের পারমার্থিক তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ আস্থা নেই। ঈশ্বর-অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক সাম্প্রদায়িক রীতিনীতিতে তাঁর বিশ্বাস নেই। এ বিষয়ে গুরু সেজে ধর্মপ্রচারের বা অপর কাউকে উপদেশ দানের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এদিক থেকে মনে হচ্ছে, কীভাবে ঈশ্বর লাভ করা যায়, অথবা আদৌ লাভ করা যায় কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনদিনই সংশয়াতীত হতে পারেন নি। তিনি যে ধর্ম-সংক্রান্ত প্রচারকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তিপথে গিয়ে ধর্ম প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করলে বিদ্যাসাগর পরিহাস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি নাকি কী একটা হয়েছ ?"[১৪] কিন্তু এ-সব উক্তি থেকে তাঁকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্বকথা এমনভাবে সংগুপ্ত যে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। অতএব অপরকে উপদেশ দেওয়াও অযৌক্তিক। তিনি যুক্তির আনুগত্যকে সার বলে মেনেছিলেন, তদতিরিক্ত পারমার্থিক চিন্তায় তাঁর আসক্তি ছিল না।

১৩. চণ্ডীচরণ, ঐ, পৃঃ ৫২৩
১৪. ঐ, পৃঃ ৫২০-৫২১

বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম প্রচারণাকে তিনি পরিহাস করেছিলেন। তার কারণ, তাঁর মতে ঈশ্বরসাধনা একান্তভাবে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার বস্তু—প্রচার বা বিতর্কের বিষয় নয়। হিন্দুদর্শনের তাত্ত্বিক দিকটি তাঁর নখদর্পণে ছিল, কিন্তু তাঁর সাধনার দিক তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি। অর্থাৎ ধর্ম ও দর্শনে তিনি নিঃস্পৃহ, বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন তাত্ত্বিক মাত্র ছিলেন, উক্ত বিষয়কে বুদ্ধির খোলামাঠ থেকে তুলে নিয়ে রহস্যানুগ সাধ্যসাধনার সুড়ঙ্গপথে প্রেরণে বিশেষ উৎসাহী হন নি। এ বিষয়ে একবার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ("শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"-এর সঙ্কলক 'শ্রীম') তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার হিন্দুদর্শন কেমন লাগে ?" উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, "আমার ত বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে বুঝাতে পারে নাই।"[১৫] পরে মহেন্দ্রনাথ তাঁকে ঈশ্বর বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, "তাঁকে ত জানবার জো নেই। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, যাতে জগতের মঙ্গল হয়।" এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর খুব গভীর চিন্তার কথা স্বল্পাক্ষরে বলেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর বাক্‌পথাতীত, বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং দর্শন গ্রন্থে ও তত্ত্বালোচনায় তাঁকে কীভাবে ব্যাখা করা যাবে ? তিনি যদি বাক্য-মনের অগোচর হন, তা হলে জীবের করণীয় কি ? তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলবেন, জীবকেই ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করতে হবে, জীবহিতব্রতই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাই বিদ্যাসাগর নরসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য নরের মধ্য দিয়ে নরোত্তমে যাওয়া যায় কিনা, অথবা তার প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে তিনি অতিশয় মিতবাক্।

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, তিনি হিন্দুদর্শনের সীমা সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন

১৫. শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয়

ছিলেন।[১৬] দর্শন মূলতঃ বুদ্ধি-আশ্রয়ী। সুতরাং ঈশ্বরানুভূতি বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে বিষয়ে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ও তত্ত্বদর্শন কতটুকু সাহায্য করতে পারে? এই বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলতেও কুণ্ঠিত হন নি[১৭]।

একবার পুরীর সমুদ্রে স্টিমার ডুবির ফলে প্রায় সাত-আটশ' নরনারী বাল-বৃদ্ধ মারা যায়। এ সংবাদে মুহ্যমান হয়ে তিনি সক্ষোভে মন্তব্য করেছিলেন: "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে, নানাদেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্রে ডুবাইলেন! আমি যাহা পারি না,

---

১৬. ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক মোয়াট সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠান, তাতে স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছিলেন, "True it is that the most parts of the Hindu system in philosophy do not tally with the advanced idea of modern times." তাঁর মতে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী শিখলে হিন্দুদর্শনের ভুলত্রুটিগুলি লক্ষ্য করতে পারবে, "Young men, thus educated, will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy." পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদর্শন যে আধুনিক ভাবধারার ততটা উপযোগী নয় এবং এতে অনেক ভুলত্রুটি আছে, এ বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হন নি।

১৭ ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ব্যালান্টাইনের সংস্কৃত কলেজের পাঠসংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লেখেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণে তিনি সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন পড়াচ্ছেন বটে, কিন্তু এই দুই দর্শন-প্রস্থান সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন আস্থা নেই:
"For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false system of philosophy is no more a matter of dispute."

তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০-৮০০ লোককে একত্রে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দেন। তুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।"[১৮] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর হৃদয় মানবপ্রেমে এতই পূর্ণ ছিল যে, করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে ঐ জাতীয় নির্মম ঘটনার কার্য-কারণত্ব খুঁজে পেতেন না। প্রত্যক্ষ জীবনবাদী বিদ্যাসাগরের পক্ষে এরকম অভিমত প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। তবে মাঝে মাঝে ঈশ্বর-বিষয়ে নানা প্রসঙ্গে তাঁর মনে সংশয় জাগলেও[১৯] জনক-জননীকে তিনি দেবতা বলে গ্রহণ করেছিলেন, অন্ততঃ কাশীধামে পাণ্ডা-পুরোহিতের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার সময়ে সেই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন।[২০] তাঁর অভিমত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সাধারণের নিকট প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন না, অর্থাৎ তাঁর ধারণা আর সাধারণের প্রচলিত ধারণা সম্ভবতঃ এক ছিল না বলেই তিনি নিজস্ব মতামত সম্বন্ধে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন। তবে কি তিনি পারমার্থিকতা সম্পর্কে সংশয়বাদী ছিলেন? এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর

১৮. চণ্ডীচরণের ঐ, পৃঃ ৫২২

১৯. এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য স্মরণীয়: "স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না, কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়-বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন।" —'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', পৃঃ ১৮-১৯

২০. একবার বিদ্যাসাগর কাশীধামে গিয়ে মন্দিরের পুরোহিত-পাণ্ডাদের মুক্ত-কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।" ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মানেন?" তাঁর উত্তরে তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট জনক-জননীকে দেখিয়ে বলেন, "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।" —বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৪৮৬

পাওয়া কঠিন। ধর্মসাধনাকে তিনি নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রবণতার ব্যাপার বলে দেখেছিলেন, এবং চিত্ত-প্রণালীর বাইরে পারমার্থিকতার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, এ-বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। গঙ্গাস্নান, শিবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কেউ যদি মনে করেন, এই-ই তাঁর ধর্মসাধনা, তা হলে তাতেও বিদ্যাসাগরের আপত্তি নেই। ধর্মের 'সাধারণীকরণ' নয়, 'বিশেষী-করণে' তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর পরলোক ও জন্মান্তর ব্যাপারেও সন্দিহান ছিলেন। ঈশ্বরতত্ত্বের সম্পর্কে তাঁর মনে মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দিত, তিনি পর-লোকতত্ত্বে যে ঘোর সংশয়ী হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? একবার রাধাপ্রসাদ রায়ের (রমাপ্রসাদের পুত্র) দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর কিছু পরিহাসমিশ্রিত আলোচনা হয়েছিল। ললিত-মোহন পরলোকতত্ত্বে বিশেষ আসক্ত ছিলেন, তাই নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে কৌতুক পরিহাস করতেন। ললিতমোহন যোগমার্গেও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। একদা বিদ্যাসাগর ললিতমোহনকে স-পরিহাসে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁরে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?" ললিত-মোহন বললেন, "আছে বৈকি, আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত' থাকিবে কার?"[২১] এই আলাপ থেকে মনে হচ্ছে, লোকান্তর সম্পর্কে তিনি কখনও গভীরভাবে চিন্তাই করেন নি, উক্ত ব্যাপার তাঁর কাছে হাসির ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। বাস্তব জীবনের দুঃখবেদনা নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, পরলোকের আশ্বাস তাঁর কাছে কোনও সান্ত্বনার বাণী বহন করে আনে নি।

বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁকে পরবর্তী-কালে অনেক মানসিক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল? এমন কি, এই ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

২১. পুরাতন প্রসঙ্গ (বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত, কৃষ্ণকমলের উক্তি), বিদ্যা-ভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১৩১

ফলে শেষজীবনে মানসিক আঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দেহে-মনে ক্লান্ত হয়ে তিনি মাঝে মাঝে কার্মাটারে গিয়ে সরলপ্রাণ সাঁওতালদের সাহচর্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করতেন। কারণ শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী শহুরে বাঙালীর অকৃতজ্ঞতা এবং নিকট-আত্মীয়ের নষ্টামির ফলে তিনি অতিশয় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এমন কি, এক-সময়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনেও প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং সেকথা পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ ও সহধর্মিণীকে জানিয়ে পত্রযোগে লিখেছিলেন, "নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। এ-জন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত-ভাবে অতিবাহিত করিব।" (পিতার নিকট লিখিত পত্র)[২২] এখানে লক্ষণীয়—মানসিক বিপর্যয়ের সময়েও ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নি। এই রকম মনের অবস্থায় অনেকে শাস্ত্রের 'যথা নিযুক্তোঽস্মি' বাণী অথবা রবীন্দ্রনাথের "সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়"—উক্তি অবলম্বনে জীবন-রণাঙ্গনে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাধারণ ধাতুপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন না; তাই সে সান্ত্বনাও তাঁর ছিল না। তাঁর এই সময়ের চিঠিপত্রাদি থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর দেহ ও মন ভেঙে পড়েছিল; পুত্র ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর মনঃকষ্টকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। কিন্তু পত্রাদির কোথাও তিনি ঈশ্বর-করুণার উল্লেখ করে মানসিক প্রদাহ নিবৃত্ত করতে চান নি।

সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এইরূপ মানসিক যন্ত্রণার

২২. চণ্ডীচরণের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪১৪

সময়ে তিনি অখিলউদ্দীন নামে এক অন্ধ বাউলের দেহতত্ত্ববিষয়ক গান শুনতে ভালোবাসতেন। এখানে তার দু'একটি উল্লেখ করি :

১. "কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্ণয় করবে রে কে,
তুমি কোন্‌খানে খাও কোথায় থাকো রে মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছ।

২. তুমি আপ্‌নি নৌকা, আপ্‌নি নদী, আপ্‌নি দাঁড়ি,
আপ্‌নি মাঝি,
আপ্‌নি হও যে করণধারজী, আপ্‌নি হও যে নায়ের কাছি,
আপ্‌নি হও রে হাইল-বৈঠা।

৩. তুমি আপ্‌নি মাতা, আপ্‌নি পিতা,
আপ্‌নার নামটি রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাইচাঁদ বাউলে বলে, সে নাম ভুলবো না রে
প্রাণ গেলে।

৪. তুমি আপ্‌নি অসার, আপ্‌নি হও সার,
আপ্‌নি হও সে নদীর দু'ধার, আপ্‌নি নদীর কিনার,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলবো
নারে প্রাণ গেলে।

৫. আপ্‌নি তরো, আপ্‌নি সারা, আপ্‌নি জরা, আপ্‌নি মরা
আপ্‌নি হও সে নদীর পাড়া, আবার আপ্‌নি হও সে
শ্মশানকর্তা গো,
আপ্‌নি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন, তোর
কোথায় গো সাকম,
আমি ভেবে চিন্তে হলেন ক্ষীণ।"২৩

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর সত্যই কি পারের কাণ্ডারী নিরঞ্জনের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন ? গোঁসাইচাঁদ বাউলের মতো তিনিও কি আকুল আর্তনাদে জীবনের সায়াহ্ন-আকাশতলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিম !" রামেন্দ্রসুন্দরের কথা

২৩ চণ্ডীচরণের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫২৪

উল্লেখ করে বলতে পারি, এ-বিষয়ে চূড়ান্ত "মামাংসা হইল না" ('জিজ্ঞাসা')। বিদ্যাসাগরের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে তাঁর চিত্তধাতুর গূঢ় রহস্য সন্ধান করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে, তাঁর হৃদয় মানবপ্রেমে কানায় কানায় ভরে উঠলে তিনি জীবের দুঃখ দেখে ভাবাবেগের বশে পরম কারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে ক্ষণিকের জন্য সন্দিহান হয়ে পড়তেন, হৃদয়ই তখন তাঁর সমস্ত চিত্ত-প্রবৃত্তি ও কর্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করত। কিন্তু পরে ভাবাবেগ প্রশমিত হলে তিনি শান্তচিত্তে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করতেন। কিন্তু অগুয়েস্ত্ কোঁতের মতো তিনি নিছক তত্ত্ববাদী ছিলেন না, রামমোহনের মতো তাঁকে বলা চলবে না—"His cardinal principle was that service of man is the service of God."[২৪] মানব-সেবাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, কিন্তু তাকেই সোপান করে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে পৌঁছাবার সূক্ষ্মতম পন্থা আবিষ্কারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহনকে 'Theophilanthropist' বলেছিলেন।[২৫] কিন্তু বিদ্যাসাগরের Philanthropy-তে কোন theos-এর সম্পর্ক ছিল না। মানুষের দুঃখ দূর করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তদতিরিক্ত কোন পুণ্যফল তিনি কামনা করতেন না। মানব-প্রেমই ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বর্তিত হয়, এ-কথা ভক্তিশাস্ত্র বলে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী বা কৌতূহলী ছিলেন না। তাঁর মতাদর্শ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "বিদ্যাসাগর সেই শাক্যমুনি-প্রদর্শিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্ম মার্গের পথিক ছিলেন।...তিনি যে মার্গে চলিতেন, তাহা আর্যশাস্ত্রসম্মত, মানবশাস্ত্রসম্মত সনাতন ধর্মমার্গ।" ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর') বিদ্যাসাগরের পন্থা বিশেষ কোন শাস্ত্রসম্মত অথবা বৈরাগ্য ধর্মাবলম্বী কিনা তাতে বিশেষ

২৭. Sibnath Sastri—History of Brahmo Samaj, Vol. I. P. 79

২৫, Calcutta Review, 1845

সন্দেহ আছে। মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম, মানববেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতি এবং মানবদুঃখ দূর করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী করে নি, বরং তাঁর মানসশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি নাস্তিক ছিলেন কিনা তার যথার্থ উত্তর দেওয়া দুরূহ। কিন্তু তাঁকে নিশ্চয় বলা চলবে, "হে নাস্তিক, আস্তিকের গুরু।" মানুষই তাঁর ধর্ম, মানুষই তাঁর সাধনা, মানুষ তাঁর আধার এবং আধেয়। প্রাশ্চাত্ত্য positivist দার্শনিকের মতো মানবতত্ত্বের নির্যাস নয়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ কবোষ্ণ স্পর্শই তাঁর কাম্য ছিল। নরের মধ্যে নরোত্তম ও নারায়ণকে তিনি দর্শন করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু নরদেহই তাঁর কাছে দেবমন্দির; নরদুঃখ লাঘবের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ তাঁর যজ্ঞহবিঃ। বিদ্যাসাগর পরম আস্তিক্যবাদী, কারণ তিনি মানববাদী। মানুষের চেয়ে অধিকতর অস্তিত্ববান্ আর কে ?

বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরাণ ঐতিহ্যের একটি বিশেষ প্রকরণ তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের পর ভারতচেতনা পুরাণ-বাহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধ উপপ্লবের পর ভারতের পূর্বতন শীল-সাধনা বহুলাংশে ভেঙে পড়লে খ্রীস্টীয় শতকের গোড়ার দিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ-সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ জনসমাজে ধর্মকর্ম, ইতিবৃত্ত, আচার-আচরণকে পুনরায় নৈষ্ঠিক অনুশীলনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং সমাজে সদাচার ও ত্রিদেবতাশ্রয়ী পৌরাণিক অনুভাবনাকে নানাভাবে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কালধর্মে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, হব্যকব্য, যাগযজ্ঞাদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ল--বৌদ্ধধর্মের nihilism ধরনের সর্ববৈনাশিক শূন্যতা, তত্ত্বের দিক থেকে যাই হোক, সমাজবন্ধনের দিক থেকে মারাত্মক। বৌদ্ধধর্ম ভাঙল অনেক কিছু। 'ত্রিশরণ'-এর ত্রিশূলের খোঁচায় বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু নেতিবাদী শূন্যতা মানুষের মনে স্থায়ী সান্ত্বনা এবং স্নিগ্ধ প্রশান্তি দিতে পারল না। সঙ্ঘারাম গৃহজীবনের সুখশান্তি কেড়ে নিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যপন্থী শাস্ত্রযাজী সম্প্রদায় যে কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করেন নি, তার সাক্ষী হচ্ছে পুরাণ ও উপপুরাণ নামে ছত্রিশখানি গ্রন্থের প্রচার। এই পুরাণ-সাহিত্য বেদব্যাসের রচনা বলে চললেও এগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু জনের চেষ্টায় রচিত হয়েছে। অনেকের হস্তক্ষেপের ফলে পুরাণগুলির

পৌর্বাপর্য, গঠন ও রচনার মধ্যে অনেক স্থলে শিথিলতা প্রবেশ করেছে। কতকগুলি তো অর্বাচীন কালের রচনা। তাই কেউ কেউ (উইলসন) পৌরাণিক সাহিত্যকে হাজারখানেক বছরের রচনা বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু একথা ঠিক নয়। স্বয়ং ভিন্‌তারনিৎজ স্বীকার করেছেন যে, পুরাণের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন।[১] অথর্ববেদে চতুর্বেদের সঙ্গে পুরাণেরও উল্লেখ আছে। সূত্র-সাহিত্যেই বোধ হয় পুরাণের যথার্থ গড়নটি ধরা পড়েছে। 'গৌতমধর্মসূত্র' এবং 'আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে' পুরাণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই ধর্মশাস্ত্রগুলি অতি প্রাচীন, খ্রীস্টের জন্মের চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্বের রচনা। সুতরাং অনুমান, পুরাণের পূর্বরূপ খ্রীস্টের জন্মের পরে নয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই ভারতের ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের মহাকাব্যে, বিশেষতঃ মহাভারতের গড়নটিতে পৌরাণিক ছাঁদ লক্ষ্য করা যাবে।

ভারতীয় আর্যসমাজে খ্রীস্টের জন্মের পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্ব থেকে পুরাণের ধারা বহমান থাকলেও, আমরা যে-আকারে পুরাণগুলিকে পাচ্ছি তা খুব সম্ভব ১ম খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী রচনা নয়। উইলসন পুরাণকে অর্বাচীন বললেও ভ্যান্‌স্‌ কেনেডি উইলসনের এই অভিমত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পুরাণগুলি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক। একাদশ শতকের তৃতীয় দশকে আরবদেশীয় পর্যটক অলবেরুনী আঠারটি পুরাণের তালিকা দিয়েছেন এবং তিনি নিজে আদিত্য, বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণুপুরাণ পড়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং উইলসনের পুরাণের কাল-সম্পর্কিত অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। সে যাই হোক, পঞ্চ-লক্ষণ-সমন্বিত (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত) পুরাণ গ্রন্থ আদৌ অর্বাচীন নয় তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য পুরাণে কবিত্ব ও রূপকের ভাষায় এমন সমস্ত বর্ণনা আছে, এমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে যার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া

১. M. Winternitz—*A History of Indian Literature*, Vol. I, Part II, 1963 (C. U.) Pp. 455-56

কঠিন। এতে যেসব দেবদেবীর বর্ণনা; মুনি ও রাজবংশের তালিকা এবং আরও সম্ভব-অসম্ভব বর্ণনার বাহুল্য আছে তার কিছু কিছু অংশ বালসুলভ মনে হতে পারে।[২] কিন্তু এর বাহ্য বিস্তার ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছেড়ে দিলে এর মধ্যে একযুগের সমাজজীবন ও ব্যক্তিমানসের চমৎকার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা স্বীকার করতে হবে। পুরাণ ইতিহাস না হলেও, ঐতিহাসিক উপাদানের খনি।[৩] খ্রীস্টীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে এতাবৎকাল পর্যন্ত পৌরাণিক ভাবধারা ও আদর্শ সমগ্র ভারত-মানসকে ধারণ করে রেখেছে। আধুনিক যুগের ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য-সমাজ প্রাক্-পৌরাণিক শ্রৌতযুগে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সেকাল এবং একালের হিন্দুভারত কতটুকুই বা বৈদিক আচার পালন করে আসছে? উপনিষদ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন তো করাঙ্গুলি-গণনীয় মুমুক্ষু মানবের আধ্যাত্মিক পলান্ন। বস্তুতঃ প্রায় দু'হাজার বছর ধরে যাকে বলা হয়েছে আর্যধর্ম, পরে হিন্দুধর্ম, একালে বলা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, — যে-ধরনের প্রেরণা ও নির্দেশ ভারতীয় হিন্দুসমাজকে চালনা করেছে, তার প্রায়

২. পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যাই বলুন, একালের অনেক কৃতবিদ্য আধুনিক ভারতীয় পুরাণের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। এই সম্পর্কে ভিনতারনিৎজ মণিলাল দ্বিবেদী নামে এক শিক্ষিত ভারতীয়ের উল্লেখ করেছেন, যিনি ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে স্টকহলমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টালিস্ট্ কংগ্রেসে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ভিন্‌তারনিৎজের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "As a man of Western education he spoke of anthropology and geology, of Darwin and Haeckel, Spencer and Quatrefages, but only in order to prove that the view of life of the Puranas and their teachings upon the Creation are scientific truths, and he finds in them altogether only the highest truth and deepest wisdom—if only understands it all correctly, i. e, symbolically."

—Winternitz-Ibid p. 464

সবটাই পুরাণাশ্রিত। বিষ্ণু ও শিবকে কেন্দ্র করে যে ধর্মমহামণ্ডল গড়ে উঠেছে, মুনি-ঋষি-দেবতারা যে পরিমণ্ডলের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ, কল্পনাশ্রয়ী ইতিহাসে ও ভূগোলে যে সমস্ত যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্বাদির বিচিত্র শোভাযাত্রা খ্রীস্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে একাল পর্যন্ত প্রসৃত— তার মূলটা পৌরাণিক।

২

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত সাহিত্যের সন্ধান পেলেন, তখন থেকে পুরাণের প্রতি তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বোধ হয় উইলসন-ই সর্বপ্রথম তাঁর *Essays on Sanskrit Literature* (1832)-এ এবং তাঁর অনূদিত বিষ্ণুপুরাণে পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভ্যান্স্ কেনেডি তারও এক বছর আগে *Researches into the Nature and Affinity of Ancient Hindu Mythology*-তে পুরাণের প্রাচীনতা স্বীকার করেন। ইউজেন বর্ণুফ, জুলিয়াস এগেলিং, মনিয়র উইলিয়ম্স্, উইনডিশ, লুডার্স, পার্জিটার, ফার্কুহার- এঁরা নানাভাবে পুরাণের প্রামাণিকতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই বিশাল সাহিত্যের অনেক বিচিত্র দিক উদ্ঘাটিত করেন। এঁদের কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক আচারানুষ্ঠান ও ভাবধারা ইদানীং ভাবতে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও পুরাণকেন্দ্রিক ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ এখনও অনেকটা বজায় আছে। সুতরাং হাজার দুই বছরের ভারতীয় মানসের মূল রহস্য বুঝতে গেলে পুরাণসাহিত্য বিশ্লেষণ করতে হবে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। প্রায় দেড়শ বছর ধরে তাঁরা নানাভাবে সে কাজ করে চলেছেন।

বাংলাদেশে একালে পুরাণের প্রভাব সম্বন্ধে দু'-এক কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বৈষ্ণব

পুরাণের ঘোর বিরুদ্ধতা করে দোম্ আন্তোনিও দো রোজারিও নামে এক ধর্মান্তরিত বাঙালী ক্যাথলিক খ্রীস্টান 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে' অতি তীব্র ভাষায় বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় আচার-আচরণকে নিন্দা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট মিশনারীরা উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছিলেন, অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হল খ্রীস্টানধর্ম প্রচার। পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্মকে হাস্যাস্পদ প্রমাণ করে তৎস্থলে 'মথিলিখিত সুসমাচার' প্রচারের দিকেই তাঁরা নিবদ্ধ-দৃষ্টি দিলেন। তাঁরা কুক্রিয়াসক্ত ও পুতুল-পূজক কৃষ্ণকায় হীদেনদের যীশুখ্রীস্টের করুণার ধর্ম অর্থাৎ 'Religion of Mercy'-র ছায়াতলে আনতে চেয়েছিলেন। এ কার্যে কিছুটা অগ্রসর হয়ে তাঁরা দেখলেন, সমগ্র হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত পুরাণের অপ্রতিহত প্রভাব। তখন তাঁরা পুরাণকাহিনী ও *motif*-এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা, অযৌক্তিকতা ও দুর্নীতি আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য হেলেনীয়, হিব্রু ও খ্রীস্টানী শাস্ত্রসংহিতা ও পুরাণে যে অনুরূপ ব্যাপার প্রচুর আছে[৩] এবং পৌরাণিক যুগের সাহিত্য ঐ

৩, রামমোহন, বাইবেলের মধ্যে যে একই রকম পৌরাণিক জ্ঞানবিশ্বাস আছে, সে বিষয়ে মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন ; "অতএব মিসনারি মহাশয়দিগের বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্যরূপবিশিষ্ট যিশুখ্রীষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিশুখৃষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কিনা······তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কিনা ও তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কিনা এবং কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিত কিনা আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখৃষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কিনা যদি সকল তাঁহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের নামরূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকারবিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না যেহেতু এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়।"—ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২

রকমই হয়ে থাকে, একথা তাঁরা মানতে চান নি—ধর্মপ্রচারের ইচ্ছাই তার প্রধান কারণ।

রামমোহনের সঙ্গে মিশনারী সম্প্রদায়ের যে প্রথম বিরোধ বাধে তারও মূল কারণ—এই পৌরাণিক সংস্কারের মূল্যাবধারণ সম্পর্কে মতভেদ। মিশনারীরা হিন্দুর পুরাণ-তন্ত্রাদির নিন্দা করলে রামমোহন 'ব্রাহ্মণসেবধি'-তে বলেন যে, মিশনারীরা হিন্দুর পুরাণগ্রন্থকে যে জন্য নিন্দা করছেন, ঠিক অনুরূপ ব্যাপার খ্রীস্টানী সাহিত্যেও আছে। তবে ভারতীয় পুরাণ সাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট। সংস্কৃত পুরাণ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের ঈশ্বরোপাসনার প্রাথমিক সোপান। উচ্চস্তরে উঠলে পুরাণের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাঁর মতে উপনিষদ ও বেদান্তই হিন্দুধর্ম ও সাধনার সারভাগ—মিশনারীরা যার বিশেষ সংবাদ রাখতেন না। রামমোহন এইজন্য 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'তে তাঁদের আক্রমণের প্রতিবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদী রামমোহন পুরাণের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখান নি। অবশ্য এখানে বলে রাখি, বেদান্তের জীব-ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদ তত্ত্বতঃ একবস্তু নয়। সে সময়ে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রভৃতি পণ্ডিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তিরা সমাজ সংরক্ষণের জন্য পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অপরদিকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-দল, খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তানগণ এবং রামমোহনপন্থী একেশ্বর-বাদীরা—একে অপরের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য অবলম্বন করলেও, একবিষয়ে সকলেরই মতৈক্য ছিল। তা হল পুরাণাদির প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃত পুরাণ অনূদিত হয়ে বাঙালীসমাজে প্রচারলাভ করেছিল। বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিষ্ণু-কৃষ্ণবিষয়ক পুরাণের মুদ্রণ ও প্রচার ধর্মীয় কৃত্যের অন্যতম অঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও একাধিক বৈষ্ণব পুরাণ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু উগ্র কালাপাহাড়ী ভাব, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মমত প্রভৃতি সিঁড়িগুলি একে একে পার হয়ে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তিকায় স্বীকার করেন, "নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল।" 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তিকায় তিনি যে 'হিন্দু মহাসমিতি' গঠনের কথা বলেছিলেন তাতে পৌরাণিক দেবদেবীরা উপেক্ষিত হন নি। তাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমিতির কার্য আরম্ভের পূর্বে "কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দেবপূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে।" তাঁর মতে ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম দু'দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথম—এই বিশেষ দেবোপাসনা ও কৃত্য অবলম্বন করে উপনিষদ-বেদান্তাদি-নির্দিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্বে পৌঁছান সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয়—সমগ্র ভারতবর্ষকে সংস্কৃতির দিক থেকে একতাবদ্ধ করতে হলে সর্বদেশে সর্বাধিক প্রচলিত যে মত, অর্থাৎ পৌরাণিক মত, তাকেই অবলম্বন করতে হবে। রামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীর দল, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানের 'কৈশবী দল' ও ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—এঁদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈষৎ মতপার্থক্য থাকলেও এঁরা সকলেই কমবেশী পুরাণ-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভক্ত কেশবচন্দ্র বোধ হয় ততটা পুরাণবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ভক্তির আবেগে পুরাণোক্ত দেবদেবীকে যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হন নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় জীবনে ও আচরণে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেন বলে ধর্মীয় অনুভাবনায় সেই রীতিই অবলম্বন করেছিলেন। পুরাণ-ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ নিষ্ঠাবিশ্বাস ছিল।

৩

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে ব্রাহ্মসমাজ পারস্পরিক বিরোধে কিছু হীনবল হয়ে পড়লে কোন কোন প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক

ব্রাহ্ম পুরাণকে আর কুসংস্কার বলে অবহেলা করলেন না। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের যুব-সমাজের উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে ধর্মকে পরিত্যাগ করে রাজনীতি, সমাজনীতি, জনশিক্ষা ও সমাজসেবায় সঞ্চারিত হল। এরই কিছু পূর্ব থেকে পাশ্চাত্ত্য ভারততত্ত্ববিদেরা পুরাণের ইংরেজী অনুবাদ করে এবং পুরাণের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে শিক্ষিত ভারতবাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি এর দিকে ফেরাতে সমর্থ হলেন। এই পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য ধরনের শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ঝোঁকে ব্রাহ্মসমাজ ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দিকে ঢলে পড়েন নি। তিনি হিন্দুর বহুকাল-প্রচলিত সংস্কারের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ বহন করতেন না। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর এবং পরবর্তীকালে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' আলোচনা করার সময়ে তিনি হিন্দুধর্ম ও পৌরাণিকতা সম্বন্ধে নতুনভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', গীতার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন-এর অধ্যক্ষ রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টির সঙ্গে তাঁর লিপিযুদ্ধ থেকে তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায় এবং সেই প্রসঙ্গে পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তও বোঝা যায়।

১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'প্রচারে' "রাধাকৃষ্ণ" নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরদাস বাবাজির মুখে এই মন্তব্য দিয়েছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়া এই ধর্মার্থরূপকটি গঠন করিয়াছিলেন। ...কৃষ্ণ রূপক নহেন...তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু পুরাণে যে সমস্ত রূপকধর্মী অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তা স্বীকার

করেন নি। 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন; "ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগের সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সমস্ত উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দেশ করি নাই।"

এখানে লক্ষ্য করা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তাঁদের সাকার বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং সেই সমস্ত পৌরাণিক কথাকে "অদ্ভুত উপন্যাসের বিষয়" বলে কিছু ব্যঙ্গই করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে একটু গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, তিনি প্রকারান্তরে পৌরাণিক দেববাদ ও ঐতিহ্যকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম খণ্ডে তিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলে স্বীকার করেছেন—"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।" এখানে লক্ষণীয়, যা অনৈসর্গিক, অসম্ভব ও অবাস্তব—এমন বিস্তর ব্যাপার অন্যদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ও পুরাণে অজস্র আছে। লিভি, হেরোডোটস, ফেরিশ্‌তা প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসকারগণ সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা ও অতিরঞ্জনের রং মেশাতেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে, মহাকাব্যে ও ইতিহাসে এই ধরনের অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যাবে। সেই অতিরঞ্জন ও অলীক কথা থেকে পুরাণ-সাহিত্য ও মহাকাব্যকে রক্ষা করতে পারলে তার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের নতুন স্বরূপ ফুটে উঠবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের পটভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণসমাজ পৌরাণিকতার ঘোর বিরুদ্ধাচারণ করলেও নবজাগ্রত বাংলা সাহিত্য—যাকে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বলা হয়, তার মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র—এঁরা সকলেই পৌরাণিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেছিলেন। অবশ্য প্রাচীন পুরাণকে ঠিক অবিকল প্রাচীন কলেবরেই গ্রহণ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে পুরাকথাকে মার্জিত করে নিয়ে সাহিত্যে তাকে গ্রহণ করা—উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যগত নবজাগরণে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনৈসর্গিকতা, অতিরঞ্জন ও উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত প্রক্ষেপের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাব্য ও পুরাণে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার অনুপ্রবেশ করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানলব্ধ মানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং যৌক্তিকতাকে মূল নিয়ামক শক্তি বিবেচনা করে একালের অনেকে পুরাণের বাগ্‌বাহুল্যের মধ্য থেকে প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। কেউ প্রাচীন কাহিনীর অন্তরালে রূপকাশ্রয়ী ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন, কেউ-বা পুরাণের মধ্যে একালের ইতিহাসের অনুরূপ ব্যাপার সন্ধান করছিলেন।

পৌরাণিক দেবমণ্ডলের দুই প্রধান কুলপতি বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মানসিকতার আবির্ভাব হয়। এই নব্য বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীন ভাগবতধর্ম নয় বা মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নয়। আধুনিক জীবন ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় একধরনের মানবহিতবাদমূলক নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণকে উপস্থাপনার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে প্রবলবেগে শুরু হয়। নবীনচন্দ্র তাঁর 'ত্রয়ী' মহাকাব্যে কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে

পারে। কিন্তু শুধু একা বঙ্কিমচন্দ্র নন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিতসমাজ, যাঁরা মোটামুটিভাবে পরম্পরাগত ভারত-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা পুরাণের কৃষ্ণকেই নতুন যুগোপযোগী করে নিতে চাইলেন। এই মানসিকতার নাম দিতে পারি নব্য-পৌরাণিকতা। পুরাণকে কল্পকথা বলে বিসর্জন না দিয়ে তার অতিরঞ্জন ও রূপকের খোলসের মধ্য থেকে যথার্থ রূপ আবিষ্কার করা, ইতিহাসকে গড়ে তোলা, প্রাচীন ভারতের আত্মাকে খুঁজে বার করা—এই যুগের আধুনিক শিক্ষিতসমাজে এই অনুভাবনাটি ক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য এর একটা উগ্র *chauvinistic* রূপ শশধর তর্কচূড়ামণির [৪] প্রচারের মধ্যে ফুটে উঠল যা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে নি। সে যাই হোক, ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের নিষেধ সত্ত্বেও খ্রীস্টান মধুসূদন রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত কাহিনীকে অশ্রদ্ধা করে কাব্যপ্রাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করেন নি। তাঁর পূর্বে বিদ্যাসাগর, যিনি পৌরাণিকতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না, তিনিও ভাগবতের দশম একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে 'বাসুদেব চরিত'-এর কিয়দংশ রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও তাঁর অন্যতম ভক্ত ও পার্শ্বচর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়কে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রমাণে উৎসাহিত করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ('চিরঞ্জীব শর্মা') তাঁরই নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কখনও কখনও আবেগ বশতঃ 'নির্বিকার হরি' এবং মাতৃনামে বিবশ হয়ে বলেছেন ঃ

৪. 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের ('প্রচারে' প্রকাশিত) পাদটীকায় শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন : "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।" ('বিবিধ প্রবন্ধ'—বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১৮৭)

"মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা !...এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা, তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। :জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে।" ('আচার্যের প্রার্থনা')

আবেগতপ্ত এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র পৌরাণিক মানসিকতায় উপনীত হয়েছেন একথা স্বীকার করতে হবে।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জাতি ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করবার জন্য একটি জীবন্ত বিগ্রহ খুঁজছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কোঁৎ-পন্থী হলেও পরবর্তীকালে তার সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব সংযুক্ত করেছিলেন। এই সেশ্বর কোঁৎদর্শনই তাঁকে অনুশীলন ধর্ম (*Religion of Culture*) [৫] অর্থাৎ বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যীভূত মানবজীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল।

৫. লণ্ডন য়ুনিভারসিটি কলেজের ল্যাটিনের অধ্যাপক স্যর জন রবার্ট সীলী (১৮৩৪-৯৫) মূলতঃ ছিলেন ইতিহাসে আসক্ত। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থ (*Ecce Homo, 1865*) খ্রীষ্টানধর্মসংক্রান্ত, যাতে তিনি খ্রীষ্টের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই গ্রন্থেই তিনি সবিস্তারে অনুশীলন ধর্মের কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১২৯১ সালে প্রকাশিত "দেবীচৌধুরাণী" এবং ১২৯১-৯২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ধর্মতত্ত্বে' (১২৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর বচন উদ্ধৃত করেছেন,—"The substance of religion is Culture; the fruit of it, the Higher Life." (*Ecce Homo*, P. 145) তাঁর চিন্তায় সীলীর প্রভাব অনুসন্ধানের বিষয়।

"গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি" ('বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় খণ্ড) এবং 'ধর্মতত্ত্বে' (ক্রোড়পত্র-খ) গুরু-শিষ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় বৈরাগ্যবাদ বা মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানী সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি। মানববৃত্তি সমূহের সুসমঞ্জস সমন্বয় এবং তার মধ্য দিয়ে পরম পুরুষার্থে (ঈশ্বরভক্তি) উন্নয়ন—একথাই তিনি 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও অন্যান্য প্রবন্ধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুর ধর্মীয় কৃত্য ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে যথার্থ ধর্ম নেই, ধর্ম আছে অন্তরে, শুদ্ধাত্মার অন্তরে। এ-বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, আচারসর্বস্ব কিন্তু নীতিভ্রষ্ট হিন্দু হিন্দু নয়, বরং আচার-বিচারহীন ভক্ষ্যাভক্ষ্যে উদাসীন অথচ সজ্জীবন-যাপনকারী ব্যক্তি—তিনিই যথার্থ হিন্দু। এই দুই ব্যক্তির চিত্র উপস্থাপিত করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, "এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দু ধর্ম কি? একব্যক্তি ধর্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম? যদি আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়" ('দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম')। অর্থাৎ আচার নয়, সদ্বর্ত্মগামী নরোত্তমকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করতেন। সেই নরোত্তমের সন্ধানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্য অনুশীলন করতে লাগলেন, প্রাচীন গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রম করে কৃষ্ণচরিত্রকে সেই আদর্শের প্রতীকপুরুষ বলে অবধারণ করলেন। এ সম্পর্কে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর উপক্রমণিকা থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে: "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণে ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জন-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকার কৃত

কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।" বলা বাহুল্য এই 'পাপোপাখ্যান'-এর প্রায় সবটাই কৃষ্ণ-গোপীলীলা-সংক্রান্ত। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণ-রাধা-গোপীলীলার প্রতি তিনি অতিশয় প্রতিকূল ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও বলেছেন, "এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাস মাত্র, ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই।" 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'—গীতার এই বাণী সত্ত্বেও কৃষ্ণের গোপীসংসর্গ যে লৌকিক দিক থেকে পরদারাভিমর্ষণ বলে নিন্দিত হতে পারে এবং সামাজিক দিক থেকে এ-সব হানিকর উপন্যাস অতিশয় অশ্রদ্ধেয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এই প্রতিকূল মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধ্যসাধন অনেক সময়ে তাঁর কাছে "কামকুসুমদামশোভিত" ইন্দ্রিয়জ বাসনা বলে মনে হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' ও জয়দেব সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা এই ধরনের প্রতিকূল,—"যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।" তার ধারণা, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে, "কৃষ্ণচরিত্র বিশুদ্ধিতায়, সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য।" কেবল কালধর্মে তাতে অনেক অযথা দুর্নীতিপূর্ণ গালগল্প স্থান পেয়েছে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতে যে ধরনের কৃষ্ণ-গোপীলালা বর্ণিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যে আদিরসাত্মক আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু মাঝখানে বাদ সেধেছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। এ পুরাণের প্রাচীন রচনায় কি ছিল জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে যা প্রচারিত হয়েছে তাতে রাধাকৃষ্ণের চরিত্র আদিরসের উল্লাসে আবিল হয়ে পড়েছে। তাঁদের আচার-আচরণ ভাববৃন্দাবনের তুরীয়লোক ছেড়ে ভৌমবৃন্দাবনের ধূলিধূসর প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রভাব দেখা যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ব্রহ্ম-বৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই

বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ।" সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্র এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণের অনৈসর্গিক বাল্যলীলা এবং কৈশোর-যৌবনের গোপীলীলাকে তিনি কখনোই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি রাধাকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াসক্ত লীলায় বিশ্বাসীদের এইভাবে ধমক দিয়েছেন,—"যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ" (সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়)। এই ধরনের লীলাকে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' আধ্যাত্মিক বলে শোধন করেছেন,—"সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করামাত্র।" অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণের গোপীলীলাকে তিনি 'with a grain of salt' গ্রহণ করতে চান—আদিরসকে ভক্তিরসে উন্নীত করে তবে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে দৃষ্টিতে রাধাকে প্রত্যক্ষ -করেন বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে অবিকল তার মতো ছিল না, তা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও জানতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ১৩ই জুন দক্ষিণেশ্বরে তিনি ভক্তদের সঙ্গে বঙ্কিমপ্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন ঃ

> 'একজন ভক্ত বলিলেন, "শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।
> শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।"
>
> —কথামৃত, ৩য়।

পরে একথা ব্যাখ্যা করে বললেন, "ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, একথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই।" তখন 'প্রচারে' কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে পূজার প্রাক্কালে 'কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ' নাম নিয়ে সেই

ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এর ছ' বছর পরে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম সংস্করণের চেয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে ও বিশাল আকারে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ছ' বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অভিমত কিছু কিছু বদলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন, "প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে' যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ।" 'আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ' বাক্যাংশের অর্থ - প্রথম সংস্করণে তিনি কৃষ্ণচরিত্রের যাবতীয় অলৌকিক লীলা, যা নৈসর্গিকতাকে লঙ্ঘন করে এবং রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-গোপীলীলা, যা সামাজিক, লৌকিক ও নৈতিক আদর্শকে আঘাত করে, তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিছু কিছু তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ) 'মানস-বিকাশ' নামক একখানি কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এর পর প্রায় দু' বছর পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৮১, চৈত্র), 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন "বৈষ্ণব কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি

কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ-বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।”

এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন—মহাভারত, ভাগবত, জয়দেব ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কি এক চরিত্র? “চারিজন গ্রন্থকারই (অর্থাৎ মহাভারতের ব্যাসদেব, ভাগবতকার, জয়দেব ও বিদ্যাপতি) কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি একপ্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন?” অতঃপর এ প্রশ্নের কথঞ্চিৎ জবাব দেবার চেষ্টা করলেন ‘বিবিধ সমালোচনা’ (১৮৭৬) গ্রন্থের “কৃষ্ণচরিত্র” নিবন্ধে। ‘বিবিধ প্রবন্ধে’ প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ যে তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি এবং এ-বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার মন্থন করে তিনি যে একটি বিশাল কর্মের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তার প্রমাণ মিলল ১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ), যখন ‘প্রচারে’র আশ্বিন সংখ্যা থেকে তিনি বিস্তৃততর পটভূমিকায় কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ‘প্রচারে’ প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি কৃষ্ণচরিত্র লিখতে থাকেন। এর কয়েকমাস পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে ‘কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ’ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর ঐ ‘প্রচারে’-ই ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে দুই পরিচ্ছেদ (‘প্রস্তাব’ ও ‘যাত্রা’—দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত ১ম-৫ম অধ্যায়) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ছ’ বছর পরে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে ‘কৃষ্ণচরিত্রে’র সমগ্র অংশ দ্বিতীয় সংস্করণরূপে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ-গোপী-লীলাদি আদিরসের কাহিনীকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি দিয়েছেন, অবশ্য আবিল আদিরসকে ভক্তিরসের গঙ্গোদকে শোধন করে নিয়েছেন। ‘কৃষ্ণচরিত্র’-এর প্রথম সংস্করণ যে বৎসর এবং যে মাসে (১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ আগস্ট) প্রকাশিত হয় সেই মাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করেন। তিনি আরও কিছুকাল মর্ত্যলীলা নির্বাহ করলে দেখতে

পেতেন, ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমতীকে স্বীকার করেছেন, এমনকি বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি আদিরসাত্মক কাহিনীকেও নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে একপ্রকার মেনে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, বস্ত্রহরণাদি ব্যাপার "আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ" হলেও এবং "সেই সকল বর্ণনার বাহ্য দৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে" (কৃষ্ণচরিত্র, ২য় খণ্ড, ৭ম পরিঃ)। তারপর তিনি গীতার বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন, "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ—ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্বার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারী হইল।"

শ্রীরাধাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধি-সম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।…রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা তিনিই রাধা বা রাধিকা।" পরিশেষে এই বলে উপসংহার করেছেন, "রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন সন্দেহ নাই।"

এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে জগদীশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যীভূত নরোত্তম, ভক্তের ভগবান প্রার্থীর বাঞ্ছাকল্পতরু, আর একদিকে ধর্মসংস্থাপনের জন্য চক্রধারী 'কলয়সি করবালম্'। তাঁর মতে "খ্রীস্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা।" কিন্তু কৃষ্ণই হচ্ছেন নরজাতির একমাত্র শরণ্য, কারণ তিনি পূর্ণতার প্রতীক। সে যাই হোক, এই সময়ে পুরাণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকে দুই শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। একদিকে প্রাচীন সংস্কার ও সেকেলে পাণ্ডিত্য। এদেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা মনে করেন, "সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত।" প্রাচীন

ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করলে এঁরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে "মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।" আর একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্ত্যের 'ইণ্ডোলজিস্ট'গণ, যাকে বলতে পারি আধুনিক বিলাতী পাণ্ডিত্য। তাঁদের অনেকেই ঔপনিবেশিক দম্ভ বশতঃ প্রাচীন ভারতকে, বিশেষতঃ বৈদিক ও পৌরাণিক ভারতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে 'পাথুর‍্যা' প্রমাণ রয়েছে বলে সেটির খ্রীস্টপূর্ব প্রাচীনতা কোনও প্রকারে গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু হিন্দু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের কারও কারও মানসিক 'অ্যালার্জি' আছে। "তাঁহাদের বিচার প্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারত পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য।"[৬] আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই দলকে বাদ দিলেন। এ ছাড়া আর এক দল আছে। এঁরা হলেন ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা ও আদবকায়দার অন্ধ অনুকরণকারী। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ঝাঁঝালো হলেও অযৌক্তিক নয়,— "যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েত বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না,"— বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত অমেরুদণ্ডী জীবদের হিসেব থেকে থেকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত ও বিলাতী পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও "দেশ-বৎসল ও সত্যপ্রিয়", বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের জন্যই কৃষ্ণচরিত্র বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

অবশ্য একথা ঠিক, বিশুদ্ধ গবেষণা অথবা শাস্ত্রচর্চার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণালোচনা এবং কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হন নি। কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজছিলেন যার মধ্যে দৈবী

৬. 'লোকরহস্যে' "রামায়ণের সমালোচনা—কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত" কৌতুক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের পল্লবগ্রাহী বিলাতী পণ্ডিত-দের সরস ব্যঙ্গ করেছেন।

মহিমা নয়, মানুষের মর্যাদাই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। পুরাণাদি বিশ্লেষণে প্রস্তুত হয়ে তিনি দেখলেন, পুরাণকারেরা কোন কোন স্থলে কৃষ্ণকে ভূতলচারী সামান্য মানুষে পরিণত করেছেন; মানুষের নানা ধরনের চারিত্রিক দুর্বলতাও তাঁর চরিত্রে রয়েছে। মহাভারত, গীতা ও কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বিবিধ পুরাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, যে পুরাণ যত অর্বাচীন, সে পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের অনৈসর্গিকতা ও মানবিক দুর্বলতার ভাগ তত বেশী।[৭] শুধু কৃষ্ণকেন্দ্রিক পুরাণ কেন, শৈব পুরাণেও এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা পড়তে গেলে একালের পাঠক চমকে উঠবেন। বলা বাহুল্য পুরাণগুলি একসময়ে বা একহাতের লেখা নয়। হাজারখানেক বছর ধরে পুরাণের বহু পুঁথি ও তার নকল হয়েছে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট ব্যাপার উচ্চতর দার্শনিকতার সঙ্গে অবিরোধে এর মধ্যে অবস্থান করে আসছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, দেবভাষায় লেখা পুরাণমাত্রেই দেবভোগ্য নয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সমাজবিদ্যা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন তাঁর পক্ষে পুরাণকথাকে পুরোপুরি হজম করা কঠিন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে তণ্ডুল ও তুষ আলাদা করবার চেষ্টা করলেন। তিনি কালানুক্রমিক পর্যায় নির্ণয় করে, কোথায় তুষের ভাগ অধিক তা নির্দেশের জন্য সাধারণ জ্ঞান, বাস্তবচেতনা ও মুক্তবুদ্ধির যৌক্তিকতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন। যেখানে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, উদ্ভট অলৌকিতার বাহুল্য প্রবেশ করেছে, সঙ্গতিবোধের অভাব ঘটেছে, পুরাণের সেই অংশকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যাগ

৭. ভিন্‌তারনিৎজ্‌ও এই মতে বিশ্বাসী। তিনি এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন, "The later the Purana—this may be regarded as a general rule—the more boundless are the exaggerations." (*Indian Literature*, Winternitz. Vol. I, Part II, P, 465, Calcutta University Edition. 1963,)

করবার পক্ষপাতী। অবশ্য পুরাণের মধ্যে কতটুকু প্রাচীন ও যথার্থ, আর কতটুকু অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ, যুক্তি দিয়ে তার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। আমরা যে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপদ্ধতি ও সম্ভাব্যতার মাপকাঠি দিয়ে পুরাণসাহিত্য বিচারে অভ্যস্ত, তা পশ্চিমী বিদ্যালয় থেকে আহৃত। কিন্তু গ্রীক, হিব্রু ও খ্রীস্টানী পুরাণেও এমন অনেক গালগল্প আছে যে, তার মধ্যেও যুক্তিবুদ্ধি বিশেষ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র-অবলম্বিত গজকাঠি দিয়ে মাপলে পশ্চিমের তামাম পুরাণগ্রন্থকে বাতিল করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর—যখন প্রাচীন ভারতীয় ব্যাপারের প্রতি স্বাদেশিক ভারতবাসীর দৃষ্টি ফিরছিল, তখন পুরাণকেও অশ্রদ্ধার আঘাত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু ঝাড়-পোঁছ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, তার পরতে পরতে ধূলোবালি জমেছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা সে মলিন আস্তরণ ভেদ করতে অপারগ হয়ে পৌরাণিক ঐতিহ্যের শুধু দোষকীর্তন করেছেন। পুরাণকে যুগসঞ্চিত মালিন্য থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ বুদ্ধিকেন্দ্রিক সংস্কার অর্থাৎ যুক্তিকে মধ্যস্থ মেনে অগ্রসর হলেন। পুরাণ, ভক্তিগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ বলেই নয়—বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করলে এবং তণ্ডুলকণা থেকে তুষ ঝেড়ে ফেললে পুরাণের মধ্যে পুরাতন ভারতকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।[৮] এই দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এক হাতে পাশ্চাত্ত্য দোষদর্শী গবেষকদের ঠেকাতে হয়েছে, আর একদিকে পুরাণের অন্ধভক্ত এদেশীয় পণ্ডিতদের নয়নে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করতে হয়েছে। পুরাণকে নবীকরণ নয়, পুরাণের মধ্যে যে সমস্ত অলীক বচন ও অযথার্থ বর্ণনা স্ফীত হয়ে মূলকে আবৃত করেছে, কোথাও কোথাও বিকৃত করেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তারই বিরুদ্ধে যুক্তির অস্ত্র ধারণ করেন। দেশব্যাপী জাড্যের

বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ করা মহাসত্ত্ববান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। 'বঙ্গদর্শন'-গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় এদিক থেকে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যত্রয় আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই যুগকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরকে 'Hindu religious revival'-এর যুগ বলেছিলেন।[১] কিন্তু revival শব্দটিতে পুরাতনের অনুবৃত্তি বোঝায়। বঙ্কিম-প্রভাবিত এই যুগ প্রাচীন ও পুরাতন হিন্দুয়ানিকে কি অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করেছিল? এ যুগে যখন ঘরে ফেরার পালা শুরু হল, তখন স্রোতোধারা গোমুখীগহ্বরে ফিরে যাবার বৃথাচেষ্টা করে নি; জীবন ও ঐতিহ্য নতুন পথেই চলতে শুরু করল। পুরাতন সাহিত্য, স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন প্রভৃতিকে প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে অনুস্বর-বিসর্গের টঙ্কার সৃষ্টি করতে চান নি। বুদ্ধি ও বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে পুরাণকে গ্রহণ করতে হবে। বেদব্যাস, বোপদেব বা অন্যান্য লেখক, যাঁরাই পুরাণ রচনা করুন না কেন, এর মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপার প্রবেশ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার থেকে পুরাণকে মুক্ত করে নিতে হবে, এবং কল্মষ-মুক্ত পুরাণে শুধু নিত্যধর্ম নয়, যুগধর্ম-সন্ধানেরও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পুরাতন সংস্কার থেকে মুক্ত করে পুরাতনকে নব্যজীবনের পাশাপাশি দাঁড় করাতে হলে এই গ্রন্থগুলিকে বুদ্ধির অসপত্ন মহিমায় স্থাপন করতে হবে। নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হলেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত প্রতীতির মানদণ্ডেই পুরাণকে বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ-বর্জন করেছেন। এই গ্রহণ-বর্জনের মূল কথা হল মানবিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণের মধ্যে যুগের বাণী সন্ধান করতে লাগলেন। যেখানে যুক্তি-বুদ্ধির সায় নেই, যা যুগধর্ম বিরোধী, পুরাণের সেই অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পেল না—অনেকটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ-আনুগত্যের

১. *B. N. Seal—New Essays in Criticism*

মতো। যদিও উপনিষদ মহর্ষির আত্মার খাদ্যপানীয়ে পর্যবসিত হয়েছিল, তবু তিনি বহু-প্রচারিত এগারখানি উপনিষদের সব মন্ত্রই ব্রাহ্ম-সমাজের অনুকূল বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। বৃহদারণ্যকের 'সোঽহমস্মি' এবং ছান্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' নিয়ে মহর্ষি বড়োই চিন্তায় পড়লেন। আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্যসহ উপনিষদগুলি কি ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক বীজ হতে পারে? উপনিষদের যে সমস্ত মন্ত্র তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল, তিনি নিজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু সেইগুলিকে গ্রহণ করলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি উপনিষদের বাছা বাছা ছত্র বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তা তৎক্ষণাৎ লিখে নিলেন।[১০] এইভাবে ঘণ্টা তিনেকের অনুলিখনে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচিত হল। এখানেও দেখা যাচ্ছে, মহর্ষি স্বানুভাবানুকূল শ্লোক ও ছত্রগুলিকে গ্রহণ করেছেন, সমগ্র উপনিষদকে নয়। এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ কি? এ-ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধের মতো গ্রন্থের প্রতি আনুগত্য দেখান নি। তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য যার দ্বারা সিদ্ধ হবে, তিনি উপনিষদের শুধু সেই অংশগুলিকে ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও সংস্কার নয়, দেবেন্দ্রনাথ জাগ্রত বুদ্ধিকে উপনিষদ বিচারে নিয়োগ করেন। বঙ্কিমযুগ অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কার্য-কারণাত্মক অভিজ্ঞাকে পৌরাণিকতার যৌক্তিকতা নির্ধারণে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মোটকথা পুরাণ ও পুরাণজাতীয় ভারতীয় ঐতিহ্যের যেটুকু যুক্তি-বুদ্ধি ও স্বাভাবিকতা-অনুমোদিত এবং যা বিচিত্র হলেও অলৌকি-কতার মোহমুক্ত, তাকেই আমরা নব্য পৌরাণিকতা বলতে পারি। বঙ্কিম-চন্দ্র ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের দল সেই পথের পথিক। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য এবং বেদানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র সেই বুদ্ধিমার্গীয়

বাস্তব নীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। পৌরাণিক সংস্কৃতি বিচারের এই রীতিটি বাংলাদেশ থেকেই সারা ভারতে প্রসৃত হয়েছিল। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ও ষড়দর্শনের প্রভাব একালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কিন্তু পৌরাণিক সংস্কার বৃহত্তর জনসমাজে প্রচলিত। এখনও আমরা মুখে বেদান্ত-উপনিষদের কথা বললেও আচারে-আচরণে এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঘোরতর পৌরাণিক। ইদানীং সার্বজনীন পূজাপার্বণ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমরা যে কোনও সুদূর ভবিষ্যতেও স্থূল পৌরাণিকতা ছেড়ে সূক্ষ্মতর উপনিষদ-বেদান্ত তত্ত্বে উপনীত হব এমন কোন সম্ভাবনা নেই।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত নব্যপৌরাণিকতার একটি দুর্বলতার দিক আছে। শুধু যুক্তি-বুদ্ধিকে একমাত্র শরণ্য বলে মেনে নিলে পৌরাণিক ব্যাপারের মধ্যে বহু ছিদ্র আবিষ্কার করা যাবে। স্বাভাবিকতা ও লৌকিকতার দ্বারা বিচার করলে এবং প্রাকৃত বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে পুরাণের বহু অংশ পরিত্যাগ করতে হবে। পরিত্যাগ না করলে দোটানায় পড়তে হবে। মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রকেও সেই ধরনের বিপদে পড়তে হয়েছে। লৌকিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে চললে কৃষ্ণের গোপীলীলা, বিশেষতঃ রাধাঘটিত কাহিনী পরিপাক করা দুরূহ হবে। এই জন্য ভক্ত বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের এই প্রসঙ্গকে অপ্রাকৃত এবং অচিন্ত্য বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে স্বীকার করেছেন যে কৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা, বৈকুণ্ঠ, রাধা—সবই রূপক।[১১] তাঁর মতে, নিদিধ্যাসন করলে ঈশ্বরোপাসনার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করিঃ "যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ এবং সর্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত

১১, দ্রষ্টব্য ঃ বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় খণ্ড ('গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি')

জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তাস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।”[১২]

এই কথাটাই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন, “ধর্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা ; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাসনা ; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।” এই যে জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা, এতে কি তাঁর অন্তরের ক্ষুধা তৃপ্ত হয়েছিল ? ‘ধর্মতত্ত্বে’ গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন; “অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব ?” “লইয়া কি করিতে হয় ?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্যনিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি।……এই পরিশ্রম, এই কষ্ট-ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।”[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিমার্গীয় নব্য পৌরাণিকতা শেষপর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় এসে পৌরাণিকতার নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। পৌরাণিক বিশ্বাস

১২. ‘গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি’ (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়)

১৩. ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায় (‘ঈশ্বরে ভক্তি’)

ভারতের শুধু প্রাচীন বিশ্বাস নয়, সর্বযুগের শরণ্য এবং শুধু বুদ্ধিবিচার নয়, জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম সত্তায় পৌরাণিক ভাবমূর্তিকে যথাযথ-ভাবে পরিস্থাপনা—এই আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও বিশ্বসভায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সে আর এক যুগের কথা।

রবীন্দ্রনাথ ও উনিশ শতক

সংস্কৃতি ও জীবনসাধনা ক্ষয়হীন মর্মরপ্রাসাদ নয়; প্রাণের ধর্ম বিকশিত হওয়া, বিবর্তিত হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া। মানুষের জীবধর্মী প্রাণসত্তা সূক্ষ্মতর চৈতন্যকে অবলম্বন করে সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়। প্রাণধর্ম ও সংস্কৃতির ধর্ম মূলতঃ এক; উভয়ের নানা রূপান্তর ও ভাবান্তরের বিকাশপরম্পরা জাতি ও মানসকে আশ্রয় করে। তাই জাতি ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়মূল ঐতিহ্যেরও রূপান্তর হতে পারে। কারণ সংস্কৃতির অর্থ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহমান জীবনচেতনার নিগূঢ় নির্যাস। আমাদের বাংলাদেশের উনিশ শতকের জীবন ও সাধনার সামান্য পরিচয় নিলে একথাটাই সপ্রমাণ হবে যে, বাংলার যে-সংস্কৃতি উত্তরাপথের উত্তরাধিকার থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছে, সেই সংস্কৃতিই গত শতাব্দীর প্রথম দিকে রূপান্তরের সম্মুখীন হল এবং দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম সমুদ্রতীরের লবণাক্ত বায়ুবেগে বাংলার পূর্বতন ঐতিহ্যের জীর্ণ প্রাসাদ প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে পড়ল। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তখন মুঘল রাজমহিমার উজ্জ্বল দীপশিখা নিভে আসছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সহস্র-এক রজনীর রূপকথার দ্রুত অপসরণ হল এবং বহির্ভারতীয় গৃধ্নু বৈশ্যতন্ত্র রাজতখ্‌তে আসীন হল। তার পরের কথা ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু উনিশ শতকেই বোঝা গেল যে, এতদিন ধরে "শকহূনদল পাঠানমোগল" ভারতীয় আর্যসভ্যতার যে মিশ্ররূপ দিয়েছিল, তার পরিবর্তন আসন্ন।

পরিবর্তন এল। রাষ্ট্রের আকার-আয়তন বদলাল, রাষ্ট্রচেতনার আমূল রূপান্তর হল, সমাজজীবনও অটুট রইল না। জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমা বাড়ল; জম্বুদ্বীপের বাইরে যে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা রয়েছে, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল। মধ্যযুগীয় সমাজ, ধর্ম ও ঐতিহ্যচেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলেবর পরিত্যাগ করে যখন নব বেশে আবির্ভূত হল, তখন বাঙালী-মানসের জন্মান্তর হয়েছে। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ জীবনাদর্শ ভেঙে পড়েছে, নব সভ্যতার আদ্যাপীঠ কলকাতা তখন বণিক-ধনিক-মুৎসুদ্দি-আমলা-মামলার কলরবে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সুতোনুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতার হোগ্‌লার বন যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় রাতারাতি লোপ পেল এবং রম্যানগরী রঙ্গসজ্জা করে নতুন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হল। সে আলাদিন- শ্বেত বণিক। ধীরে ধীরে কলকাতার চার পাশ ঘিরে একটি বৈশ্য সভ্যতা গড়ে উঠল, নাগরিকতার সৃষ্টি হল। এখন আর গৌড়, টাঁড়া, রাজমহল, ঢাকা, মুরশিদাবাদ নয়; এ হল কলকাতা—যার অদূরে নীল-সমুদ্র, যে সমুদ্রের সঙ্গে গৈরিক গঙ্গার মিতালি, যে গঙ্গা নাগরিক সভ্যতার বাণিজ্যবাহিনী। সেই গঙ্গার তীরে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টম পুত্র, প্রিন্স্‌ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধর রবীন্দ্রনাথের জন্ম হল।

১

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দ থেকে উনিশ শতকের শেষভাগের মধ্যে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে বিচিত্র পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে, তার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য; কিন্তু বাঙালীর সমগ্র চেতনার আমূল রূপান্তরই অধিকতর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। কাজকর্মের সুবিধার জন্য ইংরেজ বণিক যৎসামান্য বিলাতী বিদ্যার চাষ আরম্ভ করেছিল; মনের উর্বর মাটিতে সামান্য আবাদ করতেই সোনা ফলল। ইংরেজি বিদ্যা বাঙালীর

মধ্যযুগীয় সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত দিল। ইংরেজি ভাষার মারফতে সারা পশ্চিমী সভ্যতাকে আমরা এক নজরেই চিনে নিতে পারলাম। ঐহিক লাভ তো হলই ; সব চেয়ে বড়ো লাভ, দীর্ঘকালের তন্দ্রাজড়িমাকে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে আমরা জাগ্রত জীবনের রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। আম্রবনচ্ছায়াশীতল গ্রাম্যজীবনের নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের কাল ক্রমেই হ্রস্বতর হয়ে এল। তখনও বাউল-কীর্তন-ভাটিয়ালি গানে বাংলার কুটীর-প্রান্তর মুখরিত ছিল বটে ; কিন্তু উনিশ শতক থেকেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমা মানবমুখী হতে আরম্ভ করল। এতদিন দেবতা, দেবতার অবতার বা ভক্ত মানুষের কথা সাহিত্য ও জীবনে প্রধান হয়েছিল ; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবন ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী য়ুরোপের জীবন-বাদী সভ্যতাকে আপন বলে বেছে নিল। সুতরাং জীবনসমুখ তত্ত্বকথা অধিকতর জনপ্রিয় হল, রাষ্ট্র-শাসন ও রাজনীতি জীবনের প্রান্তে হানা দিল, নিদ্রাতুর অজগর-সমাজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল, স্থাবর ও স্থাণু জঙ্গম ও গতিশীল হল। জীবনের বহিরঙ্গ, বাস্তব প্রয়োজন, পার্থিব আকাঙ্ক্ষা সদাসন্তুষ্ট চিত্তপ্রবাহকে কল্লোল মুখর করে তুলল, জীবনের মূল্যমানেরও রূপান্তর হতে শুরু হল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন, ডিরোজিও-গোষ্ঠী ও 'ইয়ং বেঙ্গল,' বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মনীষীদের আত্ম-নিয়োগের ফলে প্রবহমান জীবনধারাকে আমরা নতুন করে পরীক্ষা করে নিতে আরম্ভ করলাম। এতদিন ধরে নির্বিচারে সবকিছুকে উদাসীনভাবে স্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলাম। এইবার এল বাদপ্রতিবাদের যুগ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটা সমন্বয়ের রেখা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

বিচিত্র প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যেই আত্মার মুক্তি, ছন্দের পাখায় ভর করে চিদাকাশে তাঁর মহাসঞ্চরণ। সব সাহিত্যই অল্পাধিক সমাজের সঙ্গে অন্বিত। কিন্তু গীতিকবিরা আপন ব্যক্তিচেতনার হর্ম্যচূড়ায় স্বেচ্ছাবন্দী। তাই তাঁরা অনায়াসে দেশকালের বন্ধন ছাড়াতে

পারেন। অবশ্য তাঁদের কাব্যে যে দেশকালের পরিবেশ রচিত হয়, তা তাঁদেরই চেতনাসৃষ্ট দেশকাল। সুতরাং গীতিকবি যদি "সমাজ সংসার মিছে সব" বলে পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রতীতিকে পাশ কাটিয়ে যান, তা হলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ গীতিকবি। গীতি-কবির আত্মকেন্দ্রিক মনোধর্ম তাঁর অন্যান্য রচনাতেও কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও বা পরোক্ষভাবে ছায়া ফেলেছে; কিন্তু তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের যে দেশকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার প্রভাব তাঁকেও যে কতখানি চঞ্চল ও কর্মব্যাকুল করে তুলেছিল, তা তদানীন্তনকালের সামান্য পরিচয় নিলেই জানা যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ার উদ্দাম গতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে; সাহিত্য, জীবন, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে খানিকটা স্থায়ী বিকাশ পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করেছে। সেই পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথকেও আবিষ্ট করল। বাতাসের মধ্যে বাস করে বায়ুচাপের বাইরে যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাস করে শতাব্দীর বাণী ও বার্তার বাইরে যেতে পারেন নি। সমকালীন দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র-আন্দোলন, ঐতিহ্যচিন্তার সংঘাত সংঘর্ষ তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় নি। তাঁকেও উনিশ শতকের ঝঞ্ঝাবাতাসে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল। তাঁর উক্তি—

> "আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটা-কতক ভাঙা ঢাল, বর্শা ও মরচেপড়া তলোয়ারখাটানো দেউড়ি, ঠাকুর-দালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটামোটা জালাসাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পাল-পার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতির বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসার তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌছয়নি।"

এ ১৮৬১ সালের কথা। ঠাকুরবাড়ীর সদর দেউড়ি পার হয়ে

আগন্তুক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তখন অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। ইতিপূর্বে কলকাতার ইংরেজি-জানা মহলে এক নতুন কাল এসে গেছে। ঠাকুরবাড়ীতে তখন একদিকে চলেছে ঔপনিষদিক সাধনা, আর একদিকে স্বাদেশিকতার দীক্ষামন্ত্র এবং শেকস্‌পীয়র, ওয়ল্টর স্কটের সাহিত্যরস-সম্ভোগ। তারই মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর কনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। সমসাময়িক ঘটনার একটু নিরিখ নেওয়া যাক।

সিপাহীবিদ্রোহের পর রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় তিনবৎসর আগে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীনে গেল (১লা নভেম্বর, ১৮৫৮)। এর সামান্য কিছু পরে ১৮৫৯ সালে বাংলার যশোহর, খুলনা, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের রায়তেরা জমিতে নীল চাষ করতে অস্বীকার করল। ফলে মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সংহত প্রতিরোধ সৃষ্টি হল। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'Hindu Patriot' পত্রে নীল আন্দোলন উপলক্ষ্য করে তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধিতা শুরু হল। এই কৃষাণবিদ্রোহ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করল, নাটকে ছড়াগানে তার প্রভাব সঞ্চারিত হল। হরিশ মুখোপাধ্যায় নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করে শ্বেতাঙ্গরোষে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। এই সময়ে ১৮৫৯ সালের গোড়াতেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হল এবং প্রায় একই সময়ে রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্রনাথের ছয় বৎসর বয়সের সময়ে ঠাকুরবাড়ীর তরুণেরা নব-নাট্যান্দোলনে যোগ দিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, গুণেন্দ্রনাথ, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী সেন (কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা), অক্ষয় চৌধুরী—এঁরা মিলিত হয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক' অভিনয়ে (১৮৬৭) প্রস্তুত হলেন। এর আগেই দেশের মধ্যে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন (১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়) প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮৬৫ সালের পর বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, ১৮৬৭ সালে Bengal Social Science Association-

এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই বছরেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার Indian Association for the Cultivation of Science স্থাপন করেছেন। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির বৎসরে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৭ সালের মধ্যে ইংরেজি-শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। একদল চাকুরীকামী মধ্যবিত্ত যুবক তখন ডেপুটী-স্বর্ণমৃগের প্রতি মহোল্লাসে ধাবমান।

ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে তখন নানারকম আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করেছে। ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সান্নিধ্য ত্যাগ করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ('নববিধান') গঠন করেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ শেষ পর্যন্ত ভক্তিভাবের অতিরেক ত্যাগ করতে পারলেন না। ফলে তরুণ ব্রাহ্মেরা তাঁর কথা ও কাজকে শিরোধার্য করতে অক্ষম হলেন। তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে পরিত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করলেন (১৮৭৮)। তখন রবীন্দ্রনাথ সতের বৎসরের উত্তর-কিশোর। ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে পুরাণাশ্রয়ী হিন্দু ঐতিহ্য আবার জেগে উঠল। 'বঙ্গদর্শন', 'সাধারণী', 'নবজীবন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রে বঙ্কিম ও তাঁর শিষ্যদের পরিকল্পিত ও প্রচারিত নব্য হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত হিন্দুর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করল। আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন দিনই হিন্দু ঐতিহ্যকে সর্বপ্রকারে বর্জন করে নি। রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭) পুস্তিকায় একটি উদারতর পটভূমিকায় হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের সমন্বয়ের কথা প্রচারিত হল। কেশবচন্দ্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতারা সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেও উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে শিক্ষিত হিন্দুসমাজে বঙ্কিম-প্রচারিত তত্ত্বকথা ও ধর্মাদর্শ অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অবশ্য তার জন্য শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই দায়ী নন। তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য মূলতঃ যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের' ভোজবাজিতে তিনি কিছুকাল সম্মোহিত হয়ে থাকলেও অচিরে

যুক্তিবুদ্ধিকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি কোঁতের সঙ্গে গীতার, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, যুক্তির সঙ্গে ভক্তির সমন্বয়চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল প্রবল স্বাদেশিকতা—যে স্বাদেশিকতা বুদ্ধিকেন্দ্রিক হলেও দেশের বহমান সংস্কৃতিকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেতে পারে না। আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও বুদ্ধিকে কেন্দ্র করেই এঁদের চিত্তজগতে অভিযান শুরু হল। মহর্ষি শান্তভক্তির উপাসক হলেও অক্ষয়কুমারের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত বেদের অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করে নির্মোহ যুক্তি-বুদ্ধির গৌরব স্বীকার করলেন।

বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন আর একটি ব্যাপারে নতুন জীবনপ্রত্যয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালী সমাজে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করলেন। পরমহংসের উদার ধর্মমত ও মানবজীবনের সুখদুঃখের প্রতি অসীম মমতা এবং স্বামীজীর প্রচণ্ড পৌরুষ, জ্ঞানকর্মের বজ্রনির্ঘোষ এবং পতিত মানুষের প্রতি অখণ্ড প্রত্যাশা ধর্মকলহজর্জর হিন্দু সমাজে নতুন প্রত্যয়ের অনির্বাণ আলোক-পিপাসা সৃষ্টি করল।

ইতিপূর্বে ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় এবং নবগোপালের অদম্য উৎসাহে হিন্দুমেলার (চৈত্রমেলা) বার্ষিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই জাতীয়তা বা 'ন্যাশনাল' কথাটি শিক্ষিতসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করল। যদিও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শে চারিদিকে 'ন্যাশনালের' ছড়াছড়ি পড়ে গেল, কিন্তু এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, এই হিন্দুমেলা থেকেই গঠনমূলক স্বাদেশিকতার যথার্থ আরম্ভ হল। এই মেলার কর্তৃপক্ষ শুধু উত্তেজনার আগুন সৃষ্টি না করে জাতির শিল্প, সাহিত্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। যখন এই মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসরের শিশু মাত্র। এই হিন্দুমেলার স্বাদেশিক আন্দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের

বাল্য ও কৈশোরের অনেকটা অতিবাহিত হয়। একটু সন্ধান করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে, পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে হিন্দুমেলার ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনিশ শতকের শেষাংশের রাষ্ট্র-আন্দোলন বিশুদ্ধ রকমের রাজনৈতিক আন্দোলন। বহুদিন এই আন্দোলন একচক্ষু হরিণের মতো রাজনৈতিক উত্তেজনাকে রাজনৈতিক চেতনা বলে মনে করত।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচেতনার কৌলীন্য কিন্তু অন্যপ্রকার। দেশের সামগ্রিক জাগরণ ও বিকাশকেই তিনি যথার্থ রাষ্ট্র-আন্দোলনের মূল্য দিয়েছেন; এর প্রথম শিক্ষা হয় হিন্দুমেলা থেকে। মেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৫) চৌদ্দ বৎসরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কবিতাটির গুণাগুণ বিচার না করেও বলা যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দীপনা, পরাধীন ভারতের জন্য লজ্জা এবং মাতৃভূমিকে পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দেশবাসীকে একসূত্রে মিলিত করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল একটি চতুর্দশবর্ষীয় কিশোরের কণ্ঠ থেকে। তখন চারিদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনার উন্মত্ততা শুরু হয়েছে। ক্ষুব্ধ সুরেন্দ্রনাথ ('সারেণ্ডার নট্') বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি --এঁরা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) স্থাপন করেছেন। এঁরাই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতকে রাজনীতির দিক থেকে একসূত্রে বাঁধবার পরিকল্পনা করেন। ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ তহবিলে সঞ্চিত টাকা আফগান যুদ্ধে ব্যয় করায় দেশে ভয়ানক অসন্তোষ দেখা দিল, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ মুখর হয়ে উঠল। এর প্রতিবিধানে পাস হল ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮); দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হল। এই বৎসরেই অস্ত্রআইন জারি হল। সরকারের সমালোচনা বা আত্মরক্ষার ক্ষীণতম প্রচেষ্টাও রাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হল। ১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিল নিয়ে 'কালা-ধলা'র মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ ঘনিয়ে এল। ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতি-নিধিমূলক সরকার গঠন, অস্ত্র-আইনের প্রত্যাহার, সিভিল সার্ভিসের বাধা

দূর ও সংস্কার প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হল। এই ১৮৮৫ সালেই বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রথম অধিবেশন শুরু।

এই উত্তেজক রাজনৈতিক আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয়েছিলেন, তার কিছু কৌতূহলজনক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মাৎসিনির 'কার্বনারি' *(Carbonari)* নামক গুপ্তসভার অনুকরণে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ এবং ঠাকুরবাড়ীর তরুণের দল ঠন্‌ঠনের পড়ো বাড়ীতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সভা স্থাপন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সভার একটি গুপ্ত নামও দিয়েছিলেন—'হাম্‌চুপামুহাফ্‌'। এর কাজকর্ম হত সাঙ্কেতিক ভাষায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সেই সাঙ্কেতিক ভাষার উদ্ভাবন করেন। 'হাম্‌চুপামুহাফ্‌' এবং এর সাঙ্কেতিক ভাষা শুধু এই সভার দীক্ষিতেরাই জানতেন। বেদপাঠ, মড়ার খুলি, মন্ত্রগুপ্তি প্রভৃতির দ্বারা সভার উদ্যোক্তারা বেশ তান্ত্রিক অভিচারের আয়োজন করেছিলেন। "যেদিন নূতন কোন সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় (রাজনারায়ণ বসু) লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি, অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি)। উত্তরকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই সভাপর্বের রোমহর্ষক রহস্যময়তাকে কৌতুকহাস্যের দ্বারা লঘু করে বলেছেন, "অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।" কিন্তু বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১৮৭৬-৭৭ সালের দিকে গুপ্তসমিতির পরিকল্পনা পঞ্চদশ বর্ষের কিশোরের মনেও বাসা বেঁধেছিল। অবশ্য ১৮৭১ সালে ওয়াহবি নেতা আবদুল্লা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কলকাতা টাউনহলের সামনে হত্যা করলেও তখনও হিন্দুসমাজে গোপনীয় ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র সংঘর্ষকে কার্যসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র সন্ত্রাস-

বাদের গুপ্তমন্ত্রকে বিশেষ স্বীকৃতি দিতে সম্মত হন নি—'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' তার প্রমাণ। কৈশোর জীবনের উত্তেজক রাজনৈতিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথকে আরও কয়েকবার বিক্ষুব্ধ করেছিল। ১৮৭৬ সালে লর্ড্ লিটনের দিল্লী দরবারের অন্তঃসারশূন্যতাকে আক্রমণ করে কিশোর কবি লিখলেন একটি দীর্ঘ কবিতা; সেটি তিনি আবৃত্তি করলেন হিন্দুমেলার অধিবেশনে ('রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়')। দিল্লীর রাজস্য় যজ্ঞে নতজানু রাজন্যবর্গকে ধিক্কার দিয়ে লেখা কবিতাটিতে কবির যে অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত হল, তার কাব্যমূল্য যাই হোক, কবি-কিশোরের মনে এই ঘটনা যে কিরকম তীব্র অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত করেছিল, তা আমরা এখনও অনুমান করতে পারি।

২

উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত ও বাগ্‌বিতণ্ডা রবীন্দ্রনাথকে যে কীভাবে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করল, তা সমসাময়িক ঘটনার সামান্য পরিচয় নিলেই দেখা যাবে। ১২৮৮ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার স্বরূপ এবং শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নিয়ে নিতান্ত তরুণ বয়সে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন, তাতে তাঁর গঠনপন্থী ক্রিয়াবান মন ও প্রাণের বলিষ্ঠ স্বরূপ ফুটে উঠল। পাশ্চাত্ত্য জাতির লোভলোলুপতা সারা বিশ্বে যে কিরকম মারণযজ্ঞের আয়োজন করছে, ঐ বৎসরের 'ভারতী'তে তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। ১২৮৮-৮৯ সালের মধ্যে 'ভারতী' পত্রে তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ সালে (ইংরেজি) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। উপন্যাসটির শিল্পকলার বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই। কিন্তু কবি যে কৈশোরের 'সঞ্জীবনী সভা'র উত্তেজনা কাটিয়ে উঠে উদ্ধত জঙ্গী মনোভাবের প্রতি

বিরূপ হয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই উপন্যাসে—প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি যা বলেছেন, তা থেকে তাঁর মতটি পরিস্ফুট হবে—"স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করার চেষ্টা চলছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।··· আমি যে সময়ে এই বই অসঙ্কোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।" কথাটা ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে অতিশয় সত্য। উদ্ধত, সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে এই সময় থেকে প্রবল হতে থাকে—এখানে তার সূত্রপাত। এই একই কারণে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না ('পুরাতন প্রসঙ্গ'— ২য়)।

শাসকশক্তির মূঢ়তার ফলে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠছিল। আবেদন-নিবেদনের ভাষাও শাণিত হল। ইলবার্ট বিলের ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ অগ্নিবর্ষী বাগ্মিতার গুণে চারিদিকে উত্তেজনা সঞ্চার করেছিলেন। ভারতসরকার মিথ্যা অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথকে কয়েদ করলেন। তখন সারা কলকাতার ছাত্র ও যুবসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অথচ বিস্ময়ের বিষয় রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'ভারতী' পত্রে রাজনৈতিক প্রবন্ধের সূচনা করলেও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেফতার প্রসঙ্গে নীরব রইলেন। জনসমুদ্রের জোয়ার যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। এই সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তপ্ত আন্দোলন থেকে তিনি যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার অবশ্য মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতায় ছিলেন না বলেই এই রাজনৈতিক উত্তেজনার খবর রাখতেন না। "তখন তিনি কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বাস করিতেছিলেন,

কলিকাতার ছাত্রজনতার উত্তেজনা তিনি দেখেন নাই, দেখিলে কবির স্পর্শচেতন মন নিশ্চয়ই সাড়া দিত" (রবীন্দ্রজীবনী—১ম)। আমাদের কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ হয়। ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করে কলকাতার জনবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক 'অ্যাজিটেশন'-এর প্রতি সম্ভবতঃ কবি আকৃষ্ট হন নি। ১২৮৯ থেকে ১২৯৩ সনের মধ্যে তিনি এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈষৎ আক্রমণ করেছিলেন। প্রতিবাদ ক্রমে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর উক্তি, "আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।...ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।" কবি প্রথম যৌবনে উনিশ শতকী রাষ্ট্র-আন্দোলনের কোটালের জোয়ারে ভেসে গেলেন না, দেশচেতনার বিরাট পটভূমিকায় সমগ্র জাতিমানসের নবজাগরণের পরিকল্পনা করলেন। কৈশোরে 'সঞ্জীবনী সভা'-প্রসঙ্গে "উত্তেজনার আগুন পোহানো" ('জীবনস্মৃতি') একদা তাঁর কাছে কৌতুকজনক মনে হয়েছিল; যৌবনে রাজনৈতিক তাণ্ডবের দিনে তাতে বিতৃষ্ণা এল। বাক্‌সর্বস্ব আন্দোলন, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ইংরেজবিরোধিতার দ্বারা জাতি যে কোন দিক দিয়েই লাভবান হবে না, রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে সুদৃঢ় স্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করলেন। 'স্বদেশী সমাজ'-এ তিনি পরবর্তীকালে যা বলেছেন, প্রথম যৌবনে স্পষ্ট করে সেই কথাটাই উচ্চারণ করলেন, "ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র। আমাদের চারিদিকে আমাদের আশেপাশে আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্রে।" রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে যে ধরনের জাতি, জীবন ও রাজনীতির সর্বাঙ্গীণ মূর্তি অঙ্কন করেছেন, "আত্মশক্তি"তে যার যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে, উনিশ শতকের অষ্টম দশকের দিকেও সেই আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। পরবর্তীকালে বড়লাটের মন্ত্রীসভায় ভারতীয় নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ ('মন্ত্রী অভিষেক'—ভারতী, ১২৯৭) রচনা করলেন, কিন্তু ভাষা যথেষ্ট প্রখর

হল না। ইংরাজ সরকারের প্রতি অভিযোগ থাকলেও তাতে তখনও অবিশ্বাস বা ঘৃণা সঞ্চারিত হয় নি।

কিন্তু ক্রমেই বিতৃষ্ণা এল। 'সাধনা'য় (১৩০১) 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি দেখালেন যে, ক্রোধের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রয়োগ না করে সমগ্র জাতি ও মানসের উন্নয়ন সাধনই যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা। 'সাধনা' পত্রে তিনি নানা প্রবন্ধে রাজনৈতিক জীবনের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন। 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থে সেই সমস্ত প্রবন্ধ সংকলিত হল। তিনি দেখালেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন আবেদন-নিবেদন ও মান-অভিমানের পালা ছাড়িয়ে বেশী দূর যেতে পারে নি। আমরা, উচ্চশিক্ষিতেরা, দল বেঁধে বিদেশী শাসকের কাছ থেকে চাকুরী ও খেতাব আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছি, সমস্ত দেশকে ডাকতে পারি নি। কংগ্রেসের অধিবেশনে আলাপ-আলোচনা— সমস্তই ইংরেজিতে হত। সুতরাং সে প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন মূলতঃ কাদের জন্য? রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে—'আত্মশক্তি' গ্রন্থেও সেই কথাটা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তিলকের কারাবরণ উপলক্ষ করে সারা দেশে যে আন্দোলন সৃষ্টি হল, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারলেন না। 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে তিনি সরকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিবাদ করলেন, প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিলেন, অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেবলই তাঁর মনে হতে লাগল, "কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না।" ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে তিনি যেন মনে মনে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। শঙ্কার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, সরকারী চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ার বশে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রকাশ্য পথ ছেড়ে সুড়ঙ্গপথে ভীষণের অভিসারে যাত্রা করতে উন্মুখ। হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতকের যাবতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, মনেপ্রাণে স্বদেশসেবার ব্রত নিয়ে তিনি এই ধরনের

নির্জলা রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কবি সারা জীবন ধরে যে-কথা প্রচার করেছেন, তা হল জীবনের সর্বাঙ্গীণতা, সম্পুর্ণতা—মানবতার অখণ্ড অবিভাজ্য গোটা রূপ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজ, জীবন, সাধনা ও ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে শুধু উত্তেজনাময় উত্তাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল দেখে তিনি মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। এর পরে বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গবিভাগ নিয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হল, কবি তাকে একটা সামগ্রিক দেশচেতনার বিশাল রক্তশতদলে স্থাপন করতে অভিলাষী হলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বাঙালীর উজ্জীবন নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করলেন; অবশ্য এর পরেও এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি কতটুকু যোগাযোগ রাখতে পারলেন, তার ইতিহাস এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এইটুকু লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ-পরম্পরার সঙ্গে নিবিড় যোগ রেখেছিলেন; কোথাও তার পক্ষ নিয়ে, কোথাও তার বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে উনিশ শতকের জাগ্রত চেতনাকে নিজ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী-মানসের আর একটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাণ-সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনের বাতায়নে বসে নিরীক্ষণ করা এই সময়ের বাঙালীর সাহিত্য ও চিন্তার একটা সাধারণ লক্ষণ। ইতিপূর্বে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বেদ, উপনিষদ ও বেদান্তের আদর্শ সম্বন্ধে নিজেরাও অবহিত হয়েছিলেন, দেশবাসীকেও অবহিত করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধের ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আবার প্রাধান্য অর্জনে প্রস্তুত হল। বস্তুতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ যে নব্য হিন্দু-

ধর্মের পুনরুত্থান বলে পরিচিত হয়েছে, সেটি কিছু অযৌক্তিক নয়। হিন্দুধর্মের এই পুনর্জাগরণকে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদ্‌গামিতা বলে ঊনার্থক মন্তব্য করেছেন। আমরা সে-সব মতবিরোধের জল্পনা ছেড়ে দিয়ে সহজদৃষ্টিতে দেখতে পাব যে, এই হিন্দুধর্মের স্বাতন্ত্র্যলাভের যুগে একটি ভক্তি-আশ্রয়ী, আর একটি জ্ঞান-আশ্রয়ী মতবাদ শিক্ষিত মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন এবং শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ণব ভক্তিবাদকেই একটু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দর্শন করলেন। আধুনিক বলতে পুরাতনী নিঃশ্রেয়স ভক্তির সঙ্গে আধুনিক মানবতন্ত্রবাদের সাযুজ্যসাধন নির্দেশ করা যাচ্ছে। কেশবচন্দ্রের মধ্যেও এই ভক্তিবাদ একদা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতো তিনিও সদলবলে নগ্নপদে খোল করতালসহ নগরসংকীর্তনে যেতেন, তাঁর ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।"

অবশ্য তিনি কৃষ্ণের মানবতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অনুচর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাঁরই প্রভাবে 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মে' (১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ) কৃষ্ণের ভাগবতধর্মকে আধুনিক ঐতিহাসিক ও মানববাদী আদর্শের রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যেরা হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার অনুকূলে ব্যাখ্যায় অগ্রসর হলেন। অবশ্য 'বঙ্গবাসী,' 'সাহিত্য', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে হিন্দুর একটা উগ্র ধরনের পৌরাণিক আদর্শ ও স্মার্ত আচার-আচরণ-প্রণালী শিক্ষিত সমাজে জনপ্রিয় হবার প্রয়াসী হল। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব। ভক্তি, যুক্তি ও মানবপ্রেমকে একসূত্রে বিধৃত করার চেষ্টা যুবসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সার্থক হল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, উনিশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর আত্মজাগরণের

গৌরবকে নিজ চিন্তা ও কর্মে গ্রহণ করেছিলেন। তেমনি এই যুগের সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনের অনেকটাই তাঁর প্রীতিকর না হলেও এদিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। কবি বাল্যকাল থেকেই আদি ব্রাহ্মসমাজের শান্ত স্থিতধী ঔপনিষদিক ভক্তিরসে লালিত হয়েছিলেন ; এটাই ছিল তাঁদের কৌলিক আদর্শ। তাঁর এই উক্তিটি তাঁদের পারিবারিক আদর্শকে এক নিরিখেই ফুটিয়ে তুলেছে—

> "উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি।"

এই নিরুদ্বেগ ধর্মবোধের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ দুহাত পেতে নিলেও সমকালীন বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের উত্তাপকে তিনি যে একেবারে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তা মনে হয় না। উনিশ শতকের মানববাদ ও যৌক্তিকতা তাঁর কাছে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ যখন অন্তর্বিরোধের ফলে দ্বিধা হয়ে যাচ্ছিল এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ বালকমাত্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও নব্য ব্রাহ্মদের মতান্তরের সময়ে (১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথ নবীন যুবক। তিনি উত্তরকালে নব্য ব্রাহ্মদের হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব বোধহয় সমর্থন করতে পারেন নি—যেমন পারেন নি, 'সাধারণী', নবজীবন', 'প্রচার'-এ বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির পৌরাণিক হিন্দু মতের অকুণ্ঠ অনুসরণ। তাঁর অভিমতটি উদার ও যুক্তিপূর্ণ—"হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।" (ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯২)। চন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর গুরুর অযৌক্তিক 'আর্যামি'র হাস্যকর অভিমান

রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হল। উনপঞ্চাশী পবনের উন্মত্ততার সময় স্থিতপ্রজ্ঞ হবার সাধনা করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে ব্রাহ্ম-হিন্দুর কলহ এবং 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী'র তর্কযুদ্ধের মলিনতার মাঝখানে কিছুকাল আটক হয়ে পড়েছিলেন। হিন্দুর পৌরাণিক সনাতন ধর্মের জয়গান করতে গিয়ে সমকালীন সাহিত্যরথীদের অনেকের কণ্ঠস্বর ক্রমেই তালেবেতালে চৌদুনে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী আধুনিক মনোভাব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জঙ্গী প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হল। শশধর তর্কচূড়ামণি-পরিবেশিত বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম নামক 'দিল্লীকা লাড্ডু' অনেকেই মহানন্দে চর্বণ করতে লাগলেন। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১২৯০ সনের দিকে সহসা অবতারত্ব লাভ করে সমস্যা আরও জটিল করে তুললেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভূ-ভার হরণের জন্য কল্কি-অবতার হয়ে তিনি গৌড়ধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সমস্ত আর্যামির জ্যাঠামি রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসহ মনে হল। তিনি বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে এই বিষয় উল্লেখ করে একটি ব্যঙ্গপত্র লিখলেন—

"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।"

এই সময় পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম হঠাৎ শক্তি অর্জনের চেষ্টা করছে এবং যা কিছু প্রাচীন এবং পুঁথিগত, তাকেই শিরোধার্য করে উদ্ধত আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। চন্দ্রনাথ বসুই ছিলেন এই দলের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি তথাকথিত সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিটি অক্ষরকে আধুনিক কালে প্রয়োগ করতে বদ্ধ-পরিকর হলেন। সেই উত্তেজনার দিনে রবীন্দ্রনাথ কবিতার দ্বিরদহর্ম্যে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না, 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রনাথ বসু এবং চন্দ্রনাথ বসুকেই বোধ হয় ব্যঙ্গ করে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় 'দামু ও চামু' কবিতা লিখে অনর্থক বাদানুবাদের সম্মুখীন হলেন। কবিতাটির

ব্যঙ্গের সুর তীব্র হয়েছে এবং সর্বত্র সুরুচির মান রক্ষিত হয় নি। অবশ্য 'হিং টিং ছট', কিছু ব্যঙ্গ-নাটিকা, 'মানসী'র কিছু কবিতায় পরোক্ষে, এবং 'ভারতী'তে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর আদর্শের পক্ষ থেকে এই সমস্ত হিন্দুয়ানির বুদ্ধিহীন উগ্রতাকে তিনি আক্রমণ করলেন। সে-যুগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সবচেয়ে মান্য করতেন; সেই বঙ্কিমচন্দ্রই যখন এই পাগলামির বিরুদ্ধে যথোচিত কঠোর হতে পারলেন না, তখন তরুণ কবির মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হল। ক্ষোভ অনেক সময়ে সত্যদৃষ্টি কেড়ে নেয়। এই মতামতের ধূলিঝড়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অস্বচ্ছদৃষ্টি হয়ে পড়েছিলেন। বাল্যবিবাহ, লয়তত্ত্ব, নিরামিষ-আমিষ আহার ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তিনিও সমান তালে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। চন্দ্রনাথের মানসিক একগুঁয়েমি ও যুক্তিহীনতার ঋজুতাকে নমনীয় করতে গিয়ে তিনি অনর্থক কালিকলম ও সময়ের অপব্যয় করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁকে বিপরীত পথের প্রতি কিছু অনুকূল হতে দেখে সাভিমানে বললেন, "বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে" ('সাধনা', পৌষ, ১২৯৮)।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন কোঁতের ধ্রুববাদের বিশেষ ভক্ত এবং কোঁৎ ও গীতার সমীকরণের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। এই নিয়ে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিমের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎকে হিন্দু বানাবার প্রচেষ্টা 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতিকর হয় নি। এই পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎ-সংক্রান্ত মতের প্রখর সমালোচনা করলেন। ফলে হিন্দুসম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজের বাণীবাহক 'সঞ্জীবনী'তে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে কলহ ঘনিয়ে এল। ১২৯১ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হলেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে বাদ-

প্রতিবাদ করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সাক্ষাৎভাবে প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' বঙ্কিমের নব্য হিন্দুধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবেই সেই মতামতের প্রতিবাদ আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার'-এর প্রথম সংখ্যায় 'হিন্দুধর্ম' নামক প্রবন্ধে প্রকৃত হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, যে-হিন্দু শুধু পূজাপাঠ বারব্রত উপবাস প্রভৃতি স্মার্তকৃত্য করে, কিন্তু মানুষের মহৎ ধর্ম ত্যাগ করে নীচতার আশ্রয় নেয়, সে হিন্দুই নয়। কিন্তু আর একজন হিন্দুর প্রসঙ্গে তিনি বললেন,

> "আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। ...যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়াকর্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"—('প্রচার')

বলা বাহুল্য এই মত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও ঔদার্যব্যঞ্জক। এতে যথার্থতঃ আপত্তি হবার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপুরুষ; এখানে সেই যুগধর্মেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। পুঁথির চেয়ে প্রাণ বড়, স্মার্তকৃত্যের চেয়ে মানবকৃত্য শ্রেষ্ঠ—এই কথাটাকে বঙ্কিম নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসার্হ। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের মধ্যেও ত্রুটি আবিষ্কার করলেন। তিনি এর প্রতিবাদে 'একটি পুরাতন কথা' নামক প্রবন্ধে বলতে চাইলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই অযৌক্তিক উক্তির দ্বারা সত্যকারের ধর্ম ও নীতির মূলে ছিদ্র খনন করতে ব্রতী হয়েছেন। অসত্য,

অন্যায়, অসদাচরণ, পাপ—কোন অবস্থাতেই সহনীয় নয়, সদিচ্ছা থাকলেও নয়। তাঁর বাঁকা মন্তব্য লক্ষণীয়—"কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না" ('ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১২৯১)। তাঁর এই অবিনয়ী উক্তির ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুকাল মনকষাকষি চলেছিল। অবশ্য এই তর্ক-বিতর্কে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র যে স্নিগ্ধ ক্ষমাসুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, যুবক রবীন্দ্রনাথের তীব্র উক্তিতে সেরূপ ঔদার্য প্রকাশিত হয় নি। ধর্মকলহের উত্তাপ একদা রবীন্দ্রনাথকে অসতর্ক ও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। সেই অসহিষ্ণুতা তাঁর আক্রমণোদ্যত ভাষায় প্রকট হয়ে পড়ল—"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।…একথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা-সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" ('ভারতী') কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তপ্ত মন্তব্যে একটু ব্যথা পেলেও বিরূপ হন নি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন, রবীন্দ্রনাথের ওপর বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা তিনি জানতেন। তাই তিনি রবীন্দ্র-নাথের উদ্ধত আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে বললেন, "রবীন্দ্রবাবু প্রতিভা-শালী সুশিক্ষিত সুলেখক, মহৎ-স্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে কয়পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।" ('প্রচার'—১২৯৯)। এই বড় ছায়াটি আদি ব্রাহ্ম-

সমাজ। উনিশ শতকের ধর্মকলহ রবীন্দ্রনাথের শান্তস্নিগ্ধ চিত্তকে কতটা উদ্বেলিত করেছিল, এই প্রসঙ্গে তার সাক্ষাৎ মিলবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল, বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের আগেই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বীজও জলসিঞ্চিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনার মাদকরসে যে কী পরিমাণে মেতে উঠেছিলেন, এই সময়কার গদ্যপ্রবন্ধে তার পরিচয় মিলবে। উনিশ শতকের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মান্দোলনের উচ্চকিত কোলাহলে তাঁর মত আত্মতন্ত্রী গীতিকবিও হাটের পথে নেমেছিলেন; দৈনন্দিন জীবনের ধূলিবালি স্পর্শ করে যুবক রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীর নবজাগরণের সমস্ত তরঙ্গাভিঘাতকে নিজের চিত্ততটে সহ্য করেছিলেন, স্বীকার করেছিলেন। কবিতায় তিনি বলেছেন,—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর।"

সত্যই তিনি উনিশ শতকের সংসারের তীরে উপনীত হয়েছেন, অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়াকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করে মানব-যাত্রায় সাগ্রহে যোগ দিয়েছেন। তদানীন্তন ইতিহাসের মধ্যেই তাঁর শতাব্দী-চেতনার যথার্থ স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হবে।

———

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন ও মননের পরিচয় নিলে তাঁকে বাংলাদেশের একটি বিচিত্র বিস্ময় বলেই গণ্য করতে হবে। কারণ যদিও বাংলা নব্যন্যায়ের দেশ বলে সর্বত্র পরিচিত, তবু আবেগবেপথু উচ্ছ্বাস, করুণরসের সুলভ আতিশয্য ইত্যাদি কোমল প্রবৃত্তিগুলি এ জাতির মনের ওপর যতটা কার্যকর হয়, বিশুদ্ধ বুদ্ধি তাকে ততটা বিমোহিত করে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আন্বীক্ষিকী তত্ত্বকথা এককথায় যা মূলতঃ বুদ্ধি-আশ্রয়ী, যুক্তিনির্ভর ও বস্তু-যাথার্থ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দর সেই ক্ষুরধার মননের উচ্চাবচ পথ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু মননের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি আর্যবিদ্যার পথকেও পরিত্যাগ করেন নি। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার এমন সমানুপাতিক মিলন এ-যুগের বাংলাদেশ কেন, ভারতবর্ষেও দুর্লভ। ভারত-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের দিনে চিত্তবৈকল্যের জন্যই আমরা মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের যথার্থ সম্পর্ক বিস্মৃত হয়েছিলাম। তাই, হয় জান্তব জড়বোধের পঙ্কস্তরে আত্মহারা হয়েছিলাম, অথবা সূক্ষ্মতম অনুভূতি-লোকের চিদানন্দময় তনুতে বাস্তবসত্তার অপহ্নব ঘটিয়ে মোক্ষতীর্থের অনিকেত পথপরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম। ফলে মূর্চ্ছাকে মোক্ষ বলেছি, তমোনিদ্রাকে সমাধি নাম দিয়েছি, অর্থকে অনর্থ মনে করেছি—দেশটাকে কাষায়বস্ত্রধারী নগ্ন ক্ষপণকে পরিণত করে এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি যে, জাতিগত নির্বাণ প্রাপ্তির আর বিলম্ব নেই। বেশ কয়েক

শতাব্দী ধরে বুদ্ধির জড়তা সমস্ত জাতিকেই অজ্ঞতার তমোগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম সমুদ্রতীরের লোনাজলের ঝাপটায় যেদিন আমাদের সুখনিদ্রা ভাঙল, সেদিন আবার আমরা সেই মনন-প্রকৃতিকে খুঁজে পেলাম। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে সেই যুগলক্ষণটি পরিস্ফুট হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরকে জানার অর্থ —উনিশ শতকের যে চিত্তসঙ্কট বাঙালীর প্রাণের গভীরে সংশয়ের কালো ছায়া ফেলেছিল, তারই যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। বৃত্তিতে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছাত্রসমাজে বাংলা ভাষার মারফতে বিজ্ঞানকে, বিশেষতঃ পদার্থবিজ্ঞানকে তিনি যেভাবে জনপ্রিয় করেছিলেন, তা তাঁর ছাত্র ও শিষ্যসম্প্রদায়ের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই জানা যায়। তাঁর লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের শেষভাগে য়ুরোপে প্রত্যভিজ্ঞামূলক যে বিজ্ঞানশাস্ত্র উপযোগবাদী কারুবিদ্যার নগদবিদায়ের প্রলোভন ছেড়ে শুদ্ধ বিজ্ঞানের মনোময় কোষে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, আচার্য তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং প্রথম দিকে অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানের দ্বারা বুঝেছিলেন—বস্তুচেতনালব্ধ প্রত্যয়সমষ্টি বিশ্বচেতনার একমাত্র নিয়ামক শক্তি।

ডারুইন, লামার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতদের দ্বারা বিশ্বকারুকৃৎ ভগবান নামক সর্বগ শক্তির 'বিশেষ সৃষ্টি'র গৌরব তিরোহিত হল। পূর্বেই নিউটন এসে গতিবিজ্ঞান ও স্থিতিবিজ্ঞানের সাহায্যে যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমকে অমোঘ সূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন। ফলে চৈতন্যধারা ও বস্তুধারা বাস্তব বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানময় সত্তার অধীন হল। পরে কার্ল মার্কস ব্রিটিশ মুাজিয়মে বসে মানবেতিহাসের বিবর্তনধারাকে কার্যকারণাত্মক সম্বস্তু, অর্থনৈতিক মূল্যাব-ধারণা ও বিশ্লেষ-সংশ্লেষ-স্থিতিস্থাপকতার মধ্য দিয়ে আর এক চিত্তসংকটের দ্বারে দাঁড় করিয়ে দিলেন,—এবং ঐ কালেই ফ্রয়েড ও তৎশিষ্যবর্গ মগ্নচৈতন্যের পঙ্কস্তরে প্রসুপ্ত 'মেডুসা'-নাগিনীদের বন্ধন মোচন করে চেতনার জগতে মহা হুলস্থূল বাধিয়ে দিলেন। এর সঙ্গে যোগ দিল

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ও বার্গসঁয়ের গতিরাগ—বিবর্তনমূলক গতিবাদ। এঁরা মনে করিয়ে দিলেন, 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড' হলেও বস্তুতঃ বস্তুর স্বারূপ্যই নেই। সমস্ত কিছুই অহম্ বা ইদম্ নামক এক কল্পিত ব্যক্তির কল্পনাসৃষ্টি, বস্তুপ্রত্যয়হীন বিশুদ্ধ ভোজবাজি!

উনিশ শতকের শেষভাগে আমাদের বহুশতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার এবং বদ্ধমূল প্রত্যয় সংশয় নামক বিরাট খাদের সামনে এসে শিউরে উঠল। কারণ অদূরেই 'নাস্তি' দৈত্য প্রকাণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অপেক্ষা করে আছে, আমাদের পঞ্চ-তন্মাত্রের ক্ষীণ সত্তাটুকুকে কখন গ্রাস করবে। যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ডকে হস্তামলকবৎ জেনেছিলাম, হঠাৎ দেখা গেল, সে জ্ঞান আমারই অহিফেন নেশার ঝোঁকে সৃষ্ট গোলাপী আমেজ মাত্র নেশা ছুটলেই যার পরিসমাপ্তি। তাই দেখা গেল, বস্তুকণিকার জড়ত্বের অন্তরালে আর একটি অজ্ঞাতকুলশীল বিদেহী জীব উঁকি দিচ্ছেন। তিনি পঞ্চভূত হতে পারেন, অসংখ্য এলিমেণ্ট হতে পারেন, 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' ইথরমণ্ডল হতে পারেন, নির্বায়ুমণ্ডলীভূত অশব্দ অস্পর্শত্বের শূন্য হাহাকারও হতে পারেন। তিনি হতে পারেন বৈদান্তিকের ব্রহ্ম, বার্হস্পত্য ব্রতধারা হেডোনিস্ট্‌দের দেহাত্মবাদী ভোগকাম, অথবা আহুরমেজ্‌দা, পুদ্‌গল, বা অনাত্মবাদী 'জেন্'। মোট কথা গত শতাব্দার শেষের দিকে পদার্থ ও 'অপদার্থে'র মধ্যে যে জটিল জাল তালগোল পাকিয়ে উঠছিল, প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সংশয়বাদ গ্রাস করছিল সেই মায়াপুরীতেই রামেন্দ্রসুন্দরের আবির্ভাব হল। তিনি মানসসরোবরের রাজহংসের মতো পদার্থবিজ্ঞানের স্থূল বস্তুপুঞ্জ থেকে অতি সহজেই বাক্‌পথাতীত চিৎসত্তাকে নিষ্কাশিত করে নিয়েছেন।

ইন্দ্রিয়াত্মক বস্তুজগৎ ও মনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে নিত্যই যে বোধের উৎপত্তি হচ্ছে, তা যে ক্ষণভঙ্গবাদী প্রত্যয়ের সমষ্টি মাত্র, তা তাঁর চেয়ে কে জ্ঞানে বেশী করে বুঝেছেন? আত্মার সেই সঙ্কট—একদিকে আকণ্ঠ জ্ঞানের পিপাসা, আর একদিকে চেতনার নির্মোক মোচন, যাকে

শাস্ত্র বলেছেন আবরণভঙ্গ। রামেন্দ্রসুন্দর এই দুই বিরোধী চিত্তদ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইহ ও পরব্রহ্মকে পিপ্পলীবৃক্ষশাখায় ঘনিষ্ঠভাবে উপবিষ্ট দুই সুপর্ণের সঙ্গে সমতুলিত করেছেন, পদার্থতত্ত্বের সঙ্গে মোক্ষশাস্ত্রের রাখীবন্ধন ঘটিয়েছেন। চিত্তের যে ক্ষুধা জ্ঞানার্জনে মেটে না, সেই ক্ষুধা শান্তির জন্য তিনি যে অমৃতফল আস্বাদন করেছিলেন, তা দেশকাল-নিরপেক্ষ এমন একটি অদ্বয়সত্তা, যা তদ্ভাব ও সদ্ভাব, সৎ ও অসৎ—সর্বপ্রকার বিকল্পের বিনাশ করে।

রামেন্দ্রসুন্দর ঔপনিষদিক আর্যসাধনার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন স্বাধ্যায়ের দ্বারা—সে স্বাধ্যায় হচ্ছে তাঁর কর্ম, এই কর্মই তাঁর জীবন-যজ্ঞ। সেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে জাতবেদা অগ্নি আবির্ভূত হয়ে আচার্যদেবকে কৃশরান্ন ও বলিচরুভাগ দিয়েছেন—তাতেই তাঁর ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি হয়েছে। উনিশ শতকা মননধর্মী মানুষের আত্মার সঙ্কট ও তার যথার্থ প্রতীক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সেই সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্তী ভর্গদেবতার উপাসনা করেছিলেন—একথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শেষজীবনে যে অদ্বৈততত্ত্বের মোক্ষমুক্তি ও দ্বৈতরসের লীলাবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এতে কেউ কেউ মনে করতে পারেন, ভারতবাসীর মনের সাধারণ প্রবণতাই এক্ষেত্রে তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও নিরঞ্জন মনন নিয়ে তিনি যতই আলোচনা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে অধ্যাত্মবাদের গেরুয়া মেঘ গ্রাস করেছে। কৈ, রাসেলকে তো অতর্ক্য অতীন্দ্রিয়-বাদ কখনও স্পর্শ করে নি! আসলে ভারতীয় মন জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান-সাধনা চায় না; ভারতদর্শনের মূল কথা নিছক জ্ঞানলাভ নয়। পাশ্চাত্ত্য জানে—জ্ঞানে শক্তি; আমরা জানি—জ্ঞানই মুক্তি। আসলে জ্ঞান আমাদের চেতনার কয়েকটি সোপান মাত্র। সোপানকেই মন্দির বলতে ভারতীয় মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আমরা যেখানে উপনীত হই, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়চেতনালব্ধ প্রত্যয়ের যোগ নিতান্তই ক্ষীণ।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা আমাদের দর্শনকে 'প্র্যাগম্যাটিক' বলে যতই উপহাস করুন না কেন, সমন্বয় ও সঙ্গতি যদি চেতনার মূল ধর্ম হয়, তা হলে রামেন্দ্রসুন্দরের মনোধর্মের শেষ পরিণতি ভারতীয় সাধনারই পরিণাম বলে গ্রহণ করতে হবে।

২

এসব তত্ত্বকথার যথোচিত গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েও বলা যায়, বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে রমেন্দ্রসুন্দরের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুরূহ বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং সূক্ষ্মতম দার্শনিক তত্ত্ববিশ্লেষণে তিনি বাংলা গদ্যের সাধুরূপটিকে একটি বিচিত্র রীতিতে ব্যবহার করেছেন। অনেক সময় তত্ত্বের কাঠিন্য ভাষাপ্রকাশকে পদে পদে বিড়ম্বিত করে। অথচ আচার্য চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্ববাদকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে যে সাধু ছাঁদটি ব্যবহার করেছেন, বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তুর উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে তার অভিনবত্ব এখনও অননুকরণীয় হয়ে আছে। বিজ্ঞান-দর্শনের জটিলতাকে সরল করতে গিয়ে তিনি 'পপুলার সায়েন্স' লেখার প্রয়োজন, বোধ করেন নি, বা দুরূহকে সহজ করবার জন্য সুপেয় পানকরস পরিবেশনেরও প্রয়োজন বোধ করেন নি। কঠিনের সাধনাকে বাললোভন মোদকখণ্ডে রূপায়িত করলে তাতে বালকদের কোন লাভ নেই, কিন্তু মননধর্মী পরিণত বুদ্ধির সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাই তিনি চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকথাকে জ্ঞানগোচর করার জন্য ক্লাসিক গদ্যকে অত্যন্ত পরিমিত ও সংযত আকার দিয়েছেন, আর তার সঙ্গে ভাষার মধ্যে একটা সরস কৌতুক ও মজলিসী পরিহাসের অকৃপণ প্রসন্নতা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে পেরেছেন। ফলে নীরস বস্তুবিজ্ঞান ও ধূম্রময় দর্শনচিন্তা পরিচিত বন্ধুর মতো প্রত্যুদ্গমন করে পাঠককে উদার হাস্যে অভ্যর্থনা করেছে। বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যান অনেক সময়ে স্পর্শকাতর চিত্তের কাছে বড় বেশি রকমের দীর্ঘসূত্রী মনে হয়, যেন ভাষা মন্থর ঐরাবতের মতো বিলম্বিত-

লয়ে চলে। আবার কখনও কখনও অশোভন দ্রুতগতি চিন্তাকে এতটা দৌড় করিয়ে নেয় যে, রয়ে বসে চিন্তার স্বরূপকে বুঝে নেবার অবকাশ থাকে না। পদার্থবিদ্যা এবং 'অপদার্থ' পরাবিদ্যার ভাষ্যসৃষ্টিমানসে বাংলা গদ্যের গঠনপ্রকৃতিকে তিনি এমন একটি সংযত, মার্জিত এবং তীক্ষ্ণ রূপ দিয়েছিলেন যে, বিশ্বের যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ভাষার মতো বাংলা গদ্যও অচিরে সাবালকত্ব অর্জন করেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত সারাজীবন ধরে এই ভাষার সন্ধান করেছিলেন এবং শেষ জীবনে 'ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র মধ্যে তার কতকটা আকার ধরতেও পেরে-ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞানরহস্যে' রসের কলমে তত্ত্বকথা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে জগদানন্দ রায় পরিচ্ছন্ন গদ্যে বিজ্ঞানতত্ত্ব লিখেছিলেন, কিন্তু সে ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি অল্প। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের তত্ত্বকথাকে সরস কবিত্বের পরিধেয় দান করেছিলেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ভাষাকে রোমান্টিক এবং লীরিক্যাল করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর আলোচনার ভাষা বন্ধুজনের মতো সহাস্য অভ্যর্থনায় অগ্রণী হয়। তত্ত্ব ও তথ্যকে অনর্থক জলবৎতরল না করে তার মধ্যে সহজ প্রবহমানতার নির্বাধগতি সৃষ্টি করা তাঁর ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণের একটা মৌলিক বিশিষ্টতা। ঝরণাধারা চলতে চলতে উপলখণ্ডে বাধা পেয়ে জলতরঙ্গের ধ্বনি সৃষ্টি করতে করতে অগ্রসর হয়, তাতে পথযাত্রার কষ্টটা সহজ না হলেও সরস হয়ে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষাপ্রবাহ তত্ত্বের উপলখণ্ডে যত বাধা পেয়েছে ততই সূর্যালোকিত হিরণ্যখণ্ডের মতো ঝকমক করে উঠেছে, কৌতুকরসের দ্যুতি বিচ্ছুরিত করেছে। যা ছিল পাণ্ডিত্যের জগদ্দলশিলা, তাই হয়ে উঠেছে শিশুর কলহাস্য। আচার্যদেব ছিলেন সদাহাস্যময় প্রসন্ন পুরুষ। সেই অপার্থিব প্রসাদের পরিচ্ছন্ন প্রসন্নতা তাঁর বাণীভঙ্গিমার একটি দুর্লভ সম্পদ বলেই গণ্য হবে। বস্তুতঃ তাঁর বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও চিন্তাবস্তু বিশুদ্ধ নির্বস্তুকতা ছেড়ে প্রতীকীকরণের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরূপ লাভ করেছে তাঁর বিচিত্র ভাষারীতির গুণে। রবীন্দ্রনাথও পঞ্চভূতের ভূতদেহকে

মানবত্বের রূপকে তাদের ব্যক্তিত্ব দান করেছেন; আচার্য ত্রিবেদী কিন্তু ভূতকে মানবত্ব দান করেন নি, তারা ইলেকট্রন-পজিট্রন, উদ্‌যান, অঙ্গারাম্লজান, এলিমেণ্ট, মাইণ্ড্‌ স্টাফ্‌—যাই হোক না কেন, সর্বোপরি তারা এক একটি চরিত্র। তাদের সঙ্গে লেখক কখনও হাস্যপরিহাস করেছেন, কখনও তাদের রহস্যময় স্তব্ধতা তাঁকে কবির মতোই বিস্ময়-বিমুগ্ধতা দিয়েছে আর সেই কৌতুকরস ও বিস্ময়বোধ তাঁর অনুচিন্তনের ভাষাকে এমন একটা প্রীতিনিষিক্ত গুণমণ্ডিত করেছে যে, তাঁর ঐ ভাষাই তাঁকে আমাদের নিকটতম সান্নিধ্যে টেনে আনে।

আজকাল তো তত্ত্বকথা ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে পণ্ডিত গবেষকেরা বাংলাভাষায় আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনার নিঃস্পৃহ ভাষা বক্তব্য বিষয়ের উপযুক্ত বাহনে পরিণত হলেও সে ভাষায় এখনও লাবণ্য সঞ্চারিত হয় নি, তার একটি চরিত্র তৈরি হতে এখনও বিলম্ব আছে। বাংলা গদ্যকে সেই রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জ্ঞানের ভাষা ও মনের ভাষার ব্যবধান কোনও দিনই ঘুচবে না। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর অধিকাংশ বাংলা রচনায় সেই চেষ্টাই করেছেন। অবশ্য চেষ্টা বলা ভুল তাঁর লেখা অচেষ্টাসম্ভূত, অনাড়ম্বর এবং তাঁর প্রসন্ন হাসির মতোই সরস ও সরল। তাঁর বিজ্ঞান ও দার্শনিক রচনার ভাষা সম্বন্ধে এতো কথা বলার কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষায় তাঁরা দর্শনবিষয়ে নানা কথা আলোচনা করেছেন। অবশ্য দার্শনিকের মতো নিঃস্পৃহভাবে নয়, তাঁদের আলোচনায় জ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যাসংক্রান্ত জটিল ও দুরধিগম্য ব্যাপার প্রাধান্য পেলেও তার ভঙ্গিমার মধ্যে পরিচিত বোধ ও চেনা জগতের এমন একটা আটপৌরে ভাব আছে যে, দার্শনিক আলোচনাও মনোহারী হয়ে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দর মননধর্মী রচনাতেও প্রসন্ন কৌতুকরস মিশিয়ে দিয়েছেন, অথচ লেখাটি প্রসাদগুণে ভরে উঠেছে। এই ভাষা পরিচিত স্বরে কথা কয়ে ওঠে। তখন তাঁকে আর পাণ্ডিত্যঘেরা দূরের ব্যক্তি বলে মনে হয় না, সঙ্গী হয়ে তিনি পাশে এসে দাঁড়ান। দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় দর্শন-

চিন্তা একটি নিজস্ব বিশিষ্ট স্টাইলে প্রকাশ করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর সেই ভঙ্গীটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। অথচ এখনও এদেশে বাংলা ভাষায় দর্শন ও তত্ত্বচিন্তার রীতি গড়ে উঠল না।

বিজ্ঞানের ভাষা প্রসঙ্গেও ক্ষোভের সঙ্গে একই কথা বলতে হয়। একালে বিজ্ঞানী এবং অ-বিজ্ঞানী, সকলেই বলতে আরম্ভ করেছেন, মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করো। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের কিছু কিছু আলোচনা চোখেও পড়ছে। কিন্তু এখনও তো মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাংলা ভাষায় করা সম্ভব হচ্ছে না। একি শুধু পরিভাষার অভাব, না মানসিক জড়তা অথবা বাংলা ভাষার প্রকাশশক্তি সম্পর্কে সংশয়? রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু অবলীলাক্রমে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তা বাংলা ভাষাতেই নিবদ্ধ করেছিলেন, তত্ত্বালোচনার সহজ পথ নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু সে পথে নতুন পথিক আসে কই? একালের বাঙালী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যখন পরিভাষা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন, তখন রামেন্দ্রসুন্দর দুরূহ ব্যাপার কত সহজভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এই খর্ব মানসিকতার যুগে বারবার রামেন্দ্রসুন্দরের কথা মনে পড়ছে।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মচেতনা

রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র

১

অধুনা কারও কারও মনে 'ধর্ম' শব্দোচ্চারণে ভীতি ও অনীহার সঞ্চার হয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান কালের বিজ্ঞানমুখী ও যন্ত্রমুখর ইহবাদী সভ্যতার বাহ্বাস্ফোট সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষ চেতনাবহির্ভূত ঐশীশক্তির সর্বতোভদ্র সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে এখনও অনেকে আস্থাশীল। কিছুকাল পূর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে ভগবান-সম্পর্কীয় "মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি" সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে, এমন কথা জড়বাদী ও কার্যকারণাত্মক বিশ্ববিবর্তনে-বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা মনে করতেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও পরমাণুতত্ত্বের বিস্ময়কর উন্নতি সত্ত্বেও শিক্ষাভিমানী প্রগতিশীল মানুষের মন থেকে ঐশী-চেতনার কিছুমাত্র বিলুপ্তি ঘটে নি। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকগণ মাপজোখের সাহায্যে এবং অনুসন্ধিৎসার বকযন্ত্রে রহস্যতত্ত্বকে পরিশ্রুত করে মনে করেছিলেন—অতঃপর মানুষের কাছে কোনও কিছুই আর দুর্জ্ঞেয়, রহস্যমণ্ডিত এবং ঐশী ব্যাপার বলে শ্রদ্ধাভক্তির বিল্বদলে পূজা পাবে না। কিন্তু বিশ শতকের যুগান্তকারী আবিষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও পরম-রহস্যের চাবিকাঠি এখনও নিরুদ্দেশ অবস্থায় রয়ে গেছে। মেটারলিঙ্কের সেই হতাশাব্যঞ্জক উক্তিটি: "The uncertainty remains"—অনিশ্চয়তার অন্ধকার দূর হল কই? বরং নব নব আবিষ্কারের ফলে রহস্যান্ধকার অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। তা সে যাই হোক,

ঐশী সত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের মানস-প্রবণতা মানুষের সংস্কৃতিকে যে নানা দিক থেকে বৈচিত্র্য দিয়েছে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে যে এর একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব রয়ে গেছে, তা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ষোল-আনা আয়োজন হয়েছিল বিশেষ বিশেষ ধর্মবোধ ও ঈশ্বরচেতনাকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ বড় বিচিত্র ভূমি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবেগোন্মত্ত রসসাধনা যেমন এদেশকে প্লাবিত করেছিল, তেমনই একই কালে নব্য-ন্যায়ের ক্ষুরধার প্রকর্ষ বাঙালা-মেধার এক অবিনশ্বর পরিচয় রেখে গেছে। সম্পূর্ণ আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত অনেক নৈয়ায়িক-বাঙালা ব্রজেন্দ্রনন্দনের দোহাই পেড়ে গ্রন্থারম্ভ করতেন। দেবভাষায় লেখা এ সমস্ত দার্শনিক চিন্তা ও মননপ্রণালী ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সামান্য পরিচয় নিলেই দেখা যাবে, লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি অটল বিশ্বাস এই যুগের বাঙালীর সাহিত্যা-শ্রয়ী মনোধর্মকে প্রভাবিত করেছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এ প্রবচনের কানুকে যদি সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে বিধৃত করে দেখি তা হলে এর নির্গলিতার্থ যথার্থ বলেই মনে হবে। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে কিন্তু সমসাময়িক কালের ইতিহাস ও সমাজের গভীর ছাপ পড়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-কে ছেড়ে দিলে, ইতিহাসাশ্রয়ী আর কোন কাব্যই দৃষ্টিগোচর হবে না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর কোন কোন স্থানে ইতিহাসের সঙ্কেত আছে বটে, কিন্তু ইতিহাস ও রূপকথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের তাবৎ কবিকুল তাঁদের সমসাময়িক দেশ-কালের কথাকে বড়ো একটা আমল দিতেন না; তাঁদের কেউ বিভিন্ন দেবদেবীর লীলারসে মুগ্ধ হয়ে মন্দির-চামরসহযোগে পাঁচালীর রীতিতে আখ্যান আবৃত্তি করতেন, কেউ-বা কীর্তনের সুরে এবং আখরের টানে এমন ভাবো-দ্রেক করতেন যে, ভাবগ্রাহী ভক্তের দল ঘন ঘন দশাপ্রাপ্ত হতেন। ইতি-

মধ্যে দেশ ও সমাজের আমূল পরিবর্তন শুরু হল, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী রঙ্গমঞ্চে যবনিকা নামল, বর্মচর্মপরা কুশীলবের দল বেগম ও তয়ফাওয়ালীদের কর ধারণ করে অতি দ্রুত নেপথ্যবিধানের অন্তরালে অদৃশ্য হলেন। ইংরেজ বণিকের রাজত্ব শুরু হল, ক্রমে ক্রমে শাসনে, আচরণে, শিক্ষাদীক্ষায় যুগান্তরের সূচনা হল। শুরু হল উনবিংশ শতাব্দী, পূর্বভারতের শ্যাম প্রান্তরে পশ্চিম-সমুদ্রের লোনাজল তরঙ্গ-বিক্ষোভে ভেঙে পড়ল।

২

রিপ্ ভ্যান উইঙ্কল্ নিদ্রাভঙ্গের পর দেখেছিল, তার চারপাশের তামাম দুনিয়া বিলকুল বদলে গেছে। যদি কোন মন্ত্রবলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌড়জনকে উনিশ শতকের কলকাতায় এনে ফেলা যেত, তবে সে ব্যক্তি রিপ্ ভ্যানের চেয়েও বিমূঢ় হয়ে যেত। রামমোহনের বেদান্ত-উপনিষৎ-অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, বিচার-বিতর্ক, ব্রাহ্মণেতর সমাজের হাতে অশূদ্রপরিগ্রাহী শাস্ত্রগ্রন্থের আবির্ভাব, হিন্দু-কলেজে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূরিভোজ, সাময়িক পত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন, 'ইয়ং-বেঙ্গল'-দের যে-কোন ধর্মবোধ ও পারমার্থিকতার বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার—এইসমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে মনে হবে, উনবিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড়-যুবকদের চাপে এবং পাশ্চাত্ত্যের ইহমুখী ও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে বাঙালীর দীর্ঘকাল-লালিত ধর্ম-চেতনা বুঝি লুপ্ত হয়ে গেল। কোনও এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সময়ের শিক্ষিত বাংলার মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন: "পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন।" [১] কথাটা নেহাত লঘুধরনের

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্য। (নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১৩২)

নয়। রামমোহনের যুগেই (১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) হিন্দুকলেজপ্রদত্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রভাবে জড় জগতের বাইরে অন্য কোন বাক্‌পথাতীত চৈতন্যের কথা নবীনসমাজে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্বে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট রামমোহন বেদান্তসূত্রের অনুবাদ-ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ এবং উপনিষদের অনুবাদ প্রচার করে অপরিণত বাংলা গদ্যকে গভীর আলোচনার বাহন এবং বিতর্কের আয়ুধে পরিণত করলেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মান্দোলন ও বিচারবিতর্কের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষিপ্ত হয়ে বাংলা গদ্য অতি অল্পকালের মধ্যেই যৌবনের দার্ঢ্য অর্জন করল।

অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তাপ্রণালীর মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রের ঐক্যতত্ত্ব এবং ইসলামীয় মোতাজেলা-মুওয়াহিদ্দিনি সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদ রামমোহনের পারমার্থিক চিন্তার নিয়ন্ত্রণ-রজ্জু কিনা, সে-বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার। রামমোহন-আশ্রিত একেশ্বরবাদ ভৌমসম্পর্কে আকাশচারী। দৈনন্দিন জীবন ও কর্মব্যাপারে বেদান্ততত্ত্ব প্রয়োগ করলে গোটা জাতটাই কর্মভীরু, অলস ও দিবাস্বপ্নবিলাসী হয়ে উঠবে, রামমোহনের এই ধরনের আশঙ্কা ছিল। তাই বেদান্ততত্ত্বের প্রচারক হয়েও তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি: "Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta: In what manner is the soul absorbed in the Deity? What relations does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother etc., have no actual entity, they consequently deserve

no real affection, and, therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."[২]

একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রচারণার মূলে রামমোহন অনেক সময়ে পারমার্থিক কারণের চেয়ে জাগতিক ব্যাপার ও বাস্তব প্রয়োজনকে অধিকতর মূল্য দিতেন। একদা তিনি তাঁর বন্ধু ও উপরওয়ালা ডিগ্‌বিকে লিখেছিলেন: ("I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well-calculated to promote their political interest......It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."[৩])

এই উল্লেখ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাংলাভাষায় বেদান্তপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য "political advantage and social comfort"— সুতরাং তাঁকে "a theo-philanthropist" বলা বোধ হয় সর্বথা যুক্তিযুক্ত হয় না।[৪] তাঁর মানবহিতৈষণা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ পারমার্থিকতাও তাঁর জীবনধর্ম নয়। বৈষয়িক জীবন ও বেদান্তচর্চার মধ্যে তিনি কখনও কখনও পৃথক সীমারেখা টেনে দিতেন, কখনও-বা সমাজ ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মতো[৫] স্থূল ও স্থাবর প্রয়োজনকে বেদান্তপ্রচারের ব্রত বলে গ্রহণ

২. *The English Works of Raja Rammohan Roy (* Panini Ed.) Vol. I. P, 472
৩. Ibid, Pp. 929-30
৪. Calcutta Review-এ (১৮৪৫ সাল) কিশোরীচাঁদ মিত্রের উক্তি।
৫. দেবেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের মূলে কতকটা এই মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করেছিলেন: "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে"...।—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', ৩য় সংস্করণ, পৃ: ১০৬

করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। বেদান্তের মায়াবাদের প্রতি তাঁর কোন মায়ামমতা ছিল না। কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যের পোষণ ও বিকাশে তাঁর গুরুতর প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের অমসৃণ ও অনভ্যস্ত বাংলা গদ্যে বেদান্ত ব্যাখ্যা ও বিচার করে এবং নানাবিধ বিতর্কমূলক আলোচনায় গদ্যভাষাকে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে তিনি বাংলা গদ্যের জড়ত্বমোচনে বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন।

রামমোহনের সমসাময়িক পুরাতন আদর্শের পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন লৌকিক ভাষায় বেদান্তপ্রচারের ঘোর বিপক্ষতা করেন এবং তাঁকে অতি কটু ভাষায় আক্রমণ করে 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) নামে একখানি প্রতিবাদ-পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকার কটুকাটব্য বাদ দিলে দেখা যাবে, বেদান্তপ্রচারেব ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে কাশীনাথ ও তাঁর দলভুক্ত পুরাতনপন্থীদের একস্থলে ঘোরতর ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল। রামমোহন বেদ-উপনিষদ-বেদান্ত-তন্ত্রকেই একমাত্র প্রামাণ্য এবং বিশুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্র বলে মনে করতেন, কিন্তু পুরাণাদির প্রতি তাঁর ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। যে সমস্ত পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থে কৃষ্ণলীলার আদিরসাশ্রিত উদ্দাম বর্ণনা আছে, তিনি অপ্রামাণিক বলে সেগুলিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীচৈতন্যের প্রতিও তিনি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।[৬]

৬. 'পথপ্রদানে' (১৮২৩) রামমোহন গৌরাঙ্গদেব ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্বন্ধে সব্যঙ্গে বলেছিলেন: "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাঁহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।" সাহিত্যপরিষদ প্রকাশিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'—৬, পৃঃ ১৩৩

কিন্তু কাশীনাথের মূল বক্তব্য হল, প্রাকৃত জনসাধারণের জন্য পুরাণের পারমার্থিকতা অবশ্য স্বীকার করতে হবে ; অপরদিকে বেদান্ত শাস্ত্রের মতো গুহ্যবিদ্যাকে সর্বসাধারণের ভাষায় প্রকাশ করে রামমোহন যেন কুলবধূকে হাটের মাঝে বিবস্ত্রা করেছেন। সে-যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'ও (১৮১৭) রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫)-এর প্রতিবাদে রচিত হয়েছিল। তাঁরও অভিমত—পুরাণশাস্ত্র ও দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা দেখানো রামমোহনের উচিত হয় নি, এবং বেদান্তের মতো গভীর গূঢ় তত্ত্ববিদ্যাকে বাংলাভাষার মতো সর্বজনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করে রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রের অমর্যাদাই করেছেন। সে যুগে যে সমস্ত পুরাতন-পন্থী ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামমোহনের বেদান্ত-প্রচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন তাঁদের প্রতিবাদের ধারা কতকটা এইরকম : রামমোহন পুরাণ ও পৌরাণিক দেবদেবীকে নস্যাৎ করে বেদান্তকে যে একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তা কোনমতেই হিন্দুর শাস্ত্র ও ঐতিহ্যসম্মত নয়। নর, নরোত্তম, নারায়ণকে নমস্কার করে ও দেবী সরস্বতীর জয়ধ্বনি করে মহর্ষি বেদব্যাস যে-গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রত্যবায়গ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রেও কি নানা দেবদেবীর বন্দনা পূজোপাসনা নেই ? বহুদেববাদ হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থেই স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তীকালের মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণে-উপপুরাণে সেই আদর্শ আরও বিস্তারিত আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। বেদান্ত-উপনিষদে বিধৃত ব্রহ্মবিদ্যা হল রাজবিদ্যা— জনসাধারণের জন্য নয়। অধ্যাত্ম চেতনা ও পারমার্থিক সাধনায় যাঁরা তুঙ্গশীর্ষ অবলম্বন করেছেন ব্রহ্মবিদ্যায় শুধু তাঁদেরই অধিকার। 'অদীক্ষিত' ব্যক্তির হাতে যদি সুগোপ্য ব্রহ্মবিদ্যা পড়ে, তা হলে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার"—এইরকম বিড়ম্বনা হয় না কি ? অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় কখনও বেদান্তবিরোধী ছিলেন না। কারণ, তিনি স্বয়ং কলকাতার বাসায় ছাত্রদের পুঁথি থেকে শঙ্করাচার্যের

টীকাসহ উপনিষৎ পড়াতেন—একথা রামমোহন নিজেই বলে গেছেন। [৭] তবে যা সুগভীর চিন্তার ব্যাপার, সাধকের স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসনের আসনে যার প্রতিষ্ঠা, তাকে রামমোহন অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়ে হিন্দুশাস্ত্রের অগৌরব করেছেন--মৃত্যুঞ্জয় ও কাশী-নাথের এই হল সুদৃঢ় অভিমত।

পুরাণ-বিরোধিতা ও বেদান্ত-উপনিষদের আনুগত্য রামমোহনের মৃত্যুর (১৮৩৩) পর কিছুকাল হতবল হয়ে পড়লেও যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পকালের মধ্যেই রামমোহনের পথ ধরে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধর্মালোচনা-সংক্রান্ত শাখাটির পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) এবং তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) হল তাঁর মত প্রচারের প্রধান বাহন। এই সভা ও পত্রিকায় বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যোগদান করাতে দেবেন্দ্রনাথ নিজের সাধ্যসাধনের আদর্শকে সে-যুগের বুদ্ধিজীবী মহলে সুপ্রচার করতে বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তিনি ঋগ্‌বেদ অনুবাদ শুরু করলেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের theism-এর আদর্শের জন্য বেদান্ত ও উপনিষদের ওপর ভিত্তি করলেন। প্রথমত বলা যেতে পারে, তিনি বেদান্তসূত্রের তত্ত্বকথার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। জীবনের প্রথম দিকে তিনি হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে অন্তরের অধ্যাত্ম-ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি শান্তি পেলেন না। তখন তিনি য়ুরোপের প্রকৃতিবাদী জড়দর্শন আলোচনায় মগ্ন হলেন, তাতে শুধু অন্তরের প্রদাহই বেড়ে গেল।

৭. 'কবিতাকারের সহিত বিচারে' (১৮২০ খ্রীঃ অঃ) রামমোহন লিখেছিলেন : "ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এইদেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞ লোক জানিতে পারিবেন.. ।"—সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত রামমোহন গ্রন্থাবলী—২, পৃঃ ৬৮

অতঃপর তিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-চর্চায় শান্তি পেলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞাতেই বেদান্তধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে লিখলেন: "বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম"। বিশুদ্ধ রীতিতে বেদ-অধ্যয়ন করার জন্য কয়েকজন তরুণকে ১৮৪৩ সালে বৃত্তি দিয়ে তিনি কাশীধামে পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু পরে বুঝলেন, উপনিষদই বেদের সার ভাগ; বেদের কর্মকাণ্ডপোষক অংশ তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী'-র সম্পাদক এবং তাঁর শিষ্য অক্ষয়কুমার দত্তের ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। পরিশেষে তিনি অক্ষয়কুমারের মতের পোষকতা করে বেদের অভ্রান্ততা ও অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য ও আর্যধর্ম প্রণালীর বিবর্তন জানবার জন্য তিনি বেদচর্চা সমর্থন করেছিলেন, নিজেও ঋগ্‌বেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বেদান্তে তাঁর অনাস্থা ছিল না, বরং বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্মই যে তাঁর অন্বেষ্টব্য তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫০ সালে তাঁর 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতেই সর্বপ্রথম মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর বিরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত এই সময় তিনি বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যের প্রতি পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে ও পরেও দেখা যাচ্ছে, একাধিক স্থলে তিনি বেদান্তের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। ১৮৪৬ সালে তিনি বলেছিলেন: "যদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে...।" কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী থেকে দেখা যাচ্ছে, এই "বেদান্তপ্রতিপাদ্য" শব্দের অর্থ বাদরায়ণ সূত্র বা তার শাঙ্করভাষ্য নয়,--এ হল ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ। এ-বিষয়ে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে খোলাখুলিভাবে বলেছেন:

> "আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না; যেহেতু, তাহাতে

শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে, যদি উপাস্য-উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত-দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।" ৮

এখানে তাঁর ধর্মসাধনা সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা সংশয়ের অবকাশ নেই। তিনি মূলতঃ ছিলেন শান্তরসের ভক্তিবাদী। এদিক থেকে বৈষ্ণব দ্বৈতবাদী ভক্তের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বিরোধ নেই। তবে লীলাবাদী বৈষ্ণব ভক্ত দয়িত-দয়িতা-সম্পর্কজাত আদিরসকে মন্থন করে ভক্তিরসে পরিস্নাত হতে চান, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পিতাপুত্রের স্নেহরসের সম্পর্ক স্থাপন করতে অভিপ্রয়াসী। তাই তিনি ধর্মসাধনার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে উপনিষদকে গ্রহণ করলেন। অবশ্য সমস্ত উপনিষদকেই তিনি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে এগারখানি উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দেখলেন, দেশের মধ্যে উক্ত এগারখানি উপনিষৎ ছাড়াও 'গোপালতাপনী উপনিষৎ' (বৈষ্ণব), 'গোপীচন্দনোপনিষৎ' (বৈষ্ণব), 'স্কন্দোপনিষৎ' (শৈব), 'সুন্দরী-তাপনী উপনিষৎ' (শাক্ত), 'কৌলোপনিষৎ' (তান্ত্রিক) এমন কি 'আল্লোপনিষৎ'-ও (যার মধ্যে ইসলামের আল্লাহ্ ও উপনিষদের ব্রহ্মের সংমিশ্রণ করা হয়েছে [৯]) প্রচলিত ছিল। তখন দেশের মধ্যে প্রাচীন ও

৮. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ৩য় সং, পৃঃ ১০৭

৯ সম্রাট শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ উপনিষদে আসক্ত ছিলেন এবং ৫২ খানি প্রচলিত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ করেছিলেন। তিনি উপনিষদের তত্ত্বের সঙ্গে সুফীতত্ত্ব ও অন্যান্য অধ্যাত্ম তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। বেদান্ত-উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব এবং ইসলামী অধ্যাত্ম শাস্ত্রের 'তৌহীদ', হিন্দুশাস্ত্রের 'সোঽহম্ অস্মি' এবং ইসলামি শাস্ত্রের 'অনল হক্' প্রায় একই রকম। সুতরাং 'আল্লোপনিষদ' রচিত হলে বিস্ময়ের কারণ নেই।

অর্বাচীন উপনিষদের মোট সংখ্যা ছিল একশ সাতচল্লিশ। ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে বেদ-বেদান্তের ঐশিকতা নিয়ে তাঁর প্রখর তর্কবিতর্ক হয়েছিল। ফলে তিনি বেদবেদান্তকে আর ঈশ্বরমুখনিঃসৃত ভাগবতী বাণী বলে গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু উপনিষদের প্রতি আনুগত্যও ছাড়তে পারলেন না।

উপনিষৎ-আখ্যাত অনেকগুলি গ্রন্থই নিতান্ত অর্বাচীনকালে রচিত সাম্প্রদায়িক ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু প্রামাণিক বলে গৃহীত উপনিষদগুলির সমস্ত যুক্তিই দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিভাববিভোর, দ্বৈতবাদী ও শান্তরসাস্পদ চিত্ত মেনে নিতে পারল না। শাঙ্করভাষ্যের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও তাঁর মনঃপূত হল না।[১০] তখন তিনি ব্রাহ্ম-মতাদর্শের চুম্বক রচনার জন্য নতুন করে বিশেষ বিশেষ উপনিষদ থেকে তাঁর মনোমত শ্লোক সংগ্রহ ও বৃত্তি রচনায় প্রস্তুত হলেন। ইতিপূর্বে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে তিনি ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য উপনিষৎ পাঠ করেন। অন্য পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি প্রশ্ন, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষৎ আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত উপনিষদের কোন কোন শ্লোকে তিনি প্রাণের আরাম খুঁজে পেলেন না। যে এগারখানি উপনিষদকে তিনি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যেও অনেক বাক্যের সঙ্গে (বিশেষতঃ যেখানে অদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে) তিনি আপোস করতে পারলেন না (যেমন, বৃহদারণ্যকের 'সোঽহমস্মি' এবং ছান্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' বাক্যে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈততত্ত্ব)। ব্রহ্ম ও জীবের সাযুজ্যকল্পনা তাঁর মতের সঙ্গে মিলল না। ১৮৪৩ সালে তিনি যে উপনিষদের ওপর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ১৮৪৮ সালে নৈরাশ্যভরা কণ্ঠে সেই উপনিষৎ সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হলেন: "এই উপনিষৎ তো আমাদের সকল

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (৩য় সং), পৃ: ৭৭

অভাব দূর করিতে পারে না। হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না” (আত্মজীবনী, পৃঃ ১৬৫— ৬৬)। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১০।৩—৬ এবং মুণ্ডকোপনিষদের ৩।২।৭ বাক্যে যে নির্বাণ-মুক্তির কথা বলা হয়েছে, তাকে তিনি একেবারে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন: “হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না” (আত্মজীবনী, পৃঃ, ১৭২)। এর অর্থ হল, তিনি হৃদয়ের সম্মতিকেই ধর্মানুভূতির মূল নিয়ামক শক্তি বলে গ্রহণ করলেন—দ্বৈতবাদীদের মূল অবলম্বন হল হৃদয়াবেগ। সে যাই হোক, তিনি কয়েকখানি উপনিষৎ থেকে মনোমত বাছাবাছা শ্লোক ও বাক্য সঙ্কলন করতে প্রবৃত্ত হলেন, যার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সংযোগ আছে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। তিনি দিব্যভাবে ও ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে উপনিষদের কিছু কিছু নির্বাচিত বাক্য বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেগুলি তদ্দণ্ডে লিখে নিলেন। উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক ও বাক্যসমষ্টি, যাকে ব্রাহ্মধর্মের ‘theistic বীজ’ বলা হয়েছে, সেগুলি পরে গ্রন্থাকারে ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামে প্রকাশিত হয়। এটি ১৮৪৮ সালের শেষভাগে সঙ্কলিত হয়, ১৮৪৯-৫০ সালে প্রকাশিত হয়, ১৮৫১-৫২ সালে এর অনুবাদ-সংস্করণ প্রচারিত হয় এবং ১৮৬১ সালের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় এর তাৎপর্য প্রকাশিত হতে থাকে। এ-বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন: “দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাঁহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি”। এখানে আত্মপ্রত্যয়, জ্ঞান ও হৃদয়কেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি বলা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করা যাবে, উপনিষদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অচলা ভক্তি থাকলেও জ্ঞানাত্মক আত্মপ্রত্যয়কেই তিনি সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর আত্মপ্রত্যয় চিদাত্মক হলেও আসলে তাঁর সমস্ত ধর্মচেতনা ব্যক্তিগত ভক্তিবাদ অর্থাৎ শান্তরসাস্পদ দ্বৈতভক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যদিও সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলন নব্য-শিক্ষিত বাঙালীকে উচ্চকিত করে তুলল, তবু ধর্মচেতনা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এইযুগে দেখা যাচ্ছে অগুয়েস্ত কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) ধ্রুবদর্শন বা পজিটিভিজম্-এর বিশেষ প্রভাব ছিল। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষকে সেই সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন মানববাদী কোঁৎ। নব্যশিক্ষিত বাঙালীসমাজে এই ফরাসী দার্শনিকের উদার মানবধর্ম প্রবল আধিপত্য লাভ করেছিল। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এঁরা ছিলেন কোঁতের গোঁড়া ভক্ত। তালতলায় নালমণি কুমারের বাড়ীতে এঁরা এবং আরও অনেক শিক্ষিত বাঙালী কোঁৎ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য 'পজিটিভিস্ট্ ক্লাব' স্থাপন করেছিলেন। তখন এদেশে যে-সমস্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান আসতেন তাঁদের কেউ কেউ এবং কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের দু'চার জন কোঁতের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।* বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমজীবনে বহুদিন কোঁৎ-ভক্ত ছিলেন।" কৃষ্ণচরিত্র-পরিকল্পনার পটভূমিকায় তাঁর কোঁৎ-অনুরক্তি এবং 'ধর্মতত্ত্ব'-এ 'অনুশীলনধর্ম' ব্যাখ্যায় এর নির্যাস সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে। শেষের দিকে তাঁর ধর্মাদর্শে পাশ্চাত্ত্য পজিটিভিজম্-এর সঙ্গে অনুশীলন তত্ত্ব (Religion of Culture) এবং ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার সংযোগ

* শ্রীমতী ফর্বেসের সম্প্রতি-প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ *Positivism in Bengal* (1975, Minerva Associates Private Ltd. Calcutta-29) এ-বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে।

১১. বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর "The substance of Religion is Culture" এবং কোঁতের "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the mallying-point for all the separate individuals"-বাক্যে মানবধর্মেরই জয় দেখতে পেয়েছিলেন।—'ধর্মতত্ত্ব', ক্রোড়পত্র, 'খ'।

সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। সেশ্বর সাঙ্খ্যদর্শনের অনুকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎ-অনুরক্তি শেষপর্যন্ত সেশ্বর কোঁৎ-বাদে পর্যবসিত হয়। অবশ্য কৌতুকের বিষয় এই যে, স্বয়ং কোঁৎ-ও ধর্মীয় মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। হিউম্যানিটির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা অগুয়েস্ত্ কোঁৎ হিউম্যানিটি-কেই যিশু খ্রীস্টরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ম্যাডোনা যেন একটি শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করে আছেন, সেই শিশুটিকে যিশু খ্রীষ্ট না বলে কোঁৎ তাঁকে মানবধর্ম বা 'হিউম্যানিজম্'-এর প্রতীক বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কোঁৎ-ভক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কোঁৎকে আর্যঋষির সমতুল্য মনে করতেন। তিনি ম্যাডোনা-মূর্তির কোলে শিশু হিউম্যানিটির স্থলে এটিকে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে ভারতীয় শাড়ীপরা নারীরূপেই পরিকল্পনা করেছিলেন। এই নারীর রাঙাপাড় শাড়ী পরনে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, কোলে স্তন্যপানরত শিশু। এঁকে তিনি ম্যাডোনা না বলে 'নারায়ণী' নাম দিয়েছিলেন। আসল কথা এই সমস্ত ভারতীয় কোঁৎ-পন্থীরা পুরোপুরি হিন্দুধর্ম ছাড়তে পারেন নি। যোগেন্দ্র-চন্দ্র তো সূর্যস্তব "জবাকুসুম সঙ্কাশং" পর্যন্ত কোঁৎ-প্রবর্তিত পজিটিভিজ্‌ম্ তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো যুক্তিবাদী কোঁৎ-পন্থীরা অবশ্য এই সমস্ত হিন্দুয়ানির বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, এবং কোঁৎকে বিশুদ্ধ মানব-প্রেমিকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতিতে কোঁৎ-দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ কোন গবেষণা হয় নি। যদি হত, তা হলে বাংলা সাহিত্যে এই বিচিত্র দার্শনিক মনোভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য প্রকাশিত হতে পারত। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কোঁৎ-দর্শন-চর্চার অনেক সূত্র নির্দেশ করে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে দু'চার কথা উঠতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে 'বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন ?' প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে সেকথা আলোচনা করেছি। এখানে বাহুল্য বোধ তার উল্লেখ করা হল না।

এই সময়ে বা এর কিছু পূর্ব থেকে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড আধিপত্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও শিক্ষার প্রভাবে কেউ কেউ ভারতীয় সাধনায় আবার ফিরে এলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ডিরোজিওর বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রথম যৌবনে কিছুদিন শালগ্রামশিলার ঐশ্বরিকতা অস্বীকার করেছিলেন এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এই পুত্রটি যজ্ঞোপবীতকে নিতান্তই সূত্রগুচ্ছ বলে কয়েকদিনের জন্য পরিত্যাগও করেছিলেন। অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞ ভূয়োদর্শী পিতা বিশ্বনাথের উপদেশে অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই ভূদেব ডিরোজিও ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার পান এবং পুনরায় স্মার্ত হিন্দুর দেব-বিশ্বাসে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের পুনর্গঠনের জন্য সদাচার সুনীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, পুরাতন দেববিশ্বাসকেও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রিয়াকর্মাদি গ্রহণ করে ভারতবর্ষকে ঐহিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে বটে, কিন্তু হিন্দুর পৌরাণিক ও স্মার্ত বিশ্বাস ও আচার পরিত্যাগ করলে চলবে না। যুগধর্মের সঙ্গে নিত্যধর্মের বিরোধ ঘুচিয়ে যথাসম্ভব সমন্বয়ের পথ নিতে হবে। বিশুদ্ধ হিন্দুয়ানি যে নিন্দনীয় অপকর্ম নয়, এবং আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবনের সঙ্গে যথার্থ হিন্দুধর্মের কোন বিরোধ নেই, একথা তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধে' আলোচনা করেছিলেন এবং আদর্শ গৃহস্থের গৃহজীবনের যথার্থ অবলম্বন কি হবে, তা দেখাবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এর অনেক স্থলে হিন্দুর সনাতন আদর্শ, স্মৃতিশাসিত সমাজব্যবস্থা, গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়; তার সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশের হিতচিন্তাও ব্যক্ত হয়েছে। ধর্মমতের দিক থেকে ভূদেব শেষপর্যন্ত গীতাকেই সার বলে জেনেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব খর্ব হতে থাকলে গীতার প্রভাবই শিক্ষিত বাঙালীসমাজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

৪

এই যুগে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) নাম ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় একটু বিচিত্র বোধ হতে পারে। অদ্ভুত প্রতিভাধর, বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী, ইংরেজী শিক্ষা, হিন্দুকলেজ, ডিরোজিও-প্রভাবের শ্রেষ্ঠ ফল প্যারীচাঁদ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীসমাজে ও ইংরেজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। দেশবিদেশ থেকে তিনি প্রতিভার উপযুক্ত সম্মানও পেয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং আরও খানকতক আখ্যানের রচনাকার সুরসিক ব্যক্তি বলেই জানে। বাংলা কথাসাহিত্যের জন্মলগ্নে গদ্যলেখক-রূপে তাঁর আবির্ভাব অত্যন্ত শুভ যোগাযোগ বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃৎ বলে সম্মান করতে হবে। পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন এবং বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন পিতার পুত্র প্যারীচাঁদ এবং কনিষ্ঠ কিশোরী-চাঁদ আধুনিক বাংলা সংস্কৃতিতে সুপরিচিত। পাশ্চাত্ত্য ধরনের কৃষি-বিজ্ঞানচর্চা, কৃষিবিজ্ঞানবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে প্যারীচাঁদ শুধু এ দেশেই নয়, বিদেশেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুত তার জীবন ও কর্ম অভিনব বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সাহিত্য-চর্চা, কৃষিবিজ্ঞান আলোচনা, প্রেততত্ত্বচর্চা ও থিয়োজফির নানা শাখাকে তিনি পরিপুষ্ট করেছিলেন। এইসমস্ত বিভিন্ন বিদ্যার মধ্যে আত্মীয়তার যোগাযোগ বড় একটা চোখে পড়ে না। কৃষিবিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্ম-বিদ্যার বিশিষ্ট সম্পর্ক কোথায়, তা হয়তো সুরসিক টেকচাঁদ ঠাকুর বলতে পারতেন।

প্যারীচাঁদ প্রথম যৌবনে হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ডিরোজিও-চক্রের প্রভাবে এসেছিলেন এবং তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'-সুলভ কালাপাহাড়ী মনোভাবের বশবর্তী

হয়ে অশন-বসনের কদাচারকে প্রগতি বলে মনে করতেন না। প্রথম যৌবনেই তিনি ধর্মবিষয়ক ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ পড়ে গভীর-ভাবে ধর্মজিজ্ঞাসু হন এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন: "There is but one God of infinite perfection"[১২] সে যুগের নব্যশিক্ষিত কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী যুবকদের মতো তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হলেন—"I became a theist or a Brahma," ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তাঁর আত্মিক জীবনের বিস্ময়কর পরিবর্তনের সুচনা হয়। স্ত্রীর প্রতি নিবিড় দাম্পত্য প্রেম তাঁকে ক্রমে ক্রমে প্রেততত্ত্বের দিকে টেনে নিয়ে গেল। এর পর তিনি বাইরের ধর্মচর্চা থেকে সরে এসে গভীরভাবে প্রেততত্ত্ব আলোচনায় মেতে উঠলেন। বোধ করি অশরীরী স্ত্রীর ছায়াসান্নিধ্য-লাভের জন্য ব্যাকুল প্যারীচাঁদ বিদেশ থেকে প্রেততত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থ আনিয়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলন শুরু করে দিলেন। প্রেততত্ত্ববিষয়ক বিদেশী সাময়িক পত্রে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল, পাশ্চাত্ত্যের প্রেততত্ত্বসংক্রান্ত সভা ও কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয় স্থাপিত হল। ১৮৮২ সালে লণ্ডনে 'Central Association of Spiritualists' গঠিত হলে তিনি তার সম্মানিত সদস্য হলেন। তার কিছু আগে এদেশে (১৮৮০) 'United Association of Spiritualists' স্থাপিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। ইংরেজীতে লেখা প্রেততত্ত্বসংক্রান্ত তাঁর যে সমস্ত প্রবন্ধ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলির অধিকাংশই *The Spiritual Stray Leaves* (1879) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। এ ছাড়াও তাঁর *Stray Thoughts on Spiritualism* (1880), *On the Soul: Its Nature and Development* (1881), *Notes on the Soul* (1908—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত), *Yoga and Spiritualism* (1909) প্রভৃতি গ্রন্থে

১২. প্যারীচাঁদের *On the soul* গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত

সংগৃহীত হয়েছিল। 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'ঈশ্বর উপাসনা,' 'উপাসনা' প্রভৃতি আখ্যান ও তত্ত্বগ্রন্থে তিনি প্রথমে প্রেমতত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা প্রভৃতি আলোচনার পর অধ্যাত্মবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে জীবতত্ত্বের সম্পর্কবিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা করেন, তাতে একদিকে হিন্দুর ষড়দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি যেমন তাঁর নিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল, তেমনি কর্নেল ওলকট ও মাদাম ব্লাভাট্স্কির থিয়োজফিতেও তাঁর প্রবল অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্ত্য থিয়োজফি প্রচারের নেতা কর্নেল ওলকট কলকাতায় এলে শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন, এবং ৫ই এপ্রিল (১৮৮২) কলকাতা টাউন হলে তিনি 'Theosophy : The Scientific Basis of Religion' এই শিরোনামায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। প্যারীচাঁদ সেই সভার সভাপতি হয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ থিয়োজফি সম্বন্ধে মাদাম ব্লাভাট্স্কিকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ওলকট-সংবর্ধনা সভায় (১লা মে, ১৮৮২) তিনি মাদাম সম্বন্ধে বলেন : "The most exalted lady Madame Blavtsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with greatful tears ......" সুতরাং অধ্যাত্মবিদ্যা প্রসঙ্গে তিনি ব্লাভাট্স্কির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। ১৮৭৫ সালে নিউ ইয়র্কে ওলকট ও ব্লাভাট্স্কির নেতৃত্বে থিয়োজফিকাল সোসাইটি গঠিত হয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, "To promote the study of the esoteric religious philosophies of the East." সুতরাং থিয়োজফি প্রেমিক পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতীয় দর্শন ও গুহ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

প্যারীচাঁদ বিশ্বাস করতেন : "The end of spiritualism is Theosophy. Spiritualists and theosphists should, therefore, be united and bring their thoughts to bear on

this great end."[১৩] প্রেততত্ত্ব শেষপর্যন্ত অধ্যাত্মতত্ত্বে পৌঁছে দেয়, পাশ্চাত্ত্য থিয়োজফিস্টদের মতো প্যারীচাঁদ একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যে দৃঢ় নিষণ্ণ ছিলেন। বিদেশী থিয়োজফিকে ব্রহ্ম-বিদ্যার দ্বারা বুঝে নিতে গিয়ে তিনি ভারতীয় মুনিঋষিদের বিহিত মার্গই অনুসরণ করেছেন এবং আত্মার অবিনাশিতা ও জীবাত্মা-পরমাত্মার পারস্পরিক সম্পর্কবিষয়ে ভারতীয় মোক্ষশাস্ত্রেরই অনুবর্তন করেছেন। কর্নেল ওলকটের সংবর্ধনাসভায় প্যারীচাঁদ এ-বিষয়ে পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন: "What the *Maharshis* and *Rishis* had taught in the *Vedas*, *Upanishadas*, *Yoga*, *Tantras* and *Puranas*, is that Divinity is in humanity, and that the life assimilated to Divinity in spiritual life—the life of *Nirvana* which is attainable by extinguishing the natural life by *Yoga*, culminating in the development of the spiritual life." এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্ব ছাড়িয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার মূল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর বাংলা নিবন্ধগ্রন্থ 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং আধ্যাত্মিক রূপক-উপন্যাস 'অভেদী'-তে অনেক গূঢ় সঙ্কেত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী থিয়োজফিস্টরা বুদ্ধিজীবী সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন; তার মূলে ছিল প্যারীচাঁদের বিশেষ প্রভাব। তাঁর বাংলা গ্রন্থগুলি এবং ব্রহ্মসঙ্গীতগুচ্ছ ('গীতাঙ্কুর') এ-বিষয়ে মৌলিকতা দাবি করতে পারে। তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা ও গভীর ভাবনিষ্ঠ রচনা থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

১৩. ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র *Theosophist* পত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Inner God' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। এইপ্রসঙ্গে অন্যান্য তথ্যের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যারীচাঁদ মিত্র' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

"হে পরমাত্মন্! তুমি স্বর্গে বিশেষরূপে বিরাজ করিতেছ। অসংখ্য দেবতারা সুমধুর সঙ্কীর্তনে মগ্ন থাকিয়া তোমার অভিবাদন ও প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তুমি সামান্যরূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, গতিস্বরূপ, আকর্ষণ স্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, সম্মেলনস্বরূপ, সুরম্য ধ্বনিস্বরূপ। তুমি সর্বনিয়ন্তা—সর্বসুখদাতা। বাহ্য রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্জ্বলিত, তেমনি অন্তররাজ্যের তুমি সূর্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়—যে আত্মা কত পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষরূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়। তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক প্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্বল্যমান"। ('যৎকিঞ্চিৎ')

৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের পুরাণবিরোধিতা এবং উপনিষদ-বেদান্তানুরক্তি ইংরেজী শিক্ষিতসমাজে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমন কি, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বেপরোয়া ইয়ং বেঙ্গল-দল যে নবীনসমাজকে গ্রাস করতে পারে নি, তার অন্যতম কারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ সরল ভাষায় উপনিষদের বিশেষ বিশেষ বাক্যের অনুবাদসহ যে 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ'-১ম ও ২য় (১৮৫০—১৮৫২) এবং 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫২) প্রকাশ করেন, তার দ্বারা ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বিশেষতঃ তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণে যে আত্মস্থ ভক্তি ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক ভাব দেখা যায়, গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।

পরবর্তীকালে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের অধ্যাত্মরচনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁরই বাসনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে ('অদ্বৈতমতের সমালোচনা'—১৮৯১, ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচনা—১৮৯৭, 'ব্রহ্মজ্ঞান ও 'ব্রহ্মসাধন'—১৯০০, 'হারামণির

অন্বেষণ'—১৯০৮, 'গীতাপাঠ'—১৯১৫, ইত্যাদি) একাধারে ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের যে নিগূঢ় সমন্বয় দেখা যায়, বাংলার দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। তাঁর রচনা থেকে এমনি একটি বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিক আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ

> "আত্মশক্তির উদ্দীপন-যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা জানিয়াও জানি না। আমাদের আত্মশক্তি রীতিমত পরিস্ফুট হইলে আমাদের কোন অভাবই থাকে না। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার নিগূঢ়-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল তা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মশক্তি—অর্থাৎ জগৎব্যাপারে যে শক্তি ঘটিতেছে সেই ঐশী শক্তি, কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র)

এইসমস্ত অধ্যাত্ম-চিন্তাকে তিনি পরিচ্ছন্ন যুক্তিমার্গের দ্বারা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, নিগূঢ় তত্ত্ববিদ্যা যুক্তিবুদ্ধির গোচরীভূত হতে পেরেছে। পরবর্তীকালে বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' তিনি কথা প্রসঙ্গে নিজস্ব ধর্মানুভূতি ও দর্শন চিন্তার কথা অতি ঋজুভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অজ্ঞেয়বাদীদের তিনি নাস্তিক বলেই মনে করতেন। তাঁর উক্তি ঃ "এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন?" এইপ্রসঙ্গে তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় শঙ্করাচার্যের বৈদান্তিক মত স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন ঃ

> "শঙ্কর বলিলেন—প্রকৃতির লীলাকে খবরদার বিশ্বাস করিও না; ওকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইজন্য ওকে আমি অবিদ্যা বলিতে চাই। বুদ্ধির দ্বারা উহার ভিতর হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে; উহা অবিদ্যা, মায়া। মায়া, illusion তোমাকে ফাঁকি দিবেই দিবে। কাণ্ট যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলেন। শঙ্কর ওপথ একেবারেই ধরিলেন না। ...আসল কথাটা শঙ্কর যেমন ধরিয়াছেন, তেমন আর কেহ ধরিতে

পারেন নাই। এখন, যে-আমি না থাকিলে জগৎ থাকে না, সৃষ্টি মিথ্যা হয়, সে-আমি কি একটা accident ? সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটা কি একটা accident-এর উপর নির্ভর করিতেছে ? তবে যদি না হয়, তবে ?" ('পুরাতন প্রসঙ্গ')

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এই প্রশ্ন অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক ও অধ্যাত্মবাদী সাধকের মনে কখনও সংশয় জাগিয়েছে, কখনও নাস্তিক্যের গহ্বরে সমস্ত চৈতন্যকে নিক্ষেপ করেছে, আবার কখনও-বা আত্মপ্রত্যয়ের ত্বরিৎ তড়িতালোকে চিদানন্দময় শিবতত্ত্বকে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' থেকে রক্ষা করেছে। আর্ষ-বাণীর অনুবর্তন করে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যে তত্ত্ববিদ্যার যে আয়োজন করেছেন, এবং যার ফলে আমাদের দর্শনসাহিত্যের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছে, এখনও তাঁর সেই কৃতিত্বের যথার্থ পরিমাপ হয় নি।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ এবং শিক্ষিত বাঙালীসমাজে তার প্রতিক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) যোগদান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নানাভাবে উপকৃত করেছিল। বৈষ্ণববংশের সন্তান কেশবচন্দ্রের ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল শুদ্ধা ভক্তি। নানাবিধ প্রগতিশীল আন্দোলন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নানা ব্যাপারের তিনি ছিলেন কর্ণধার, যুবসমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত শীলসাধনা ও যমনিয়মের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক নিষ্ঠা। পাশ্চাত্ত্য দর্শন যখন তাঁর মানসিক প্রদাহকে শান্ত কবতে পারল না, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' পাঠ করে ব্রাহ্ম-সমাজেব প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করে ব্রাহ্ম হলেন। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁকে সেইভাবে আকর্ষণ করলেন। বাগ্মী, প্রগতিশীল

অথচ ধর্মনিষ্ঠ যুবক, কলকাতার বিদ্বৎগোষ্ঠীর নেতা কেশবচন্দ্র মহর্ষির গভীর সান্নিধ্যে এসে ধর্মৈষণার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মানসিক প্রবণতার দিক থেকে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য ছিল। মহর্ষি ছিলেন উপনিষদের রসে লালিত শান্ত ভক্তির মানুষ; তার চেয়ে বড়ো কথা—তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাই ধর্মসাধনার প্রধান পথপ্রদর্শক। উপনিষৎ তাঁর একমাত্র শরণ্য হলেও তিনি প্রচলিত উপনিষদের সবগুলিকেই শিরোধার্য করতেন না। উপনিষৎ থেকে মনোমত শ্লোক ও বাক্য বাছাই করে এবং কোন কোন শ্লোকের তাৎপর্য অস্বীকার করে তিনি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ চিন্তার অধিকতর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। যুবক কেশবচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করলেও তাঁর মনঃপ্রকৃতির মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সচেতন হন। পরে প্রবীণ মহর্ষি ও নবীন ব্রহ্মানন্দের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। মত-পার্থক্য শেষপর্যন্ত মতবিরোধে পর্যবসিত হল। ১৮৬৪ সালের শেষভাগে অতিশয় প্রগতিশীল এবং আবেগপ্রবণ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখা দিল, নবীনের দল কেশবের প্রতি ঢলে পড়লেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালনা ও সম্পত্তির ভার নিজহস্তে গ্রহণ করলেন। এর ফলে ১৮৬৪ সালের পৌষ মাসে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগী নবীন ব্রাহ্মের দল (তারকনাথ দত্ত, উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি) দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করলেন এবং তার কিছুকাল পরে ১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (The Brahmo Samaj of India) স্থাপন করলেন। উদার ধর্মীয় মনোভাবের ফলে কেশবচন্দ্র সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ করে তিনি ধন্য হলেন; "Jesus Christ : Asia and Europe" বক্তৃতায় এমনভাবে খ্রীস্টপ্রীতি প্রকাশ করলেন যে, শুধু বাঙালীরাই নয়, অনেক য়ুরোপীয় রাজকর্মচারী ও বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ আশা করেছিলেন যে, কেশব ত্বরায় খ্রীস্টান হবেন। খ্রীস্টানী অনুতাপ ও আদিম

পাপভীতি, বৈষ্ণবদের লীলারস ও স্মরণকীর্তন, শাক্তের মাতৃভাব, মহম্মদীয় ধর্মের প্রবল ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্য—এ সমস্তই তিনি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আরও নানাপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি যুবসমাজকে প্রবলবেগে নিজ কক্ষপথে টেনে নিলেন। মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন কোন দিক থেকে কিছু রক্ষণশীল ও হিন্দুভাবাপন্ন ছিল বলে অধিকাংশ নবীন ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করলেন।[১৮] ধর্মীয় উন্মাদনা ও অধ্যাত্ম ভাবাবেগে কেশব যেন মাতাল হয়ে উঠলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্রাহ্ম-প্রতিকূল প্রধান ব্যক্তিও বৈদ্য কেশবচন্দ্রকে সদ্‌-ব্রাহ্মণের গৌরব দিতে দ্বিধা করলেন না।[১৫]

অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী স্বাভাবিক কারণেই কেশবচন্দ্রের অতি প্রগতিবাদ, উদ্দাম ভক্তিভাব এবং খ্রীস্টধর্মানুরক্তি বিশেষ পছন্দ করতেন না। নানাকারণে কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অপ্রসন্নতা সঞ্চারিত হয়েছিল।[১৬] একবার তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক পত্রে কেশবচন্দ্রের অভিনব ধর্মমতের কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন :

১৭ আদি ব্রাহ্মসমাজের এই বিব্রতাবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর একবার রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন : "আপনারা (অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজ) একটা গলির মধ্যে পড়েছেন, আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা, অন্যদিকে অত্যগ্রগামী ব্রাহ্মেরা চাপিয়া ধরিয়াছে।" (চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর,' পৃঃ ৫১৩)

১৫ 'ধর্মতত্ত্বে' (পৃঃ ৬২) বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্য কেশবচন্দ্রকে সদ্‌ব্রাহ্মণ বলেই ঘোষণা করেন এবং তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যগ্রহণও অনুমোদন করেন।

১৮. অবশ্য কেশবচন্দ্রের তিরোধানের (১৮৮৪) পর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (মাঘ, ১৮০৫ শক) তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি প্রচুর প্রশস্তিবাক্য ব্যয় করা হয়েছিল। যথা—"এই শ্রীমান ধর্মপ্রচারক্ষেত্রে অটল পদে দাঁড়াইয়া যে কল্যাণসাধন করিয়াছেন, জগৎ তাহা কখনও ভুলিবে না। ইঁহার পবিত্র উপদেশ দীপ্ত দিবালোকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া অনেককেই মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়াছিল।"

"ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার (কেশবচন্দ্র) সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই-বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান্-দি-বেপটাইষ্টের দ্বারা বেপটাইষ্ট্ হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মূশা, যীশা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এইসকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে?······কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্যবিরোধই উপস্থিত হইতেছে"।

(যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃঃ ৮০-৮১)

এখানে দেখা যাচ্ছে, কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়, বিশেষত খ্রীস্টানধর্মানুরক্তি মহর্ষির আদৌ পছন্দ হয় নি। কেশব ভক্তির আবেগের দ্বারা উদ্বেল হৃদয়ে সর্বধর্মের মধ্যে সার সত্যের সন্ধান করেছিলেন- সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে। উপরন্তু বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছে ; ফলে উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদ তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। সেই ভাবাবেশের ফলে তিনি এদেশের পুকুরের জলে জর্ডন নদীর তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেতেন, কখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্তনের অনুকরণে খোলকরতালসহ নগ্নপদে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নগরসঙ্কীর্তন করতে বেরুতেন এবং সভক্ত গান গাইতেন ঃ

'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতিবিচার'।

কখনও খ্রীস্টানী অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে বিলাপ করতেন, কখনও-বা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের মতো পুলকে প্রেমে তদ্গতচিত্ত হয়ে পড়তেন, ঘন ঘন শ্রীহরির নামকীর্তন করতেন। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের এই

ধরনের বাড়াবাড়ি আদৌ সমর্থন করতেন না। কথাপ্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন ঃ

"কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোন ধার ধারিতেন না, ভারতবর্ষের প্রাচীন culture-এর ভিতরকার কথা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; যতটুকু বুঝিতে পারিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চাত্ত্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিলে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন, নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতী ছাঁচে তাহার নাম দিলেন—New Dispensation—নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতী attitude লইলেন,—এইখানে সমস্ত reform movement-টা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল। তিনি উপনিষৎ ছুঁইলেন না, বাইবেল পড়িলেন। তাই কি হিব্রু অথবা গ্রীক শিক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন? ......তিনি কীর্তন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ তাঁর নববিধানে কীর্তনের প্রসার বাড়িয়া গেল। এদিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের[১৭] কাছে আনাগোনা করিতে লাগিলেন।[১৮] ('পুরাতন প্রসঙ্গ', নতুন সংস্করণ, পৃ, ২৯৫-২৯৬)

১৭. শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে। *Indian Mirror* পত্রিকায় (২৮এ মার্চ ১৮৭৫) এই সাক্ষাতের বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। তার থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ "We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit" ('কেশবচন্দ্র সেন' পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৫)

১৮. শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথই নন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হন নি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে মাতাল স্বামী পূর্ণ এবং তার কেশবভক্ত স্ত্রী বিধুমুখীর মধ্যে কথোপকথনে কেশবচন্দ্র সেনকে 'স্যানূজা' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে। স্ত্রী এজন্য সক্ষোভে বলল ঃ "আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, পাপীর গতি শ্রীপতিত-পাবন সেন মহাশয়কে কিনা তুমি স্যানূজা বল্লে?" মাতাল স্বামী বিদ্রূপভরে কেশবের আশ্রমকে 'সাঁইজির গির্জা' বলেছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই বিরস মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মসাধনার মননের দিকটাকে অপ্রধান করে আবেগমূলক সাধনার দিকে কেশবচন্দ্র বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই একই সঙ্গে বুদ্ধ-খ্রীস্ট-মহম্মদ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি তাঁর অনুরাগী যুবসমাজকে প্রভাবিত করেন। তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীস্টান ধর্ম, অঘোরনাথ গুপ্ত (সাধু অঘোরনাথ) বৌদ্ধশাস্ত্র, গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম শাস্ত্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় গীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ('চিরঞ্জীব শর্মা') গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ-বিষয়ে রচিত তাঁদের অনুবাদ ও আলোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মনিবন্ধসাহিত্যের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করেছিল একথা অতি অবশ্য স্বীকার করতে হবে। বলা বাহুল্য, তাঁদের কর্মোদ্যমের মূলে ছিল কেশব-ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক স্পর্শ।

কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের কোন কোন অংশ যেমন মহর্ষি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মনঃপূত হয় নি, তেমনি তাঁর কোন কোন আচরণও অতি-প্রগতিবাদী তরুণ শিষ্যেরা শিরোধার্য করতে পারলেন না। ১৮৬৮ সালের দিকে অত্যন্ত ভাবাবেগের বশে কোন কোন কেশব-ভক্ত "কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন।"[১৯] এর ফলে কেশবগোষ্ঠীতে নরপূজা ও গুরুবাদের প্রকাশ্য অনুপ্রবেশ দেখে তাঁর তরুণ শিষ্যদের কেউ কেউ শঙ্কিত হলেন। তাঁরা মনে করলেন- কেশবচন্দ্র উন্নত ব্রাহ্ম আদর্শ ছেড়ে দিয়ে 'হিঁদুয়ানি'র মধ্যে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ এতে অতি স্থূল প্রতীকোপাসনা বা পৌত্তলিকতার গন্ধ পেলেন। ক্রমেই তরুণ ব্রাহ্মদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে

১৯. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সংস্করণ), পৃঃ ২৪৬

আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। কেউ কেউ তাঁর সংঘ ও সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে এই উত্তাপ মন্দীভূত হয়ে আসে। কেশবের ভক্তি ও প্রগতিশীল সমাজসংস্কারবোধ নবীন সমাজকে দীর্ঘদিন মাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ১৮৭২ সালের দিকে কেশবের ভক্তসমাজে আবার লোষ্ট্রপাত হল। কোনও বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ ভক্তের দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শেষপর্যন্ত ব্যাপার আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কেশবচন্দ্রের অনুকূলে তার নিষ্পত্তি হলেও তাঁর বিরুদ্ধে একদল নবীন ব্রাহ্মের প্রতিকূলতা বেড়েই চলল। শিবনাথ শাস্ত্রী হলেন এই উপদলের নেতা। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৪) তাঁর সম্পাদনায় কেশববিরোধী নবীনদলের মুখপত্র 'সমদর্শী' মাসিকপত্র প্রকাশিত হল এবং এতে কেশবের মত ও আচরণের প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। আরও নানা কারণে কেশবের সঙ্গে নবীনদলের প্রচ্ছন্ন বিরোধ ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। কিন্তু লোষ্ট্রপাত সহসা বজ্রাঘাতে পরিণত হল ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে। এটিকে ব্রাহ্মসমাজের 'কুচবিহার পর্ব' বলে। ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহাররাজের বিবাহ সংঘটিত হলে, কেশবের বিরুদ্ধে তাঁর গোষ্ঠীর কেউ কেউ প্রবল প্রতিবাদ করলেন। তখন তাঁর কন্যার বয়স তের বৎসরের সামান্য বেশী। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইনের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নি বলে তরুণদল তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র পদত্যাগে সম্মত হলেন না। তখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে তারিখে কলকাতা টাউন হলে সমবেত হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন—কেশবের সঙ্গে তাঁদের বিরোধের এইভাবে নিষ্পত্তি হল। শিবচন্দ্র দেব, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি কেশববিরোধী ব্রাহ্মযুবকেরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। কেশবচন্দ্রও অল্পদিন পরে 'নববিধান' বা 'New Dispensation'

নামে নতুন করে নিজপ্রভাবাধীন আর এক ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করলেন এবং তার জন্য নতুন নিয়মকানুন তৈরী করলেন।[২০] সে যাই হোক, ১৮৭৮ সালের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে তিনখণ্ড হয়ে গেল মহর্ষিপ্রভাবিত আদিব্রাহ্মসমাজ, কেশবপ্রতিষ্ঠিত নববিধান এবং নবীনদলের ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের ঐক্য ত্রিধাবিভক্ত হলে শিক্ষিতসমাজের ওপর এর প্রভাবও কিঞ্চিৎ হ্রাস পেতে আরম্ভ করল এবং বাংলার ধর্মজাগরণের আর এক পর্বের শুরু হল—এটির নাম দেওয়া যেতে পারে বঙ্কিমপর্ব। হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুত্থান এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য যাকে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল Hindu Revival বলেছিলেন।

বাংলার ধর্মচেতনায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব যে সুগভীর তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যেও তাঁর জ্বলন্ত ভক্তি ও অধ্যাত্মানুভূতির এমন প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে যে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ভাষণ এবং 'জীবনবেদ,' 'মহোৎসব', 'সাধুসমাগম', 'আচার্যের প্রার্থনা' প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর ভাবোন্মাদনাময় স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে। অবশ্য "কেশবচন্দ্রই প্রথম বাংলাভাষায় মিষ্টিসিজ্‌ম আনয়ন করেন" এই মন্তব্য সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, "তিনি ছিলেন ভাষা-

২০. কেশবের ঘোর প্রতিবাদী শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর এই সময়ের আচরণ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন: "ইহার কিছুদিন পরে (অর্থাৎ কুচবিহার বিবাহের পরে) কেশবচন্দ্র তাঁহার নিজের বিভাগীয় সমাজের 'নববিধান' নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণীর গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইলেন"। ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', নিউ এজ্‌ সংস্করণ, পৃঃ ২৪৮)

শিল্পী—নূতন শব্দপ্রণয়নে ছিল তাঁহার অশেষ দক্ষতা",[২১] তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ধর্ম চিন্তায় প্রবলভাবে ভাবাবেগ ও ব্যক্তিচিন্তকে মিশ্রিত করে, তিনি একটি বিশিষ্ট গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, সেকথা তাঁর 'জীবনবেদ', 'সাধুসমাগম' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে। এখানে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কয়েকটি গদ্যানুচ্ছেদ উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১. "কেহ কোন কীর্তি রাখিতে চাও। কেহ প্রচারক হইবে মনে কর, কেহ ব্রত লইয়া লোকের মঙ্গল করিবে, এরূপ যদি মনে করিয়া থাক, কিছুদিনের জন্য একবার বনে যাইতে হইবে। দ্বিজ হইতে চাও, একবার দণ্ডধারী হইয়া অন্তত কয়েকপদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে। এই যে উপনয়নসংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুরা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে হইবে। যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে, তাহাকে মারিতে হইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছুদিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড়মড় করিয়া হৃদয়ের হাড় ভাঙিবে, অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনু লাভ হইবে। বাঁচিতে যদি প্রয়াস কর, একবার মর। ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে ফিরিয়া এস"। ('জীবনবেদ')

২. "শাক্য, সর্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্য মন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে। তোমার যে এতবড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে! কিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল? বিশ্বজননী যখন তোমার সৃজন করিলেন, তখন তোমার প্রাণের ভিতর এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদের উপরে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিলে?...হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবনবৃত্তান্ত বল,

২১. যোগেশচন্দ্র বাগলের 'কেশবচন্দ্র সেন' থেকে উদ্ধৃত।

তোমার প্রাণের ভিতরে নির্বিকার হরি কি অপূর্ব চিত্তরঞ্জক সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন"। ('সাধুসমাগম')

৩. "পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়রা, কলিকাতার পায়রা, কোন্নগরের পায়রা, ফরাসডাঙ্গার পায়রা গণনা করা যায়। আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার। গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ দিবে। তুমি বাঙালী কালো, তুমি কাফ্রি আরো কালো, তুমি ইংরেজ সাদা। কিন্তু আকাশের সব এক। চিদাকাশে পায়রা-আত্মা উড়িল, জ্ঞানসূর্যের আলোক পক্ষীর পক্ষের উপর পড়িল, সত্যসূর্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গ সকল উড়িতেছে। হিংসা, নিন্দা নীচ চিন্তা, দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা মাটিতে বাস করিলেই হয়; আকাশে এসব কিছুই নাই। অবএব পায়রা হও দেখি, যোগবলে আকাশে উড় দেখি? আমাদের যোগিগণ পাখী হইতেন, ধ্যান-সমাধিতে চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেন। আমার মন-পাখীও উড়িয়া গেল"। ('মাঘোৎসব: পায়রা উড়ান')

এ ভাষার আবেগ, সাত্ত্বিকতা ও গভীর তাৎপর্য বাংলা নিবন্ধ-সাহিত্যের একটা বিচিত্র দিক খুলে দিয়েছে। ব্রহ্মানন্দের চরিত্র ও মন এই উক্তির মধ্যে দর্পণে প্রতিফলনের মতো প্রকাশ পেয়েছে। এই রীতির সঙ্গে বিরাট পৌরুষের বীর্যোত্তাপ সঞ্চারিত হলে এটি একটি অভিনব রসরূপ লাভ করতে পারত, যার বিশিষ্ট পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন গদ্যরচনায় ফুটে উঠেছে।

কেশবচন্দ্রের প্রভাবের পর বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের দিন শুরু হল। হিন্দুর পৌরাণিক ঐতিহ্য, যা এতদিন খ্রীস্টান মিশনারী ও ব্রাহ্মগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তার আবার সুদিন এল। এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য দেশেও ভারতের পুরাণ, স্মৃতিসংহিতা, মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র, ষড়দর্শন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের যে অংশের প্রতি এতদিন ধরে শিক্ষিত বাঙালীরা বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, সেই পুরাণ ও মহাকাব্যকেন্দ্রিক আদর্শকে সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র নবপ্রবুদ্ধ চিদাত্মক প্রবণতা ও মানব-হিতবাদের আদর্শে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে

বিচারবিশ্লেষণ শুরু করলেন ; অনৈসর্গিকতা ও ভাবাবেগের উন্মত্ততা পরিহার করে তাঁরা বিশুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির নিরিখে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হলেন এবং ভগবান বাসুদেবের মানবাদর্শকে যুগধর্মের দ্বারা শোধন করে নিয়ে ভাগবতী চেতনা ও নব্য-মানবতাবাদকে (neo-humanism) গীতাতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন।* তারপর দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধকের সন্তানেরা বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অগ্নিহোত্রীর দল ভারতের মনে এমন দিব্যদাহ সৃষ্টি করলেন যে, অগ্নিগর্ভ শমীশাখার প্রতি তন্তুতে বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেল, তার স্পর্শ সঞ্চারিত হল বাংলার জীবন ও সাধনায়, বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যে। সে অন্যযুগের কাহিনী, অন্যভাবের ইতিহাস।

* বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা' প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তেইন জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই তারকণ্ঠে বলতে পারতেন, ভৌগোলিক সংস্থান ও নিসর্গপ্রকৃতি যেমন মানবচেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি মানব-সংস্কৃতিরও প্রধান নিয়ামক শক্তি হল এই দুটি সূত্র। কেউ কেউ সে-কথারই পুনরাবৃত্তি করে হয়তো বলবেন, পূর্বভারতের প্রত্যন্তবর্তী, আর্দ্ররসে ভরপুর এই গৌড়-বঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির বহুলাংশে এ-দেশের মাটির ছাপ লক্ষ্য করা যাবে। বাংলার মৃত্তিকা যেমন রসাতুর, আকাশ যেমন মেঘমেদুর, নদী যেমন পয়স্বিনী, প্রান্তর যেমন শ্যামলে-শাদ্বলে ঐশ্বর্যবান, এ-দেশের মনও তেমনি তরল আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে সামান্য কারণে—যার বহিঃপ্রকাশ হয় আবেগধর্মী গীতিকবিতায়। বস্তুতঃ প্রাচীন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের একটা প্রধান সুরই হল আবেগবেপথু গীতিকল্লোল। মনের যে অংশ শান্ত, নিরুত্তাপ, স্ফটিক-কঠিন--সেই মনই যৌক্তিকতার পারম্পর্যে দৃঢ়নিষ্ঠ; নৈয়ায়িকতা এই মনেরই দ্বিতীয় প্রকৃতি। কিন্তু এই মননধর্ম বাঙালীকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে না, সেকালেও করত না। কিন্তু একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, মনের দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতি বাঙালীর কুলধর্ম। যে-বাঙালী কীর্তনের আসরে ভক্তির রসাবেশে ঘন ঘন দশাপ্রাপ্ত হয়, সেই বাঙালীই নব্যন্যায়ের যুক্তির সড়ক বেয়ে অবলীলাক্রমে নির্জলা তত্ত্বের রাজ্যে আসর জমিয়ে বসে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও গৌড়ীয় নব্যন্যায় একই মনের বৃন্তে দুটি ফুল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকাব্যের বহু স্থলে বিস্তর 'আহা উহু, হায় হায়' করেছেন। কিন্তু

আসলে তিনি নৈয়ায়িক ও দার্শনিক—যদিও তাঁর এবংবিধ প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত রসসমুদ্রে ডুব দিয়ে আত্মহারা হয়েছে। সে যাই হোক, আবেগ ও মনন—বাঙালী মানসের এই দুটি রাজপথেই এ-জাতির নিত্য-অভিসার।

উনিশ শতকে পশ্চিম সমুদ্রপারের লোনাজলের প্লাবনে বাঙালীর রসাবেশে-মূর্ছিত সত্তা নতুন করে জেগে উঠল যৌক্তিকতার কঠিন প্রাঙ্গণে। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত, বাংলার চিন্তানায়কগণ গদ্যের রথে আরোহণ, করে, যুক্তির বল্গা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করে, মানস-তুরঙ্গকে ঐরাবতি মন্থর চাল শিখিয়েছেন প্রবন্ধে-নিবন্ধে। বস্তুত প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিকাশ ও পরিণতির মধ্যে একটা জাতির মনঃপ্রকৃতির স্বরূপ নিহিত থাকে। বস্তুজগৎকে যুক্তির তুলাদণ্ডে বুঝে নেওয়া এবং চিন্তার নৈরাজ্যকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা প্রবন্ধ-নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কাজটা উনিশ শতকের পিতামহেরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিলেন।

অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে, গদ্যের ভাবে ও ভাষায় রসের সুর লাগিয়ে বস্তুকেন্দ্রিক প্রবন্ধকে ব্যক্তিগত রচনায় পরিণত করাও নিবন্ধের আর-এক ধর্ম। তবে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সন্দর্ভের মধ্যে যেমন একটা আঁটসাঁট বন্ধনের ব্যঞ্জনা আছে, ব্যক্তিগত নিবন্ধে তা নেই। ব্যক্তিগত রচনায় ভাব বা আবেগের একটা ক্রমগতির বন্ধন অবশ্যই আছে, কিন্তু বাইরের দিক থেকে যৌক্তিকতার রশারশি এই ধরনের রচনায় প্রায়ই শিথিল হয়ে যায় এবং শিথিল হয়ে যাওয়াই এর স্বভাবধর্ম। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-নিবন্ধের যুগে এই ব্যক্তিগত রচনায় গীতিকবিতা ও ছোট-গল্পের স্বাদ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—গদ্য সাহিত্যের নানা পর্বে ও পর্যায়ে পাওয়া যাবে।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন জাত-নিবন্ধকার। যুক্তিতর্কের ব্যূহসজ্জা করেও তিনি চুট্‌কি তালে তুড়ি দিতে পারতেন। প্রাজ্ঞ-প্রবীণ জাতির অকাল-বার্ধক্য ঘুচিয়ে তার বুড়োমিকে ছেলেমিতে পরিণত করতে এই 'কৃষ্ণ-নাগরিক' বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের রস

তাঁর কলমের ডগা থেকে সম্প্রসারিত হয়ে সহস্রারে টংকার দিয়েছিল। নিটোল বুদ্ধির পরিপক্ক অমৃত ফলটিকে তিনি বর্ণে গন্ধে স্বাদে বিদগ্ধ বাঙালীর কাছে লোভনীয় করে তুলেছিলেন।

সেকালের রামমোহন থেকে শুরু করে একালের বীরবল পর্যন্ত কম বেশি দেড়-শ বছর ধরে বাঙালীর চিন্তা, কল্পনা, তথ্য, তত্ত্ব একদিকে যেমন গুরুগম্ভীর ভাষায় পোশাকী ছাঁদেব প্রবন্ধের চেহারা ধারণ করেছে, তেমনি আবার সরস ভাষায় প্রবন্ধের ছদ্মগাম্ভীর্য খসিয়ে দিয়ে তাকে গুরুমহাশয় থেকে বয়স্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে একালে যাব নামকরণ হয়েছে 'রম্যরচনা'। তবু একথা স্বীকার করতে হবে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, যা রচনাসাহিত্যের গোত্রভুক্ত তা রসসাহিত্যেরই আত্মজ। বাণীর কমলবনে তার অবাধ বিহার। তাকে বলা যেতে পারে গণ্ডকী শিলা, রসের স্রক্‌চন্দনেই যার নিত্য 'শিঙার' হয়। কিন্তু আহার্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন বাটনাবাটা শিলনোড়া। তা যতই প্র্যাগমাটিক হোক, তাকে ছেড়ে দেহের বলাধান হওয়া দুরূহ। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যদি হয় শালগ্রাম, তবে তত্ত্বভার প্রবন্ধকে সহজেই মুষল-উদুখল বলা যেতে পারে। একটাতে আত্মার আনন্দ, অপরটাতে শরীরের পুষ্টি। বলা বাহুল্য, শরীরকে বাদ দিয়ে যাঁরা কাজ চালাতে পারেন তাঁরা দেবতা বা অপদেবতা। মানুষের সমস্ত লীলাখেলাই সার্ধ-তিনহস্ত পরিমিত দেহটাকে ঘিরেই চলে। সেই সচল দেহের সবল প্রাণশক্তি হল মন যেখান থেকে বাস্তবধর্মী প্রবন্ধের উৎপত্তি।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে, শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ বৈজ্ঞানিক মননকেই বরমাল্য দিয়েছিলেন। হর-প্রসাদ, রাখালদাস, নিখিলনাথ, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং আরও অনেকে লিপিলেখন, পট্টোলী ও পুঁথিপত্রের মধ্যে গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম সমতটের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন অকুতোভয়ে ও নিরলস সমীক্ষায় আজীবন নিরত থেকে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সায়েন্স কলেজের প্রকোষ্ঠে বন্দী থেকেও বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যয় সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে কর্মকুণ্ঠ, ভাব-বিলাসী ও 'নেই-আঁকুড়ে' বাঙালীকে কর্মযজ্ঞে আহ্বান করবার জন্য বহুবিধ প্রবন্ধ রচনা করলেন। এঁদের ঈষৎ পূর্বে ও প্রায় সমকালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা ভরাতে লাগলেন, তাতে একথা মনে করা যেতে পারে যে, বাঙালীর মানস-সরোবরে ঢেউ তুলতে বদ্ধ পরিকর হয়েই তাঁরা প্রবন্ধের কলম ধরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সবুজপত্র'-এর কথা একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। 'সবুজপত্র'-এর ন্যগ্রোধ ছিলেন বালিগঞ্জ 'মে-ফ্লাওয়ার'-নিবাসী বীরবল এবং 'সবুজপত্র'-এর নবীন প্রবীণ গোষ্ঠী এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল মানসিক আত্মীয়তা। নলিনীকান্ত গুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বয়ং বীরবল-গৃহিণী ইন্দিরা দেবী— এঁরা পত্র-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখায় যে দোলন সৃষ্টি করলেন, তাতে অসাড় চেতনাও নড়েচড়ে উঠল। মনে হল, মনতেইন থেকে বেলক পর্যন্ত প্রসারিত পাশ্চাত্ত্য নিবন্ধের ধারার সঙ্গে এঁরা প্রতি-যোগিতা-সহযোগিতায় সমর্থ। বাণীর বীণকার রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। শিল্প, সাহিত্য-- মায় সমবায় ও তারকালোকে খবর নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি স্বাদের দিক থেকে রসতীর্থেরই সহজিয়া পথিক।

উনিশ শতকের শেষের পৈঠায় দাঁড়িয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছিলেন তাত্ত্বিক ও রসিকের যুগ্ম ভূমিকায়। তারপর বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ-সাহিত্য উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠল। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত, ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত—এঁরা অভিনবগুপ্তেরই বংশধর। আলঙ্কারিকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বিচারবুদ্ধিকে এঁরা যেভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তাতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-বিচারপদ্ধতি একালে নতুন মর্যাদা পেয়েছে। রসতত্ত্ব মোটেই রসাল ব্যাপার নয়। ন্যায়, মীমাংসা, আনন্দ ও কৈবল্য-

তত্ত্বের এক বিচিত্র রসায়নে ভরত-আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত-মম্মট-ভট্ট যে পানকরস প্রস্তুত করেছিলেন, একালের গুপ্ত এবং দাশগুপ্ত মহোদয়েরা তাকে সুপেয় পানীয়ে প্রস্তুত করতে গৌড়ীয় ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। পি. ভি. কানে এবং ডঃ সুশীলকুমার দে পূর্বেই ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র মন্থনে অনেকটা অগ্রবর্তী হয়েছিলেন; একালের বাঙালী ভাষ্যকারেরা বাংলাভাষায় এই দুরূহ ব্যাপারকে যথাসাধ্য সহজ ও সরস করবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় যে সার্থকভাবে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত রীতিপদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, এ কথাটাই এঁরা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে এর প্রতিষেধক হিসেবে মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (অবশ্য ইনিও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের ভক্ত) য়ুরুপার শ্বেতভুজা ভারতীর দাক্ষিণ্যই অধিকতর কামনা করেছেন। বোধ করি এঁরা বলতে চেয়েছিলেন, বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব এবং "স্বসংবিদানন্দ-চর্বণব্যাপার রসণীয়-রূপো রসঃ" - এই মাপকাঠিতে আধুনিক কবি ও পাঠকের অন্তরতম রহস্যকে পরিমাপ করা যাবে না। স্বয়ং 'রসগঙ্গাধরের' লেখক জগন্নাথ 'দ্রুতিকাব্য' ও 'দীপ্তিকাব্য'-এর ধ্বজপতাকা ধারণ করে আসরে অবতীর্ণ হলেও একালের রসিক পাঠক তাতে বিশেষ বিচলিত হবেন না। মোহিতলাল এবং সমধর্মী সমালোচকেরা সাহিত্যকে পাশ্চাত্ত্য শিল্পব্যাখ্যার আদর্শে দেখতেই অভ্যস্ত এবং তাকেই শিষ্ট পন্থা বলে মনে করেন। এঁদের কেউ কেউ অধ্যাপক এবং অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণপদ্ধতিতেই একান্ত আসক্ত। কেউ-বা উনিশ শতকী ইংরেজী রোমান্টিক সমালোচনা ও গ্রেট ব্রিটেনের 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' নীতিমার্গের আত্মসন্তুষ্টিতে নিমগ্ন থেকে এবং বাংলা-সাহিত্য-বিচারপদ্ধতিকে রসতত্ত্বের কবল থেকে রক্ষা করে সৌন্দর্যতত্ত্ব ও কল্পনাতত্ত্বের রঙিন আকাশে তাকে মুক্তি দিতে চান। রবীন্দ্রসাহিত্য উপভোগ ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী যে বিশেষ ধরনের রসস্নিগ্ধ ও মননসমৃদ্ধ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে,

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে ভূরিপরিমাণ গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও ঠিক সেই স্বাদু স্বাদটি আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, শিল্প—বিবিধ ক্ষেত্রে আরও অনেক চিন্তাশীল লেখক স্বচ্ছন্দ পদচারণা করেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ, ডক্টর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, গোপাল হালদার, সরোজ আচার্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, আবু সৈয়দ আইয়ুব এবং আরও অনেকে সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য, শাক্তসাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, রবীন্দ্রসাহিত্য প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে বহু ভারসহ গ্রন্থ রচনা করে বাঙালীর চিন্তার দীনতা ঘুচিয়েছেন। উত্তরসূরীরা এঁদের দান শিরোধার্য করবেন নিশ্চয়, যদিচ একটু ন্যুব্জ হয়ে পড়বেন। অবশ্য দর্শন ও বিজ্ঞানে খুব একটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না দর্শনের প্রবীণ আচার্যেরা জ্ঞানমার্গের চেয়ে মোক্ষমার্গ সম্বন্ধে অধিকতর কৌতূহলী বলে তাঁদের বংশাবতংসেরা বাংলা প্রবন্ধের পুরোভাগে দর্শনকে স্থাপন করতে কিছু ইতস্তত করছেন বোধ হয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা লিপিবদ্ধ করার রেওয়াজ এখনও প্রচলিত হয় নি। কেবল মার্কসীয় দর্শন, ফ্রয়েড ও উত্তর-ফ্রয়েডীয় গোষ্ঠী এবং পাভলব সংঘ বাংলা ভাষায় প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছেন। এ-সব হল তত্ত্বকথা, মস্তিষ্ক আলোড়িত করে বুঝতে হয়। মনঃসমীক্ষণ যে কতটা রসসংবেদনে পরিণত হতে পারে অধ্যাপক সুহৃৎ মিত্র তার চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সে পথে নতুন পথিক আসে কই ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে ও সমকালে বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের পরিমাণ বেশি নয়, গুণগত উৎকর্ষও বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে না। অবশ্য চুটকিতালে কেউ কেউ কাণ্ট-হেগেল-মার্কসের মাপ-

জোখ করছেন বটে ; কেউ বা ঔপনিষদিক উতুম্বর ফলের রসাস্বাদনেও উৎসাহিত হয়েছেন, কেউ কেউ নিজস্ব অথবা দলগত গুরু-মোহন্তদের পরমকথা লিখে চলেছেন অক্লান্ত উৎসাহে। কিন্তু এ-সব রচনার অধিকাংশ স্থলেই না আছে ভার, না আছে ধার ; না আছে রস, না আছে কষ। অবশ্য কিছু কিছু রচনায় তথ্যগত কিছু ভার আছে, কিন্তু প্রকাশের চারুত্ব নেই বলে সাধারণ পাঠকে তার প্রতি ততটা আকৃষ্ট নয়। কারণ সরস্বতীর সেবকেরা অকারণ ভারবহনে অনুৎসুক, ভার হরণ করাই সারস্বত ধর্ম। সেদিক থেকে প্রাক্-ছেচল্লিশ সালের কোনো কোনো নিবন্ধ-সাহিত্যের সর্বাঙ্গে মননের রস ও রক্ত সঞ্চারিত হয় নি। যুদ্ধজনিত মানসিক বিকার ও মানবিক ভ্রষ্টতা—তার সঙ্গে যোগ দিল মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। তার অশুচি আশ্লেষে গোটা বাঙালা সমাজ ১৯৪৬ সালের পূর্বেই রুচির দিক থেকে হয়ে পড়ল ফিলিস্টাইন, আদর্শের দিক থেকে পল্বলবিহারী ক্লিন্ন জন্তু, মনের দিক থেকে 'লিবিডো'-ভূতগ্রস্ত ফ্রয়েডায় প্রেতাত্মার দুঃস্বপ্ন। তারপর এলো সাম্প্রদায়িক হানাহানি —সুন্দরবনের দন্তুর শ্বাপদের দল কলকাতার পথেঘাটে মহোল্লাসে বিহার করতে লাগল। রাজপথে রক্তাক্ত, স্ফীত, পচনশীল মৃত মানুষের পূতিগন্ধ, নাগরিক আকাশে শত শকুনের পাখসাট। এই তো ১৯৪৬ সালের মানসিক মানচিত্র। এই হানাহানির বৎসরেই প্রমথ চৌধুরীর জীবনান্ত হল। সাময়িক কারণে উত্তেজিত ও প্রাণভয়ে ভীত বাঙালা বোধহয় সেই মুহূর্তে থমকে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ করে নি। প্রথম চৌধুরীর মৃত্যুর সাতাশ বৎসর পূর্বে মুমূর্ষু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শয্যাপার্শ্বে বসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, 'আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।' প্রমথ চৌধুরীর জীবনাবসানে বাঙালী-সমাজ কি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, 'আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতনভরা তরী ?'

'ভ্রাতৃঘাতী' রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এল, ভিক্ষাভাণ্ড ভরে দাক্ষিণ্যের দান আমরা মাথায় করে নিলাম। তারপর

সিকি শতাব্দী অতিক্রম করে গেল। এখনও হয়তো সালতামামির হিসাব নেবার সময় আসে নি। কারণ সময়ের দূরত্ব না থাকলে সাহিত্য-সংস্কৃতির যথাযোগ্য বিচার বিশ্লেষণ চলতে পারে না। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমরা চিন্তারাজ্যের কতটা জমি দখল করতে পেরেছি, এখনই তার দফাওয়ারি হিসাব সম্ভব নয়। সশিষ্য প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার—কেউ-ই আজ দেহের দিক থেকে বেঁচে নেই। অবশ্য চিন্তারাজ্যের এই সমস্ত দিক্‌পালদের অবসান হলেও গত পঁচিশ বৎসরের প্রবন্ধ-নিবন্ধ শাখাকে ফুলফলহীন বলাও বোধহয় ঠিক হবে না। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমালোচনা-সাহিত্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পারমার্থিক দর্শন প্রভৃতি স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে নেই-নেই করেও বেশকিছু মননের ফসল গোলাজাত করা গেছে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধের ধাত্রী হচ্ছে সাময়িক পত্র। 'সবুজ পত্র'-এর সঙ্গে সমস্বরে উচ্চার্য ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' লীলা সংবরণ করেছে। বাঙালীর মানসিক দিকনির্ণয় যন্ত্রটির যথাযথ পরিচয় পেতে হলে সাময়িক পত্রের মধ্যেই তার স্বরূপ ধরা পড়বে। ক্ষোভের বিষয়, মননের ধারা বহন করবে যে সাময়িক পত্র, তাতেই গ্রহণ লেগেছে। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এর অকাল-অবলুপ্তি বাঙালীর সাম্প্রতিক পরিবেশের রূঢ় রূপটি নিষ্করুণভাবেই ফুটিয়ে তুলেছে ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়ে তার রূপগুণ, দুই-ই বদলে গেছে। শনৈশ্চরের মৃত্যুর পর 'শনিবারের চিঠি'-ও ডেড লেটার অফিসের দিকে ধাবমান হয়েছে। 'সমকালীন' দুঃসাহসে ভর করে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই এখনও মাসে মাসে আত্মপ্রকাশ করছে। অবশ্য দু-একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ভব্যবেশে এখনও প্রকাশিত হয়, তবে সেগুলি গোষ্ঠীর বাণীবাহক। যাঁরা একাকিত্বের আনন্দে মানসিক অবসর যাপন করতে চান এবং গোষ্ঠবৃত্তি ভাঙাই যাঁদের

স্বভাব, সেই সব চিন্তাশীল প্রবন্ধ-পাঠকের আজ বড়ো দুর্দিন। মধ্যম শিক্ষিতের জন্য দৈনিকের রবিবাসর এবং ডিলাটেণ্টের জন্য দু-একটি সাপ্তাহিক পত্রই সম্বল। অবশ্য 'দর্শন', 'ইতিহাস', 'জ্ঞানবিজ্ঞান', 'গবেষণা', 'ভাষা' প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সেকালের 'প্রকৃতি'-র মতো বিজ্ঞান-সম্পর্কিত উপভোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় না কেন? কেনই বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতি মূল্যবান ত্রৈমাসিক গবেষণা-পত্রিকা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কখনো বা দু-তিন বছর গা ঢাকা দিয়ে কোনো প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করে? পর্ণোগ্রাফিকে মূলধন করে রংদার পত্রিকার এতো ছড়াছড়ি কেন? স্টলে হকারের কাছে হাজারো পত্রিকার নব-কল্লোল শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কথা উঠবে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও সাহিত্যসম্পর্কিত ছোটো-বড়ো-মাঝারি প্রবন্ধ একালে তো কম লেখা হল না। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ—এঁরা কবি হলেও কখনো মননের তির্যকতা সৃষ্টি করে, কখনো বা চিন্তার গহনে বিপরীত ও বিষমের ঝড় তুলে রসিক পাঠকসমাজে যথেষ্ট চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। শিবনারায়ণ রায় সাহিত্য-সংস্কৃতি ঘটিত কয়েকটি শাণিত প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ ক্রেংকার ধ্বনি তুলেছিলেন। ইদানীং তিনিও মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। আবু সৈয়দ আয়ুবের লেখনীকে কাকবন্ধ্যা বলব না, তবে তা বড়ো মন্থর। অবশ্য আশ্বাসের কথা ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তিরাশির তোরণ পার হয়েও দেহে-মনে-চিন্তায় দেবদ্রুমের মতোই সুদীর্ঘ ও সরল, অথচ 'হেলতে পারেন দক্ষিণের হাওয়া লাগলে'। কিন্তু আমাদের ক্ষোভ, তিনিও কি আমাদের শুধু মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বিদায় করবেন? বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য তাঁর দক্ষিণপাণির দাক্ষিণ্য কতটা লাভ করেছে? কেউ কেউ বিজ্ঞানের ইতিহাসও লিখেছেন, কিন্তু ঐ মুষ্টিভিক্ষার মাপে। উইলিয়ম সিসিল ডেম্পিয়ারের *History of Science*-এর স্বর্ণভাণ্ডারে বাঙালী বিজ্ঞানলেখকের সন্ধিখনন বুদ্ধিজীবীরা আর কতকাল সহ্য করবেন? বোধ হয় সস্তা সাংবাদিকতা সাম্প্রতিক মননের ভার ও

ধার কমিয়ে দিয়েছে। 'নিও-লিটারেট' নামে যে সমস্ত জড়বুদ্ধি বাল-বৃদ্ধের দল ললাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলমোহর এঁটে অশ্বমেধের যুবনাশ্বের মতো দিকদিগন্তে ভ্রাম্যমাণ, ঈশ্বরের কৃপায় মননব্যাপারে তাঁরা নিরুৎসুক। তাঁদের আত্মজেরা ভবিষ্যতে যে কী ধরনের জৈব পদার্থে পরিণত হবে তা ভাবলেই রোমাঞ্চ হয়। সিকি শতাব্দী ধরে সারা ভারতবর্ষেই নির্দ্বিধায় মা-সরস্বতীর মুণ্ডপাত চলেছে শিল্পসম্প্রসারণের নাম করে। এই পঁচিশ বৎসরের মানবিক মূল্যভ্রান্তি শিক্ষার আত্মাকে প্রায় বিনাশ করে এনেছে। সস্তা টেক্সট বই ও বিবর্ণ নোট বইয়ের ছেঁড়াপাতা কুড়িয়ে নিয়ে যারা বিদ্যার দিগ্‌গজ হতে চায়, তাদের বৃংহণ ক্রমে ক্রমে সিংহনাদে পরিণত হতে চলেছে। তারাই অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাসেম্বলি, পার্লামেণ্ট আলো করে বসে আছে ; তারাই সংস্কৃতির দূত হয়ে দেশবিদেশে বরযাত্রা করছে। এই তামসিক কুশিক্ষার হরিহর ছত্রের মেলায় বুদ্ধিজীবীরা 'হংসোমধ্যে বকোযথা' হয়ে নীরবে একান্তে অবস্থান করছেন। যেখানে দু-চার ছত্র বাংলা লেখাই ডিগ্রীধারী যুবকের পক্ষে দুঃসহ ক্লেশের ব্যাপার, সেখানে প্রবন্ধ-নিবন্ধের কী দশা হবে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আমাদের আশঙ্কা, অর্থনীতির Bad money drives out good money—এই সূত্র আগামী বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলার বুদ্ধিজীবী সমাজেও শোচনীয়ভাবে উৎকট আকার ধারণ করবে। সত্যিকারের মানসিক ঐতিহ্যের অধিকারী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যে আত্মগোপন করতে বাধ্য হবেন এবং পাটোয়ারি বুদ্ধির অর্ধবর্বরের দল মনোভূমিতে নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে চরে খাবে।

অবশ্য এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একটি দীপশিখা চোখে পড়ে। তা হল ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—'রম্যরচনা' নাম নিয়ে যা জাতকুল খুইয়েছে। আগেই বলেছি, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ গদ্যে লেখা হলেও, আসলে এ হচ্ছে রস-সাহিত্যের বংশধর। তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ যদি মনের গাছ হয়, তা হলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হল তার ফুল। গীতি-প্রবণতা, মানসিক ঔদার্য ও

সহজ রস-রসিকতা যে জাতি বা ব্যক্তির নেই তার পক্ষে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। তার সঙ্গে যদি জীবন সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ সহিষ্ণুতা, গভীরতর প্রত্যয় ও দার্শনিক চেতনা না থাকে তাহলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের যে দশা হয়, একালের রম্যরচনা তার উৎকট দৃষ্টান্ত। চিন্তার শিথিলতা, প্রকাশের ঢিলেমি, আর প্যারাডক্সের ঝুলঝুরি দিয়ে যে সমস্ত রম্যরচনাকারের দল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সরল তরল পাঠকের মনে ফ্যাশনের ফানুস উড়িয়েছিলেন, আজ পঁচিশ বৎসর পরে দেখা যাচ্ছে তার অনেকগুলোই চুপ্‌সে গেছে। অথচ প্রসন্ন গদ্যে, অম্লতিক্ত রঙ্গকৌতুকব্যঙ্গের সাহায্যে, কোথাও বেদনারস ও সহানুভূতির রস সিঞ্চন করে গদ্যনিবন্ধে লেখকের মনের কথা বলা শুরু হয়েছে উনিশ শতকের প্রায় গোড়ার দিক থেকে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ, হুতোম, চন্দ্রনাথ বসু, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পঞ্চানন্দ (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এঁরা কেউ শিক্ষক, কেউ সমাজ-সংস্কারক, ধর্মপ্রবক্তা, চিন্তাশীল নিবন্ধকার, সাময়িকপত্র-পরিচালক। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা যেন অজ্ঞাতসারেই স্টিল, অ্যাডিসন, ল্যামের মন-মেজাজ অনুসরণ করেছেন। পরে তো সহস্রাংশুবর্ষী স্বর্গদেবতা রবীন্দ্রনাথ অজস্র গদ্য নিবন্ধ, চিঠিপত্র, রোজনামচা, ভ্রমণকাহিনীতে ব্যক্তিগত মনের রসটি শতধারায় সঞ্চারিত করে গদ্য নিবন্ধের এই শাখাটিকে অক্ষয়বটে পরিণত করেছেন। একালেও দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, পরিমল রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাযাবর, রঞ্জন, মুজতবা আলি, শঙ্কর, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রূপদর্শী, সুকন্যা, সুনন্দ—এঁরা কেউ বিশুদ্ধ ব্যক্তিরসে ডুবে গিয়ে, কেউ ভূয়োদর্শন ও অর্জিত বিদ্যাকে সরস করে, কেউ ইতিহাস-বিজ্ঞান-প্রত্নতত্ত্বকে লোভন-শোভন করে, কেউ জীবিকার নীরস ঘর্ঘর চক্রধ্বনির মধ্যে মনের সুর বাজিয়ে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পাঠকের মনে প্লাবন ডেকে আনলেন। কেউ-বা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক গুরুকে রম্যরচনার ধাঁচে বর্ণনা করছেন। এঁরা অতিশয়

শক্তিমান লেখক, নিজের মনের কথাকে যেমন খুশি লোফালুফি করতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত আপাতমধুর রচনা দুর্বল-মস্তিষ্ক লেখক এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পাঠককে প্রবলবেগে আকর্ষণ করেছে। তাতে আবার বাতাস দিচ্ছে দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যা। ফলে চিন্তার শিথিলতা, লেখকের আত্মপ্রকাশে অপটুতা, বুদ্ধির জড়তাই এখন রম্যরচনার গুণ বলে প্রচারিত হচ্ছে। মনের দিক থেকে বাঙালী যে 'দশমী-দশা'য় প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সমস্ত বালভাষিতং তার প্রধান লক্ষণ। তবে আশার কথা, এই বিভাগের শক্তিমান লেখকেরা এখনও বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নি, এবং বাঙালী পাঠকের মনে একটা স্বাভাবিক রসবোধ আছে, যার দ্বারা কালে তাঁরা বুঝতে পারবেন, কোন্‌টি কাচ আর কোন্‌টি কাচমণি, কোন্‌টির সাহায্যে শুধু দর্শন চলে, কোন্‌টির সাহায্যে চলে দহন।

এবার কিছু অভিযোগের পালা। 'অংরেজী হঠাও' তো পুরোদমে চলেছে প্রদেশে প্রদেশে। ভৌগোলিক ভাষা-সরস্বতীর আরতি করতে গিয়ে জননী ভারত-ভারতীর আজ কী দশা হয়েছে চক্ষুষ্মান ও সহৃদয় ব্যক্তি তার শোচনীয় পরিণাম দেখতে পাচ্ছেন। বাংলা ভাষায় মননকর্ম শৌখিনতা ছেড়ে সিরিয়স ব্যাপারে এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কতটা আত্মনিয়োগ করেছে সে-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলে অন্যায় হবে না। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিজ্ঞানচর্চা ও তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ-দেশের বিজ্ঞান গবেষকদের প্রধান গবেষণাকর্ম এখনও তো ইংরেজীতেই নির্বাহ হয়। চুটকি তালে কেউ কেউ দু-চারখানি শিশুপালবধ ধরনের টেক্সট্ বুক লিখছেন, কেউ বা লিখছেন 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান'। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও গবেষক রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, জীববিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় পি-এইচ. ডি. থীসিস দাখিল করেছেন কি? ফরাসী, ইংরেজী, জর্মন ও রুশ ভাষায় বিদেশ থেকে যে সমস্ত গবেষণা-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাতে বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষকের প্রবন্ধ সেই ভাষাতেই মুদ্রিত হয়, প্রশংসিতও

হয়। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? এতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের কতটুকু লাভ? এদেশের ঐতিহাসিক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক, বাস্তুকার, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী (ত্রৈমাসিক 'মানবমন' একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম) বিশ্বপাঠকসমাজের করতালির আহ্বানে জননী বঙ্গভাষাকে বঞ্চিত করেন, কোথাও-বা নিতান্ত কৃপাভরে দু-চারটি বাংলা প্রবন্ধকণা মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিকের সম্পাদকের ভাণ্ডারে নিক্ষেপ করেন। শিল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ, যামিনীকান্ত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার এবং নন্দনতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় অভয়কুমার গুহ ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁদের পতাকা বইতে পারে এমন উত্তর-সাধক জুটল কই? আচার্য সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহ্যবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থগুলি এখনো তো বিদেশী ভাষার কারাকক্ষে নির্বাসন যাপন করছে। এখনো ভাষাতত্ত্বের বন্ধুর বর্ত্মে অগ্রপথিকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব উচ্চতম শিক্ষার গৌরব লাভ করে। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য গবেষণা নয়, ছাত্রসমাজকে পরীক্ষা-বৈতরণী পার করাবার জন্যই লেখকগণ অধিকতর সচেষ্ট।

এক বিষয়ে কিন্তু গবেষকেরা অতি-উৎসাহী। তা হল বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত পি-এইচ ডি. থীসিস। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে শতাধিক পি-এইচ. ডি. থীসিস মঞ্জুর হয়েছে, এবং অন্তত বিশ-ত্রিশখানি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার মূল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ-দেশে বাংলা সাহিত্য নিয়ে এত গবেষণা কেন হয়, কেউ কেউ বাঁকা কটাক্ষে প্রশ্ন করে থাকেন। উত্তরটা সোজা। দেশটা যখন বাংলাদেশ তখন সেখানে ইন্‌কাদের ভাষা-সাহিত্য নিয়ে হাজারো গবেষণা চলবে এ তো আশা করা যায় না। বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্য নিয়ে ভূরিপরিমাণে আলোচনা-গবেষণা চলবে এটাই স্বাস্থ্যের

লক্ষণ। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে, অন্য কোনও বিষয় নিয়ে তার সিকিও হয় নি। সেই গবেষণাকর্ম বহু স্থলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নির্বাহ হয়েছে। এর দ্বারা একটা মাননির্দেশক ডিসিপ্লিনও সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক, সব গবেষণাই সমান দামের নয়, সমান স্বাদেরও নয়। কোনো কোনো গবেষণাগ্রন্থ পৃথুল কলেবর ছাড়া আর কোনো গৌরব বহন করে না। তার না আছে বিষয়-বৈচিত্র্য, আর না আছে চিন্তন ও শিল্পসৌকুমার্য। এইজন্য রসিক-মহলের কাছে বাংলা পি-এইচ. ডি. থীসিস হাসির ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে একটা কথা ভেবে দেখার দরকার আছে। গবেষণাগ্রন্থ রম্যরচনা নয়। এতে ধ্রুপদ ধামারের বোল দরকার হয়, বীরবলী ছাঁদে আর যাই করা যাক গবেষণা চলে না। কাননগোর পোশাক নিশ্চয়ই বরাসনে মানায় না। কিন্তু জমিজরিপের জন্য আঁট-সাঁট পোশাকই দরকার, এলায়িত কোঁচা ও ঢিলে পাঞ্জাবিতে ও-কাজটি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। গবেষণাগ্রন্থ মোদকখণ্ড নয় যে, মিষ্টান্নলোভী বালকের মতো রসিক পাঠকের রসের রসনা তা পাঠ করবার জন্য লালাসিক্ত হয়ে উঠবে। অ্যাংলো-স্যাকসন ভাষাতত্ত্ব ও কেল্‌টিক সাহিত্যে প্রতিফলিত অতীন্দ্রিয় সাধনার সন্ধান যে গ্রন্থে থাকবে, তাতে কি-আমরা গীতিকবিতার রস পেতে চাই, না পেয়ে থাকি? সব দুরূহ কাজের মতো সাহিত্য গবেষণারও কতকগুলি বিশেষ রীতি ও চর্যা অর্থাৎ ডিসিপ্লিন আছে; যে গবেষক সেগুলি মেনে চলেন, এবং প্রাপ্ত তথ্যকে যৌক্তিকতার পারম্পর্যে বিধৃত করে অভীষ্ট পথে চালিত করতে পারেন, তিনিই সার্থক সাহিত্য-গবেষক। যাঁরা রম্যরচনার কমলবনে বিহার করতে উৎসুক এবং সাহিত্য-গবেষণা থেকে রসসাহিত্যের স্বাদ পেতে চান তাঁরা যে দিগভ্রান্ত তাতে সন্দেহ নেই। যিনি যথাস্থানে যথাবস্তু সন্ধান করেন তিনিই প্রাজ্ঞ। বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত মুষ্টিমেয় গবেষক ঐহিক লাভালাভের দিকে না তাকিয়ে নিজ নিজ সাধনায় ডুবে আছেন, আজকের কর্মকুণ্ঠ অলস শিথিলতার দিনে তাঁরা জাতির প্রশংসারই পাত্র। তবে

এ-ও স্বীকার করতে হবে যে, সব সাহিত্য-গবেষকের ক্রান্তদর্শী তৃতীয় নয়ন নেই, সকলের বোধ ও বোধির জগৎ পঞ্চতন্মাত্রের সীমাও ছাড়াতে পারে না। কারও কারও বস্তুসংগ্রহ ও যুক্তিবিন্যাস পৌগণ্ডদশা অতিক্রম করে নি তাও স্বীকার করি। তবে তার জন্য আমি চিন্তিত নই। সদাজাগ্রত মহাকাল শিয়রে দণ্ডায়মান, মানুষের স্মৃতিও দুর্মর নয়; তদুপরি বভুক্ষু কীটপতঙ্গ দন্তে শাণ দিয়ে পুস্তকাধারের কোণে কোণে অপেক্ষা করছে। সাহিত্যজগতে যার বাঁচবার ছাড়পত্র নেই, সে কিছুতেই জীবলীলা রক্ষা করতে পারবে না।

বাঙালীর মনের দৈন্য ঘোচাতে গেলে প্রবন্ধসাহিত্যে নতুন বলাধান প্রয়োজন। মন নামক পদার্থটিকে (অবশ্য মন 'পদার্থ' নয়) যদি আমরা অধিকন্তু বোধে আল্‌নায় টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে চিন্তাভীরুদের গোঠে মিশে যেতে পারি, তা হলে এ-জাতির ভবিষ্যতে মনন সম্পর্কে কোনো উৎকণ্ঠাই থাকবে না। মন থাকলেও হয়তো তার ক্রিয়াশক্তি—মননের অনুশীলন ভবিষ্যতে বাহুল্য বিবেচিত হবে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি কৃপার পাত্র, মননহীন সমাজ আত্মঘাতী। মৃগ ও পক্ষী দেহের দ্বারা বাঁচে, মানুষ বেঁচে থাকে মননের দ্বারা- যে মননের বাহ্যিক প্রকাশ হল প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এই প্রবন্ধ-নিবন্ধের দৈন্যের অর্থ- -ভূগোলে বেঁচে থাকলেও ইতিহাসের পটে আমরা ছায়ামূর্তি হয়ে যাব, তারপরে তারও অস্তিত্ব থাকবে না। গত পঁচিশ বছরের ছন্নছাড়া জীবনযাপন করতে করতেও বাঙালী যে প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মননের চর্চা করেছে এটা আশার কথা, প্রশংসার কথা।

বাংলা সমালোচনার এক শতাব্দী

আধুনিক বাংলা সাহিত্য মূলতঃ দোভাষী; ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঈষৎ পরিচয় না পেলে একালের বাংলা সাহিত্যের যথার্থ রসাস্বাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগের মতো সমালোচনা-সাহিত্যও মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই গড়ে উঠেছে। প্রাচীনযুগে সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হত অলঙ্কার শাস্ত্রীদের অলঙ্ঘ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতের দ্বারা এবং নানা বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও, রসই কাব্যপাঠের একমাত্র ফলশ্রুতি—এ মতবাদ বিশেষজ্ঞ মহলে গৃহীত হয়েছিল, সাধারণ সমাজেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ফলে 'রস' শব্দটি অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ অর্থ ত্যাগ করে জনসমাজে প্রায় সর্বজনবোধ্য এমন সিদ্ধ শব্দে পরিণত হয়েছে যে, শব্দ ও তার ভাবানুষঙ্গ পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো অর্ধনারীশ্বরত্ব লাভ করেছে। বাংলাদেশে অলঙ্কার শাস্ত্রের রসতত্ত্ব ধরেই বৈষ্ণব গোস্বামিগণ শৃঙ্গার রসকে ভক্তির দ্বারা পরিশুদ্ধ করে 'উজ্জ্বলরসে' রূপান্তরিত করেছেন এবং নিত্যবিভাব রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে সর্বসাধ্যসার অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমকেই রসসাধনার চরমোৎকর্ষ বলে মনে করেছেন। বলতে কি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক বিচারপদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত না থাকলেও বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বও অল্পাধিক আলোচিত হয়েছে; এমন কি সাহিত্য বিচারবোধের ধারা স্বল্প-শিক্ষিতমহলেও প্রচলিত ছিল।

যুগান্তর এল উনবিংশ শতাব্দীতে; পশ্চিম সমুদ্রতীর থেকে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া এসে যখন বাঙালীর ভাঙা দরজায় প্রবলভাবে

সাড়া তুলল, তখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রচণ্ড স্রোতোধারা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে লালিত বাঙালীদের সদ্য-জাগ্রত মনোলোকেও আধুনিকতার প্লাবন সৃষ্টি করল। কলেজে-পড়ুয়া ছাত্রসমাজকে ইংরেজী সাহিত্যবিচার-পদ্ধতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল তা বলাই বাহুল্য। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গ্রন্থবিচারপদ্ধতি গড়ে উঠেছে সাময়িকপত্রে-প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা থেকে; কিন্তু যথার্থ পাশ্চাত্ত্য রীতিব সমালোচনা অনুসবণ করেছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রে। তাঁর সামান্য পূর্বে রঙ্গলাল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে সর্বপ্রথম সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেন 'বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে' (১৮৫৪)। কিন্তু রাজেন্দ্রলালই পাশ্চাত্ত্য মতে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার সূচনা কবেছিলেন। বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এঁরাও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার স্বাধীন বুদ্ধি ও যুক্তিপন্থাকে যথাযথভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সমালোচনা পৌগণ্ডদশা ত্যাগ করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতে পারে নি।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যথার্থ বনিয়াদ প্রস্তুত হয়। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে চিন্তাজীবী বাঙালীর চিত্তপ্রবাহ যে খাতে বইতে শুরু করল, তার মূল লক্ষ্য আত্মসমীক্ষা, আত্ম-আবিষ্কার, আত্মপ্রতিষ্ঠা। মূলতঃ হিন্দুর নৈতিক জীবন, পুরাণাশ্রয়ী ঐতিহ্য, আচরণমূলক ধর্মানুশীলন এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত জাতীয়তাবোধের যে বিচিত্র ঐশ্বর্য বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা ত্বরান্বিত হল, তার স্বরূপটি হিন্দুর জীবনবোধের পটভূমিকায় নতুন তাৎপর্য লাভ করল সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা। 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর চেষ্টায় বাংলা সমালোচনা যথার্থই সাহিত্যশাখার একটি বিশেষ শক্তিশালী অঙ্গরূপে উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত বাঙালীর বিস্ময় আকর্ষণ করেছিল। এই যুগটিকে তাই বঙ্কিমচন্দ্র-ভাবিত সাহিত্য বিচারের যুগ বলা যায়।

১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। জৈব মৃত্যু হলেও তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নবরূপে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাঁকে সম্পাদকের দপ্তরে বসে বহু প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা করতে হত। বলা বাহুল্য কাজটি তাঁর পক্ষে আদৌ প্রীতিকর ছিল না। অক্ষম লেখকের ব্যর্থ লেখনী-কণ্ডূয়নে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি বোধ হয় চিন্তা করেছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য-বিচারের কোন মানদণ্ড নেই, এবং নেই বলেই যে-কেউ সাহিত্যসৃষ্টির খোলামাঠে যথেচ্ছা বিচরণ করছে অবাধে এবং অনায়াসে। সাহিত্যসৃষ্টি যে একটা শ্রমসাধ্য শিল্পকর্ম, শুধু প্রতিভা নামক অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম ঐশীশক্তি নয়, একথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কারুকৃৎ হয়ে সর্বাগ্রে বুঝেছিলেন। সাহিত্যের মানদণ্ড সৃষ্টির জন্য সহজাত বিচারবুদ্ধির দ্বারা তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যবিচারের মূল তাৎপর্যগুলিকে নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। অবশ্য সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র এবং রসতত্ত্বের প্রতি তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল না। 'বিবিধ প্রবন্ধে' তাঁর সমালোচনামূলক যে প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে একটি যুক্তিসহ বিচারবুদ্ধি ও উদার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, শেক্‌স্‌পীয়র, বায়রন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সারস্বত তীর্থের সমস্ত যাত্রীই বঙ্কিমচন্দ্রের মনোলোকে ধরা দিয়েছিলেন।

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ—সাহিত্যবিচারের এই দুটি পদ্ধতিই বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। সাহিত্যবিচার সর্বোপরি যে সাহিত্যের রূপরীতি ও রসের বিশ্লেষণ, এবং সাহিত্যের মূল কথা যে রচনাকারের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, একথা বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে সাহিত্যের মারফতে বোঝাতে চেয়েছিলেন। তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের সাহায্যে তিনি বিচার্য বিষয়ের সীমাকে অনেকটা সম্প্রসারিত করেছিলেন। বলাই বাহুল্য তিনি ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়রীয় রসে আকণ্ঠ মগ্ন। সে-যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেই বা না ছিলেন! কাজেই সাহিত্যের মধ্যে বিশাল বিচিত্র ও সংঘর্ষমুখর জীবনের যে বিক্ষুব্ধ চিত্র ফুটে ওঠে, তার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকতর আকর্ষণ ছিল। তাই কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়রের তুলনাপ্রসঙ্গে

তিনি শেক্‌স্‌পীয়রকেই শিরোপা দিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' ইংরেজী সাহিত্যাদর্শের 'high seriousness'-এর দ্বারাও বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যবিচারের মধ্যে সর্বদা একটা বলিষ্ঠ বৃহৎ জীবনের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। কার্লাইল ও ম্যাথু আর্নলড্-এর নীতিঘেঁষা সাহিত্য-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি তাঁকে পরোক্ষ-ভাবে প্রভাবিত করে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। একথা আজ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-সংস্কৃতির আদ্যন্ত বিচার করলে একে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে হবে না। তদানীন্তন ঐতিহাসিক পটভূমিকা, সমাজজীবন, সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার খবর নিলে একথা মেনে নিতে হবে, ঐযুগে এবং ঐ সমাজমানসে হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির অনুরূপ রক্ষণশীল ও আত্মরক্ষাকামী বিশেষ বিকাশ ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত জীবনে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত মানবতন্ত্রী জীবনবাদ অনেকাংশে পরিত্যাগ করে গীতার সঙ্গে কোঁতের জোড়কলম বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাতে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন অথবা সে প্রচেষ্টা উপহসিত হবার যোগ্য কিনা, সে কথার আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। তবে এইটুকুই বোধ হয় বিনা সংশয়েই বলা যেতে পারে যে, হিন্দুর সমাজ ও নীতিবোধের আদর্শের দ্বারা নব্যতন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের মননের জীবন পরিচালিত হলেও সাহিত্যবিচারে তিনি প্রায়শই একটি বলিষ্ঠ জীবনবাদী 'এপিকিউরিয়ন' মত মেনে-চলেছিলেন, যে মতে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও চিত্তশুদ্ধির মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক নেই।

হিন্দুসংস্কারের ঐতিহ্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় যথাসম্ভব পাশ্চাত্ত্য রীতির সংশ্লেষণ ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় কাব্য বিচার-পদ্ধতিকে কোথাও গুরুপদবী দান করেন নি, অলঙ্কার-শাস্ত্রীদের ন্যায়মীমাংসকের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজনরীতি তাঁর মনঃপূত হয় নি। এর দ্বারা সাহিত্যবিচারে তাঁর একটি স্থিতিস্থাপক, উদার ও আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাই তাঁকে অসংশয়ে বাংলা

সমালোচনা সাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য পূর্বেই বলেছি সংস্কৃত রসতত্ত্বের প্রতি তাঁর প্রবল অনীহা বাংলা সমালোচনার পূর্ণ বিকাশধারাকে কিঞ্চিৎ বাধাগ্রস্ত করেছে, একথাও স্বীকার করতে হবে।

১৮৫৪ সালে রঙ্গলাল সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় বাংলা সাহিত্যের পাঠযোগ্যতা প্রচার করলেন তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধে'। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যবিচারপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রও সেই একই রীতি অধিকতর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রয়োগ করেন এবং বাংলা সমালোচনার একটা মোটামুটি পথ দেখিয়ে দেন। তাঁর সমকালে এবং পরেও যাঁরা বাংলা সমালোচনার সূত্র নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই তাঁর মনোভূমিতে দ্বিতীয় জীবনলাভ করেছিলেন। এঁরাই বঙ্গদর্শনগোষ্ঠী। কেউ কেউ বাইরের জ্যোতিষ্ক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই জ্যোতিঃকণার প্রসাদ পেয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্রিকাকে আশ্রয় করে বঙ্কিমপ্রভাবপুষ্ট এই সমস্ত সাহিত্যিক ও সমালোচক সাহিত্যবিচার শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি একদা-বিখ্যাত লেখকদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিশ শতকের শুরুতে—একদিকে বঙ্কিম-সম্প্রদায়, আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্প্রদায়, হিন্দু সমাজে এই যুগে ধর্মকেন্দ্রিক ও আচার-আচরণমূলক সমাজ-আদর্শ যে কী ধরনের প্রাধান্য অর্জন করতে যাচ্ছিল, তা বঙ্কিম-শিষ্যসম্প্রদায়ের সাহিত্যবিচারপদ্ধতির পরিচয় নিলে বোঝা যাবে।

হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্র হয়েও বাংলা রচনা ও সাহিত্যবিচারে একটি স্নিগ্ধমধুর রসবোধ ও পরিমিত বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মনোবিজ্ঞানের আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের দ্বারা খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ও ঈষৎ পরে যাঁরা বাংলার শিক্ষিত সমাজে রুচির নিয়ন্তা হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রবীণ চন্দ্রনাথ বসু ও নবীন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'শকুন্তলা তত্ত্বে'র পণ্ডিতলেখক চন্দ্রনাথ এবং 'সাহিত্য' মাসিকপত্রের বিচক্ষণ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র) সাহিত্যবিচারে নানা তত্ত্ব ও তথ্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অবসানের পর তাঁরাই যেন সাহিত্যবিচার, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের ভার নিলেন। প্রসঙ্গক্রমে 'বঙ্গবাসী' ও 'নব্যভারত' পত্রের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। চন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্র যথাক্রমে হিন্দুর সামাজিক আদর্শ ও প্রচারধর্মী 'সৎসাহিত্যের' দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উদার রসদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলেন– যদিও তাঁদের পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার মূল্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। 'বঙ্গবাসী' পত্রে হিন্দুর সংস্কারশাসিত সমাজ-আদর্শ এবং 'নব্যভারতে'র প্রগতিশীল মতবাদের লড়াই-ও উনিশ শতকের শেষ ক'টি বৎসরে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষিতমহলে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল— সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ও নীতিবোধের উগ্রতা সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ হীনবল হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির কিঞ্চিৎ সূচনা উনিশ শতকের শেষ কয় বৎসরের মধ্যে হলেও বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই তাঁর রসভোগধর্মী নিবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের পর সর্বপ্রথম মৌলিক চিন্তা ও রসদৃষ্টির সমন্বয় আত্মপ্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রসস্রষ্টা ও রসপ্রমাতা —বোধ হয় এই প্রতিভার সার্থক সমন্বয় পাশ্চাত্যের ও ম্যাথু আর্নল্ড্ ও গ্যয়ঠে ভিন্ন অন্য কারও মধ্যে এতটা পূর্ণ-বলয়িতরূপ লাভ করতে পারে নি। মাত্র পনের বৎসর বয়সে (১৮৭৬) রবীন্দ্রনাথ তিনখানি বাংলা কাব্যের ('ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসরসরোজিনী', 'দুঃখসঙ্গিনী') যে নিপুণ সমালোচনা করেছিলেন, তাতেই তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির বিস্ময়কর পরিচয়

পাওয়া যাবে। ১৯০৪ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সমালোচনায় অবতীর্ণ হন, এবং ১৯০৮ সালের মধ্যেই তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন-- একটি Induction পদ্ধতি, আর একটি Deduction পদ্ধতি। প্রথমে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক, সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থাদির রস বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হলেন; এই সময়ে এই প্রকরণ ও রীতিতে তিনি কিছু কিছু বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পৃথক পৃথক গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলেও, পাশ্চাত্ত্য সংশ্লেষণ রীতিরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন— কোনও একটি মৌলিক সমালোচনা পদ্ধতির উপস্থাপন করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, সাহিত্যবিচারের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও রসগ্রাহী মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। তাঁর যৌবনে-রচিত 'সাহিত্য' এবং প্রবীণ বয়সে রচিত 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থ দুটিতে সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণের চেষ্টা সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। সাহিত্যবিচারে তিনি মূলতঃ তিনটি আদর্শ ধরে অগ্রসর হয়েছেন— সৌন্দর্য, আনন্দ ও বিশ্ববোধ। এ-বিষয়ে তিনি লংগাইনাস্, গ্যয়ঠে, ক্রোচে ও ভারতীয় রসবাদীদের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ। বস্তুতঃ বাংলা সমালোচনা-শাখাকে পরিপুষ্ট করা, এর তত্ত্বব্যাখ্যান, মত ও পথ প্রতিষ্ঠা— এর সমস্ত গৌরব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। সমালোচনা শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বসর্বস্ব ব্যাপার নয়, সৌন্দর্য বিশ্লেষণ ও রসের অনুভূতিটি পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়াই যথার্থ সাহিত্যবিচার; রবীন্দ্রনাথের সে পদ্ধতিটি পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলা সমালোচনায় স্বীকৃত হয়েছে। এই যুগে তরুণ লেখকদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্যাদর্শে ও চিন্তায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের বুদ্ধি, যুক্তি ও শিল্পবোধ প্রশংসার যোগ্য—যদিও সুগৃহিণীসুলভ গোছানো ভাবের অভাব তাঁর রচনার অন্যতম ত্রুটি।

অবশ্য বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে রবীন্দ্রনাথকেও নানা বাদপ্রতি-

বাদের সামনে আসতে হয়েছিল। তিনি যে ধর্ম-সংস্পর্শের জীর্ণ বেষ্টনী ত্যাগ করে রসপ্রতীতি ও সৌন্দর্যসম্ভোগের বিশ্বজনীন উদার প্রান্ত থেকে সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে-যুগের যাঁরা নীতি ও সামাজিক সংস্কারকে অধিকতব মান্য করতেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এ-পন্থা অনুমোদন করেন নি। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত কাব্য-সাহিত্যের প্রতিও এঁদের অনেকেরই বিশেষ অনুরাগ ছিল না। ইত্যাদি কারণে তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে বিশ শতকের গোড়ার দিকে নানা বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। ইতি-পূর্বে আমরা চন্দ্রনাথ বসু ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কথা উল্লেখ করেছি। সমাজপতি অবশ্য বিশ শতকেই প্রচণ্ডভাবে রবীন্দ্ররচনার সমালোচনা শুরু করেন। এঁদের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিফলিত সৌন্দর্যে কখনও দুর্নীতির প্রভাব দেখেছিলেন, কখনও তাঁর সৃষ্ট রসসাহিত্য ও সাহিত্য-বিচারপদ্ধতিকে অবাস্তব বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত সমালোচনারীতি সাহিত্যসমাজে মোটামুটি গৃহীত হলেও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র এবং তারও পরে প্রগতিপরায়ণ সাহিত্যচক্র ও পত্রগোষ্ঠী রবীন্দ্রসাহিত্য ও সমালোচনা প্রসঙ্গে নানা আপত্তি তুলেছিলেন। অবশ্য চিরনবীন প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' (১৯১৪) রবীন্দ্রপদ্ধতিকেই স্বীকৃতি দিয়ে সৌন্দর্যের দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দসৃষ্টি— এই মতে দৃঢ়নিবদ্ধ ছিলেন। অপ্রয়োজনের আনন্দই যে শিল্পভোগের মূল কথা তা তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বাস করতেন। এদিক থেকে তিনি পুরোপুরি রবীন্দ্রপন্থী সমালোচক। তাঁর রচনা ও বিচারবোধের মধ্যে ইংরেজ মননশীলতার অচঞ্চল সংযম এবং ফরাসী মননেব তীক্ষ্ণ ধার ও সরসকৌতুক থাকলেও আসলে তিনি রসবাদী সৌন্দর্যরসিক সমালোচক। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নবীন বস্তুতন্ত্রবাদী ও সমাজবাদে-বিশ্বাসী সমালোচকদের রবীন্দ্রবিরোধিতার আস্ফালন সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পরবর্তী-

কালে, বিশ শতকের দুই দশক থেকে ছয় দশক—প্রায় আটচল্লিশ বৎসর ধরে বাংলা সমালোচনায় নানা মত ও পথ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছে। এই প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সমালোচনা—যাকে রবীন্দ্রপর্ব ও উত্তর-রবীন্দ্রপর্ব বলা হয়, তাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বাংলা সমালোচনায় ফ্রয়েড-ইয়ুং-অ্যাড্‌লারপন্থী মনঃসমীক্ষকদের বিশ্লেষণ ধারা, বিশেষতঃ অবদমিত 'লিবিডো' বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার কূটৈষণা সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র প্রেরণা, একথা যেমন বৈচিত্র্য-প্রয়াসী তরুণমহলে ও নতুন মনোবিজ্ঞানী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করল,- তেমনি এই নতুন যুগের সেই সব নতুন মানুষদের সাহিত্যে যৌবরাজ্য দিতে চাইলেন, যারা মানবসমাজে 'প্লেবিয়ান', আর সাহিত্যসত্রে 'পারিয়া'। কারখানার মজতুর এবং ক্ষেতখামারের 'মুনিষ' যে সাহিত্যে ছাড়পত্র পেল, তার পিছনে ছিল দ্বান্দ্বিক নিত্যপরিবর্তনে বিশ্বাসী বস্তুতান্ত্রিক সমালোচকদের নতুন এক জীবন ও ইতিহাসতত্ত্বে দীক্ষা।

আধুনিক সমালোচনায় আমরা স্পষ্টতঃ কয়েকটি মত ও আদর্শের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করতে পারি। যাঁরা অ্যাকাডেমিক আলোচনা ও গবেষণাকে সমালোচনার নীতি-নির্ধারক বলে গ্রহণ করলেন, তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী—এঁদের গ্রন্থাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সাহিত্যবিচারে একটা চিরাচরিত দৃঢ় রীতিকেই গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুধীরকুমার দাশগুপ্তেরও উল্লেখ করা কর্তব্য। এঁরা পাশ্চাত্ত্য সংশ্লেষণ পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের রস, ধ্বনি ইত্যাদির আদর্শে সাহিত্যবিচারে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। অ্যাকাডেমিক শিষ্টসমাজে সম্প্রতি সমালোচনা সম্পর্কে দুটি রীতির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। একদল উনিশ শতকা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিচারপদ্ধতিকে বাংলা সাহিত্যবিচারে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে চান, আর একদল প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রকে বাংলা সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড বলে

গ্রহণ করতে অভিলাষী।* বস্তুতঃ গত শতাব্দীর সাহিত্য সমালোচনায় রসকে সাহিত্যভোগের ফলশ্রুতি বলে ধরা হলেও অলঙ্কারশাস্ত্রকে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পুর্বেও অলঙ্কারশাস্ত্র বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি—যদিও পি. ভি. কানে ও সুশীলকুমার দে ইংরেজীতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন। অতুলচন্দ্র ‘সবুজ পত্রে’ যখন অলঙ্কারশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন থেকেই একদল সমালোচক অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রসতত্ত্ব ও ধ্বনিবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-স্বীকৃত সূত্রই বাংলা সমালোচনার গতি ও স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত করবে। অবশ্য ধ্বনি, রস, বক্রোক্তি, দ্রুতি, দীপ্তি, বিভাব-অনুভাব সঞ্চারীভাব ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দসঙ্কুল অলঙ্কারশাস্ত্র যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য হলেও একমাত্র কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা ছাড়া এ-পদ্ধতি সাধারণ পাঠক ও সমালোচক মহলে জনপ্রিয় হয় নি, শিল্পবিচারের একমাত্র রীতি বলেও গৃহীত হয় নি। এখনও পাশ্চাত্ত্য রীতি বাংলা সমালোচনার গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে য়ুরোপ, বিশেষতঃ ফরাসীদেশে সাহিত্যবিচারপদ্ধতিতে নানা রূপান্তর দেখা দিয়েছে। মনোবিজ্ঞান ও বস্তুদর্শন ত্যাগ করে মানুষের চিন্তা এখন প্রতীতির প্রতীকী-ভাবানুষঙ্গ গ্রহণ করেছে। কোথাও বা বিষণ্নতা-বিলাসী অস্তিত্ববাদী দর্শনের তমোগহ্বরে মানবসত্তা হারিয়ে যেতে বসেছে। বলা বাহুল্য পশ্চিমী সমালোচনার নানা ফ্যাশনের হাওয়া এদেশের সমালোচনার ভরা পালে লেগেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন সাহিত্যসৃষ্টি ও বিচারপদ্ধতির আলোচনা শুরু হয়েছিল, তখনই বাংলা সমালোচনা সীমাবদ্ধ গণ্ডী ত্যাগ করে বিশ্বসাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে হাজিরা দিতে চাইছিল। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ

* পূর্ববর্তী প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে আরও কিছু বলা হয়েছে।

আধুনিক কবি ও সমালোচকেরা বিশ্বসাহিত্য ও সমালোচনার সঙ্গে আধুনিক পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। সুধীন্দ্রনাথের বুদ্ধিকেন্দ্রিক নিঃস্পৃহ সংযম, বুদ্ধদেবের আত্মকেন্দ্রিক লীরিক আবেগ, বিষ্ণু দে-র সমাজভিত্তিক চিন্তাদর্শন, গোপাল হালদার প্রভৃতি বস্তুবাদী চিন্তাশীল সমালোচকদের গণসংগ্রামের পটভূমিকায় সাহিত্যের কুলপরিচয় বুঝে নেবার চেষ্টা—ইত্যাদি নানা ধরনের আলোচনা-পদ্ধতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঈষৎ পূর্ব থেকেই আপন অধিকার স্থাপনে উৎসাহিত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি বাংলা সমালোচনায় একদিকে যেমন গবেষণা, তথ্য-প্রিয়তা প্রভৃতি অ্যাকাডেমিক তত্ত্বালোচনা সাগ্রহে স্বীকৃত হচ্ছে, তেমনি আবার প্রচলিত অনড়-আদর্শ—যাকে অধুনা পাশ্চাত্ত্য জগতে "establishment" বলা হচ্ছে, তার যৌক্তিকতা নিয়েও কেউ কেউ ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছেন। এতদিন ধরে সাহিত্যবিচারে যে পদ্ধতি চলছিল, শ্রেষ্ঠ কালজয়ী সাহিত্য বলে যে সমস্ত গ্রন্থকে আমরা ভক্তি-প্রশংসার মালা-চন্দনে অভিষিক্ত করেছি এঁরা তারই ভালে পঙ্কতিলক লেপে দিতে বদ্ধপরিকর। Tradition-কে এরা আর পাঁচটা 'জাতীয়' কুসংস্কারের মতো ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে দেশকালহীন বিশ্বমানবতার নিরালম্বলোকে অমূল-তরুর শাখায় শাখায় বায়বীয় অর্কিড ঝোলাতে অতিশয় তৎপর। অতঃপব বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য কোন্ পথে যাবে, বিশ্ব-সমালোচনার নানা বাদ-প্রতিবাদের খোলা মাঠে এসে দাঁড়াবে, না "বাংলা সমালোচনা" নামক এ-দেশীয় কোনও একটা বিশেষ বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করবে, তার স্বরূপ নির্ধারণ সহজ নয়।

বাংলা নাটক প্রসঙ্গে

বাংলার বাইরে "নটো-পটো" বলে বাঙালীর কিছু খ্যাতি এখনও অব্যাহত আছে। 'নটো' অর্থাৎ অভিনয়ে এবং 'পটো' অর্থাৎ চারুশিল্পে সমগ্র ভারত বাঙালীকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, কিছু শ্রদ্ধা করে থাকে। বোম্বাই-এর গ্র্যান্ট স্ট্রীটে সর্বপ্রথম মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হয়, কলকাতার অভিনয়ের বিশ-পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু তবু নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিক রীতি, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়, নাটক ও অভিনয়ে নানা 'স্কুল'-এর অবলম্বিত অভিনব প্রকরণ এসব বিচার করলে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগর নিশ্চয় কলকাতার কাছে ম্লান হয়ে যাবে। চারুশিল্পের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। রাজা রবিবর্মা একদা বাস্তব ধরনের ছবি এঁকে সারা ভারতেই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন যদিও এখন তা আমাদের শুধু হাস্যোদ্রেক করে। তাঁর 'গঙ্গাবতরণ' বা 'বিশ্বামিত্র-মেনকা,' 'রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ' এখন কেমন যেন শিশুসুলভ মনে হয়। বিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালী শিল্পীরা সারা ভারতকেই চারুশিল্প ও ভাস্কর্যে নতুন পথ দেখিয়েছেন। এখন বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লীর চারুশিল্পীরা কলকাতাগোষ্ঠীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত যদিও কেউ কেউ অধমর্ণত্ব স্বীকারে কিছু সঙ্কোচ বোধ করে থাকেন। সে যাই হোক, সত্যের খাতিরে মানতেই হবে যে, অভিনয়, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্প সম্বন্ধে বাঙালীর রুচি অতিশয় মার্জিত ও সাত্ত্বিক। অবশ্য আমরা গত বিশ-পঁচিশ বৎসরকে হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছি। কারণ এখন বাঙালী অধোগতির ঢালু পথ বেয়ে নেমে চলেছে, সারাভারতের দাক্ষিণ্যের

দুয়ার অনেক আগেই তার মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেছে। তবু নাটক রচনা ও অভিনয়ে বাঙালীর বিশেষ ধরনের কৃতিত্বকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছে না।

(উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা নাটক রচনা শুরু হয়। তার আগে ছিল যাত্রাগান। ইংরেজের নাট্যমঞ্চের অনুকরণেই কলকাতায় নাটকাভিনয় শুরু হয় উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে—অবশ্য সবই ছিল ইংরেজী নাটক। পরে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন, বাংলা নাটকেই বাঙালীর যথার্থ আনন্দ। সেই সময় থেকে, অর্থাৎ মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের পর থেকে যথার্থ বাংলা নাটকের স্বাদ কিরকম তা বাঙালী দর্শকেরা অনুভব করল। তারাচরণ শিকদার (ভদ্রার্জুন), জি. সি. গুপ্ত ('কীর্তিবিলাস'), রামনারায়ণ তর্করত্ন ('কুলীন-কুলসর্বস্ব')—এঁরা সংলাপধর্মী কিছু কিছু রচনাকর্ম করেছিলেন বটে, কিন্তু তার অধিকাংশই নাটকত্ব লাভ করতে পারে নি। তবু এরই মধ্যে 'নাটুকে রামনারায়ণ' পুরাতন ধরনের নাটক-প্রহসন লিখে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁদের নাটক রচনার পঞ্চাশ বছর আগে লেবেডেফ নামে এক ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে রুশ যুবক কলকাতায় দেশী নট-নটী নিয়ে বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়েছিলেন। একটির নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। অপরটির বাংলা নাম জানা যায় নি। দু'খানাই বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ। 'কাল্পনিক সংবদল' সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (সম্পাদনা : ডঃ মদনমোহন গোস্বামী) থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর ভাষা খঞ্জ, ভাব অস্পষ্ট, নাটকীয়তা নামমাত্র। কিন্তু লেবেডেফ স্বল্পকাল এদেশে অবস্থান করে বুঝেছিলেন যে, রং-তামাসা, ভাঁড়ামি ও সঙ্গীতবাহুল্য না থাকলে নাটকাভিনয় বাঙালীর ভালো লাগে না। তিনি সম্ভবতঃ সেকালের যাত্রাগান থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু যাত্রাগানের মূল সুর যে পৌরাণিক ও ধর্মীয় ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এ কথাটার গূঢ় তাৎপর্য বোধহয় তিনি ধরতে পারেন নি।

পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে, পৌরাণিক নাটকের প্রাধান্য সত্ত্বেও (ভদ্রার্জুন, কৌরববিয়োগ, শর্মিষ্ঠা) তদানীন্তন সামাজিক সমস্যাও কোনও কোনও নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছিল। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ও 'নবনাটক', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বিশেষ ধরনের সামাজিক সমস্যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল এবং অভিনয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন বসু—এঁরা গিরিশচন্দ্রের পূর্বেই বাংলা নাটকের বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হবার পর বাংলা নাটকের জনপ্রিয়তা অতিদ্রুত বেড়ে গেল। গিরিশচন্দ্রের শিষ্য-স্থানীয় অমৃতলাল বসু শুধু কুশলী নট হিসেবেই নয়, রঙ্গনাট্যলেখক রূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক উত্তাপ বাঙালীকে স্পর্শ করলে তার আঁচ নাটককেও প্রভাবিত করল। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ—এঁরা স্বদেশী আবেগকে ভিত্তি করে ইতিহাসের ছায়াধূসর প্রান্তরে স্বচ্ছন্দ পদচারণা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে আসা স্বাভাবিক। কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত তিনি নানা ধরনের নাটক লিখেছেন, নিজে অভিনয় করেছেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরও অভিনয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। নাটকের কোন কোন শাখায় তিনি অসাধারণ এবং মৌলিক, বিশেষতঃ কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য ও রূপক-সাংকেতিক নাটকে। তবে সাধারণতঃ যাকে আমরা নাটকত্ব, অর্থাৎ ঘটনাসংঘাত বলি, তাঁর অধিকাংশ নাটকে তা যেন ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ দর্শক নাটক থেকে ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্রে চরিত্রে দ্বন্দ্ব, মানসিক দ্বৈরথ—এই সব চায়। শেক্সপীয়রের নাটক আস্বাদন করে মাঝারি ধরনের শিক্ষিত বাঙালী নাটক বলতে তাই বুঝত। এমন কি, অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত অধ্যাপকও রবীন্দ্র-নাটককে যথার্থ নাটক বলে মানতে চাইতেন না। একবার ইংরেজী

সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. এল. ব্যানার্জী) রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' দেখবার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি টমসন সাহেবকে বলেছিলেন যে, উক্ত নাটক একপ্রকার শিল্প হলেও যথার্থ নাটক হিসেবে দুর্বল। সেকালে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' কিছু অভিনয় খ্যাতি অর্জন করেছিল, 'চিরকুমারসভা' 'শেষরক্ষা'—এই মার্জিত কৌতুকরসের নাটক বিদগ্ধমহলে সাহিত্য হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি পেলেও জনসাধারণ এসব উচ্চভাবের নাটক থেকে দূরে দূরেই থাকত। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের নাটকে যে চড়াসুরের আমদানি করেছিলেন, নাট্যামোদী জনসাধারণের রসরুচি তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁরা নাটমঞ্চের উপরে অনুষ্ঠিত নাটকের প্রত্যক্ষ ঘটনার দিকে যতটা কৌতূহলী হয়েছিলেন, নেপথ্যের ব্যঞ্জনাসঞ্চারী ইঙ্গিতের দিকে ততটা অবহিত ছিলেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অতি দ্রুত বাংলা নাটকের রূপ, রীতি ও উপাদান বদলে যাচ্ছে। সেকালে শেক্সপীয়র, শিলার ও মলিয়ারের নাটকই নাট্যকারদের কল্পনাকে নাট্যরসে ভরিয়ে তুলত। একালের নাট্যকারগণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনৈতিক সমস্যা, মনস্তত্ত্বের বিকার—এই সব সাম্প্রতিক ব্যাপার, যা আমাদের চিন্তাকে সবসময়ে ভরিয়ে রাখে, তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। একটা কোন সমস্যা, তা সে ব্যক্তি-ঘটিত হোক অথবা সমাজঘটিত হোক, আজকের নাট্যকার ও দর্শককে সমভাবে উত্তেজিত করেছে। আমেরিকান, ফরাসী, রুশ, জর্মন নাট্যান্দোলন বাংলাদেশেও এসে পৌঁছেছে,—বাংলা নাটক এবার যথার্থই বিশ্বনাট্য-আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেকালে যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্রের নাটক অনেক অবাঙালী নাট্যকারকে স্ব-স্ব ভাষায় নাটক রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অত্যন্ত আনন্দের কথা—একালের তরুণ বাঙালী নাট্যকারেরাও দিল্লী, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছেন। অবশ্য হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী নাট্যকারদের কয়েকটি উচ্চ নাট্যগুণসমন্বিত নাটক অনূদিত হয়ে বাঙালী দর্শকদেরও খুশি করেছে।

এ যুগে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নাট্যান্দোলন বাংলার সঙ্গে বিশেষ সংযোগ রেখে অগ্রসর হচ্ছে। কাব্য-উপন্যাসের চেয়ে নাটকের ব্যাপারেই যেন নানা প্রদেশের রসিক সামাজিক ও শিল্পী-কলাকুশলীর দল সর্বভারতীয় প্রাঙ্গণে মিলিত হয়েছেন।

তবে এই প্রসঙ্গে আমার মনে কতকগুলি সংশয় যাতায়াত করছে। নাটকাভিনয় আজ আনন্দভোগের যে একটি সর্বজনীন 'মিডিয়াম' তাতে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক নাটকের জোয়ার শুধু কলকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লীই নয়—শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে। বাংলার যাত্রা ও মহারাষ্ট্রের 'তমাসা'-র লোকাভিনয়ে এই আধুনিক বিষয় ও রূপরীতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলা নাটক প্রায় সওয়া শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কাব্যকবিতা, কথা সাহিত্য ও নিবন্ধসাহিত্যে বাংলাদেশে যে ধরনের প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার উদয় হয়েছে, নাটকে কি সেরকম কোন প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়? কাব্যকবিতায় মধুসূদন, বিহারীলাল, উনিশ শতকের গীতিকবি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র- নিবন্ধসাহিত্যে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় যেভাবে অসাধারণ নৈপুণ্যের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সমগ্র সাহিত্যকে ছত্রছায়াতলে ধারণ করে আছেন, বাংলা নাটকে কি সেই রকম প্রতিভার ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়?

নাটক এক ধরনের মিশ্র সাহিত্য, অর্থাৎ শুধু একাকী পড়ে আস্বাদ পাওয়া বোধহয় নাটক রচনার উদ্দেশ্য নয়। অভিনয় হওয়াই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং সেইজন্য রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ নাটককে জনরুচির অনুকূল করে তুলবার জন্য প্রায়শই নাটকের চেয়ে অতি-নাটকের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েন, নাট্যকারগণও তার প্রলোভন ভুলতে পারেন না। ফলে অনেক সময়ে সস্তা হাততালির মোহে নাট্যকার সুলভ ব্যাপারের দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন। বাংলা নাটকের গোড়ার দিকে

কিন্তু জনবল্লভতার দিকে নাট্যকার বেশী দৃষ্টি দেন নি। ন্যাশনাল থিয়েটার ও অন্যান্য পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের পর রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ জনপ্রিয়তার দিকেই নাটকাভিনয়কে পরিচালিত করতে শুরু করলেন। অথচ উনিশ শতকের শেষ দিকে নাটমঞ্চ একটি জাতীয় ইনস্টিট্যুইশনে পরিণত হয়েছিল, বিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশকেও নাটকাভিনয়কে অবলম্বন করে বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণীরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ নিজের জাতি ও সংস্কারকে চিনে নেবার জন্য বাংলা নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সকলেই স্বীকার করবেন, কিন্তু একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, অতিশয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বাংলা নাটক কাব্যকবিতা ও কথাসাহিত্যের মতো প্রথম শ্রেণীকে স্পর্শ করতে পারে নি। এর কারণ কি, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে।

ব্যক্তিগত আবেগ যা লীরিকের প্রাণধর্ম, তা কিন্তু নাটকের পক্ষে মারাত্মক। নাটক প্রধানতঃ বস্তুধর্মী শিল্প, রচনাকার থাকেন নেপথ্যে। চরিত্রগুলি যদি নাট্যকারের মতামতের বাহন হয়ে ওঠে, তা হলে তার অন্যান্য নানা গুণ সত্ত্বেও নাট্যগুণ যে বিশেষভাবে খর্ব হয়ে পড়ে তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালীর জাতিগত প্রবণতা লীরিকের দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছে। আবেগ এজাতির একপ্রকার কুলধর্ম। সেই পুরাতন কালের চর্যাগান, গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে, যেখানে আবেগের অতিরেক, সেখানেই বাঙালী আত্মস্থ। এই লীরিক রসের অতি-প্রাধান্যই কি বাঙালীকে নাটকরচনার ক্ষেত্রে পুরো সাফল্য দিতে পারে নি? বোধহয় দীনবন্ধু কিঞ্চিৎ পরিমাণে যথার্থ নাট্যরসের শরিক ছিলেন। তাঁর নাটক ও প্রহসনে অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু যাকে যথার্থ নাট্যবোধ বলে তা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। Playwright গিরিশচন্দ্র অভিনেতা, মঞ্চ-পরিচালক, অভিনয়-শিক্ষক। সাধারণ শ্রেণীর দর্শকদের নাটক দেখার ভোজ্যহিসেবে তাঁকে রাতারাতি নাটক, প্রহসন ও পঞ্চরং লিখতে

হয়েছে। যে রচনা মুখ্যতঃ প্রয়োজনের তাড়নায় লেখা, তার শিল্পগুণ যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তাঁর রচিত নাটক-নাটিকা-প্রহসনের সংখ্যা শতাধিক। এর সংখ্যা বিশ খানির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে হয়তো তাঁর রচনা যথার্থ নাটক হয়ে উঠতে পারত। তাঁর একটা ক্রটি যেমন অতিমাত্রায় দর্শকচেতনা, তেমনি বাঙালীর পৌরাণিক মানসের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়াতে তাঁর বহু নাটক বিশুদ্ধ নাটক হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে নাটক রচনার অভিজ্ঞতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি সুলভ আবেগ ও উচ্চকণ্ঠ নীতির ঘোষণা ভুলতে পারেন নি। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসকে দু-চার স্থানে রদবদল করলেও তিনি মোটামুটি ইতিহাসের ঐতিহাসিক রস ঠিক ধরেছিলেন। তবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর এই নাটকগুলি রচিত বলে এতে উত্তাপ যত বেশী দীপ্তি ততটা নয়। সে যাই হোক, গিরিশচন্দ্র নটগুরু বলে নাট্যামোদীদের অসীম শ্রদ্ধা লাভ করলেও বাংলা নাটকে এমন কোন অভিনবত্ব সঞ্চার করতে পারেন নি, যাতে মনে হবে, উত্তরকালেও নিছক শিল্পগুণেই সজীব থাকবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক নাটমঞ্চের জঠরপূর্তির জন্য নাট্যরচনায় অবতীর্ণ হন নি। শেক্সপীয়র বিশেষত শিলারের চড়াসুর আমদানি করে একদা তিনি সারা বাংলাদেশ মাতিয়ে তুলেছিলেন, এমনকি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি অনুবাদের দ্বারা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি উনিশ-বিশ শতকের য়ুরোপীয় নাট্যান্দোলন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিন্তু তাঁর নাটকও কৃত্রিম চড়াসুরের জন্য ক্ষণকালীন উত্তেজনার পর ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। ভাষার আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা তাঁর নাট্যরসকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর কোনও চরিত্রই যেন স্বাভাবিক সহজভাবে কথা বলতে পারে না। শিলারে যেটা মানিয়ে গেছে, একালের নাটকে তা একেবারে খাপ খায় না। চাণক্য ও শাজাহানের সংলাপ একালের রসিক দর্শককে কত-টুকু তৃপ্তি দেবে তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ঐ একই আদর্শ ধরে চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত। সামান্য যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার জন্য শিশিরকুমারের দক্ষ অভিনয়ই একমাত্র দায়ী। তা নইলে 'আলমগীরে'র মতো অতি দুর্বল নাটক বহু রজনী অভিনীত হয়েছিল কী ভাবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই নানা সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক অভিনয়ের নতুন কলারীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা চালিয়ে বাংলা নাটককে শ্যামবাজার স্ট্রীটের কবল থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছে। তার সঙ্গে অবশ্য রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতাও যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। তবু মুমূর্ষু নাটমঞ্চ ও স্থবির নাট্যসাহিত্যকে আবার প্রাণরসে সজীব করে তোলার জন্য একালের সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতির যোগ্য। এই নবীন নাট্যগোষ্ঠীই রবীন্দ্রনাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছেন। এর পূর্বে, রবীন্দ্রনাটক যথেষ্ট অভিনয়যোগ্য নয়, এইরকম ধারণা মঞ্চ-পরিচালকদের মাথায় স্থায়ী আসন পেতেছিল, কিন্তু দক্ষ অভিনয়ে দেখা গেল, রবীন্দ্রনাটকের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সহৃদয় দর্শকগণ স্বাভাবিক রস-বোধের দ্বারাই অবধারণ করতে পারেন।

কিন্তু একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে, বাংলা নাটক যথেষ্ট অভিনয়সাফল্য অর্জন করলেও সাহিত্যাংশে এখনও এ শাখা দুর্বল। এখন বিদেশী নাটকের বিষয়বস্তু, রচনারীতি ও আঙ্গিক সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও অভিনয়কে খুব প্রভাবিত করেছে, কিন্তু মৌলিক নাটক ক'খানা রচিত হয়েছে তা বোধহয় আঙুল গুণে বলা যায়। সাম্প্রতিক তরুণ কবি ও ঔপন্যাসিকেরা অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু নাটকে এখনও সার্থক নাট্যকারের পদধ্বনি শোনা যায় নি। একালের কবিরা, কেউ কেউ কবিতার কলমে নাটক লিখে এক নতুন ধরনের কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের রীতি প্রচলন করেছেন। এগুলির শিল্পগত মূল্য এখনও পরীক্ষার স্তরে আছে।

একালের বাংলা নাটকে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও কোনও একজন নাট্যকারকে মৌলিক প্রতিভার অধিকারী বলে একবাক্যে স্বীকার করা যাচ্ছে না। হয়তো ভবিষ্যতে এমন নাট্যকারের আবির্ভাব হবে যিনি নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে অবতীর্ণ হবেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য

ইদানীং গোটা দেশেই শিক্ষাসংস্কার নিয়ে বিষম হট্টগোল শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা যখন হস্তামলকে পরিণত হল, তখন বকেয়া আমলের জীর্ণ-শীর্ণ বিধিবিধানকে আমূল বদলে নেবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগাই স্বাভাবিক। এবং শিক্ষার রীতি-নীতি ও প্রকার-প্রকরণকে যে অতি দ্রুতবেগে পালটে নেবার জন্য আমাদের রাজপুরুষ ও শিক্ষাবৃক্ষারূঢ় দেবতারা মরীয়া হয়ে উঠবেন, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? সকলেই জানেন দুনিয়ার সেরা দেশগুলোর সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামতে হলে আমাদের মতো শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যায় অনগ্রসর জাতির পক্ষে টেক্‌নলজির সিন্ধবাদ দৈত্যের শরণ নিতে হবে। বহুকাল আগে শ্রীরামপুরের কেরী সাহেব ভারতের শিক্ষারীতিকে ভারতীয় করণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আমাদের উনিশ শতকী শিক্ষার কর্ণধারেরা ইটন-হ্যারো আর অক্‌স্‌ফোর্ড-কেমব্রিজের আদর্শে ভারতীয় শিক্ষার কলেবর গঠনের চেষ্টা করেছিলেন; বিগত শতাব্দীর শিক্ষা সাধারণতঃ কলাবিদ্যা ও সাহিত্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল—ইদানীং যাকে 'হিউম্যানিটিজ্' বলা হচ্ছে। এই শিক্ষা ইংরেজী ভাষার দূতিয়ালীর জন্য খুবই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয়েছিল। কিন্তু একথাও স্মরণযোগ্য, এই শিক্ষাই—বিদেশী ভাষার মারফতে হলেও স্বাধীন ভারতকে গড়ে তুলেছে; রাষ্ট্রনীতি সমাজদর্শন, আত্মনিরীক্ষা, ইতিহাসচেতনা, স্বাদেশিকতা—এক কথায় জীবনের সর্বাঙ্গীণ জাগরণ, যা উনিশ ও বিশ শতককে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে, তার মূলে আছে ইংরেজী ভাষাবাহী সাহিত্য-কলা-প্রধান

মননপ্রণালী। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর থেকে রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ-তিলক-গোখেল থেকে গান্ধিজী-নেতাজী এই বিশেষ ধরনের সাহিত্য-কলাশ্রিত শিক্ষাকেই প্রাণের ধাত্রী বলে গণ্য করেছিলেন। উনিশ ও বিশ শতকের কিছুকাল পর্যন্ত ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে ইউরোপ-আমেরিকার সাধারণলোকে এদেশকে সাপ-বাঘ-হাতী আর দড়ি-খেলোয়াড় যাদুকরের দেশ বলে কৌতুক-বিস্ময়মিশ্রিত অবজ্ঞা করলেও পাশ্চাত্ত্যের যাঁরা একটু মননপ্রকর্ষের চর্চা করতেন, তাঁরা যে-ভারতকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেন, সে ভারত ছিল উনিশ শতকী সাহিত্য-কলা শিক্ষায় পারঙ্গম।

তারপর এল পালা বদলের ঝড়ো হাওয়া। স্বাধীনতা এল। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণের দিকে রাষ্ট্রধুরন্ধরদের সতর্ক দৃষ্টি পড়েছে। মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান-চারুকলা-যন্ত্রবিদ্যা টেক্‌নলজির ঢালাও ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রাচুর্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক শিক্ষাধিনায়কগণ টেক্‌নলজি ও যন্ত্রবিদ্যার দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছেন; এঁরা সাহিত্য ও কলাকেন্দ্রিক শিক্ষাকে ঈষৎ অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখে "নম যন্ত্র নম যন্ত্র" বলে বিশ্বকর্মার পূজো চড়াচ্ছেন মহোৎসাহে। কারখানার চিমনি থেকে দেবোদ্দেশে আবরত হোমধূম নির্গত হচ্ছে; হাতুড়ি-নেহাইয়ের 'ঠকা ঠাঁই ঠাঁই' শব্দে দেবারতির কাঁসরঘণ্টা বাজছে, আটটা পাঁচটায় কাজে যাবার বাঁশী বেজে শঙ্খধ্বনির অনুকরণ করছে। এ-সব ভাল লক্ষণ। খঞ্জ দেশ অকস্মাৎ উল্লম্ফনে প্রস্তুত হলে যন্ত্রবিদ্যার 'বলা-অতিবলা' মন্ত্রের সাধন করতেই হবে। কিন্তু একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা বোধ হয় উচিত। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা আজ যে রকম টেক্‌নলজির কুক্ষিগত হয়েছে, তাতে ভারত-ভাগ্যবিধাতার ভবিষ্যৎ ভেবে কিছু আশঙ্কার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যবোধ-বর্জিত বুদ্ধিমান 'এফিশিয়েন্ট' যন্ত্রধর্মী কারিগরে দেশ ছেয়ে গেলে তাতে গোটা জাতিটাই জাহান্নামের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। এখন যারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে বিজ্ঞান বা যন্ত্রবিদ্যায় নিপুণতা অর্জন করতে যাবে,

তাদের আর ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনই হবে না। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা শুদ্ধ করে বাংলাটাও লিখতে শিখল না, তারা অচিরে সাহিত্য ও কলা চর্চা ছেড়ে দেবে কেন না তার প্রয়োজন হবে না। ফলে গোটা দেশেই হৃদয়হীন, উচ্চতর কল্পনা ও প্রাণরস বর্জিত একটা যান্ত্রিক অটোমেটনের সৃষ্টি হবে, সৃষ্টি হবে রক্তমাংসের রবটের। এরা যন্ত্রের মতো কাজ করবে, উপরওয়ালার বোতামের চাপে তাসের দেশের তুরি-তিরির মতো তালে তালে পা ফেলে চলবে। কিন্তু যাকে মনুষ্যত্ব বলে, তার আশু বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে। যাকে এখন 'হিউম্যানিটিজ' বলে স্কুলের সবচেয়ে ওঁছা ঘরে অনাদরে ফেলে রাখা হয়েছে—শুধু তাই-ই মানুষকে টেক্‌নলজির ময়দানবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

তা বলে আমরা টেক্‌নলজির অনর্থক পরিবাদ ক'রে অপরিণামদর্শী ও অবান্তর কলাচর্চার সমর্থন করছি না। আঁখক্ষেতকে রক্ষা করবার জন্য যেমন কৃষাণেরা পণ্ডাসুরের পূজো করে, আমরাও সেই রকম শিল্প-কলা-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শনকে বাঁচাবার জন্য যন্ত্রাসুরের পূজো দেবার প্রস্তাব করছি। যন্ত্র, কারিগরি বিদ্যা, টেক্‌নলজি—এ-সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, এবং গোটা জাতটাকে টেনে তুলতে হলে এই রকম যন্ত্রতন্ত্রের সাধনপ্রণালী আয়ত্ত করতেই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর একে তো চারিত্রভ্রষ্ট, নীতিহীন, নিষ্ঠাবর্জিত, নাস্তিক্যবাদী 'প্র্যাগমাটিজ্‌ম্' রাষ্ট্রনীতির ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একমাত্র ভোটমন্ত্র হয়েছে, এখন যদি আবার কলাসাহিত্যপ্রধান শিক্ষাকে অবহেলা করে অয়স্‌কে অয়স্কান্ত করবার জন্য 'তন্‌-মন' অর্পণ করি, তা হলে জাতটা দাঁড়াবে কোথায়? মনে রাখতে হবে, গুহামানবও টেকনলজিতে কম পারদর্শী ছিল না; কাঠের গুঁড়িকে জলে ভাসিয়ে নদী পার হওয়া, বা গাছের ডালপালা পাকিয়ে ঝুলন্ত সাঁকোর সাহায্যে যথেচ্ছা যাওয়া আসা করা নিশ্চই টেক্‌নলজির গোড়ার দিকের কথা—এবং টেক্‌নলজির

ইতিহাসের প্রাথমিক ভূমিকা। কিন্তু মানবসত্তার ইতিহাস তো টেক্‌নলজির অগ্রগমনের ইতিহাস নয়; মানুষের সভ্যতা আসলে মানুষের কথা। টেক্‌নলজি সেই মানবসভ্যতার ইঁট-কাঠ-পাথর। সাহিত্য ও সাহিত্য-আশ্রিত শিক্ষাই আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্ব দেবে – আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্ণধারদের কর্ণযুগলে একথাটা যত তাড়াতাড়ি প্রবেশ করবে ততই জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে মঙ্গল দেখা দেবে। এমন কি যাঁরা কারুবিজ্ঞানী, বাস্তুবিদ বা অন্যকোন ব্যবহারিক বিজ্ঞানে কর্মব্যস্ত, তাঁরাও যদি সাহিত্য কলা ইতিহাস দর্শনকে অপ্রয়োজনের, অলসের, কল্পনার ব্যাপার বলে শুধু কারখানা ঘর আর ল্যাবরেটারীকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় মনে করেন, তা হলে তাঁরাও অচিরে আনন্দহীন আবেগহীন শুষ্ক নীরস রুটিনবাঁধা জীবনে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। কারখানাকক্ষ এবং শয়ন-মন্দির, প্যার্সোনাল সেক্রেটারী এবং সহধর্মিণী – এদের মধ্যে যে মূলত পার্থক্য আছে সেটা তো স্বীকার করতে হবে।

টেক্‌নলজি ও প্রয়োগবিজ্ঞানের দিকে ভারত সরকার সম্প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য আজকাল অতিদ্রুত বেগে দেশকে অন্নবস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে গেলে এই দুটি দেবতার ভোগের মাত্রা কিছু বাড়াতে হবে, তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখতে না পারলে শুধু জাপানের মতো কারুবিদ্যা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রয়োজনের সুরাহা হলেও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকে ভাঁটা পড়ার সম্ভাবনা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তো হাতে হাতে নগদ কড়ি দেয় না; সেখানে একনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিল্পসাধকের মতো 'মমকার' ত্যাগ করে আত্মনিবেদন করতে হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী ও কলারসিকে কোন তফাৎ নেই। দুজনেই উদরভরণের জন্য ব্যস্ত নন। দুজনের হাতেই একই রঙের তুলি, একটির নাম আনন্দ, অপরটির নাম কৌতূহল। দুজনেই প্রয়োজনের তাগিদ ছেড়ে অপ্রয়োজনের অনুসন্ধিৎসায় উধাও। কিন্তু টেক্‌নলজির তেল-নুন-লকড়ীর দিকে সব

প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হ'লে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্থান হবে যাতুঘরে, জীবন্ত প্রাণের মধ্যে নয়।

এই জন্য আমরা বলতে চাই যে, শিক্ষা সংস্কারের নাম করে এবং অর্থ ব্যয় করে এই যে বিরাট বিরাট স্কুলবাড়ী তৈরী হচ্ছে, আসলে এখান থেকে কোন্ ধরনের শিক্ষা বিতরিত হবে? আগে ভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারত তৈরি করে পাটোয়ারী বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীসভার রদবদল হলে শিক্ষাখাতে টাকাকড়ির হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু ইমারত তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সরকার বদলালেও না। এই হিসাবী বুদ্ধি তারিফের যোগ্য। অবশ্য অনেকে বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সেই তোতা পাখীটার খাঁচার মতো এই তো বেশ মস্ত শিক্ষাভবন নির্মিত হয়েছে। আর কি চাই? এবার ঢালাও শিক্ষা চালাও। কিন্তু নিন্দুকের তো অভাব নেই। তারা বলবে, মার্কিনী ধাঁচে বিরাট বিরাট স্কুল বাড়া করে এতো টাকার শ্রাদ্ধ কি না করলেই চলছিল না? কিন্তু দেশটাকে যে রাতারাতি টেকনলজির মায়াপুরী করে তুলতে হবে। কাজেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও, ইস্কুল থেকেই টেক্‌নলজির বিদ্যা শুরু হোক। যে বয়সে ছেলে জগৎ জানবে পুঁথি পত্রের মধ্যে, জীবনের মহৎ মূল্য-বোধগুলিকে আয়ত্ত করবে সাহিত্য ইতিহাস থেকে, সেই বয়সে তাকে লায়েক করা হবে অর্থকরী কারিগরী বিদ্যায়। ফলে গোটা জাতটাই একটা ইহসর্বস্ব টেক্‌নিশিয়ান হয়ে উঠবে।

এখন পথ কোথায়? মূল্যমানের পরিমাণবোধ রক্ষা করে টেক্‌নলজি ও কারুবিজ্ঞানের যথাযথ স্থান নির্দেশই হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ। শিল্প সাহিত্যকে আবার জীবন ও শিক্ষার কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন না করলে এ জাতির আশু উন্নতি হলেও অদূর ভবিষ্যতে একটা বড় রকমের আত্মিক অধঃপতন হবে। 'আত্মিক' কথাটায় আঁৎকে ওঠবার কারণ নেই। আত্মিক বলতে আমরা মানুষের গোটা অধিমানসকে বলছি। সেই আত্মিক মানুষই যথার্থ মানুষ, অশিক্ষিত বাউলকবি যাকে 'মনের

মানুষ' বলেছেন। অবশ্য মনোবিজ্ঞানীর মতো কেউ যদি মনটাকেও জৈব মস্তিষ্কের দেহঘটিত ক্রিয়ামাত্র বলে এড়িয়ে যেতে চান, তা হলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়। তবু মন থাকবে, এবং মন বলতে একক ব্যক্তিমন। টেক্‌নলজির রোলার চালিয়ে সব মনকে এক ছাঁচে গড়া যায় না, আমাদের শিক্ষাবিধাতারা এ কথাটা কবে বুঝবেন?

শরৎপ্রসঙ্গ

আমার বাল্যস্মৃতি ও শরৎচন্দ্র ঃ

শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিক যখন দেশে-বিদেশে পুরাদমে চলিতেছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে আমার বাল্যকালের দু' চারটি কথা বলিতে পারি। পাঠক-পাঠিকারা অপরাধ লইবেন না, তাহার সঙ্গে আমার কথাও কিছুটা আসিয়া যাইতে পারে।

তখন আমার বয়স তেরো বৎসর। সবে তখন পাঠ্য কেতাবের ফাঁকে ফাঁকে অপাঠ্য গ্রন্থে মন বসিয়া গিয়াছে। সে বোধ হয় ১৯৩৩-৩৪ সাল হইবে। তখন শরৎচন্দ্র খ্যাতির তুঙ্গ শীর্ষে সমাসীন। তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে মধ্যাহ্ন সূর্যও যেন কিছু ম্লান। 'শেষ প্রশ্ন' তাহার বছর দুই পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈঠকখানায় প্রায়ই শুনিতাম, অগ্রজেরা শরৎ-চন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ লইয়া তুমুল তর্ক করিতেছেন। তাঁহারা তখন কলেজে উঠিয়া 'নভেল নাটক' পড়িবার ঢালাও স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। আমরা, বালকেরা দিন গণিতাম, কবে স্কুলের শিকলি কাটিয়া কলেজের উদার আকাশে যথেচ্ছ উড়িবার অনুমতি পাইব।

একদিন কোথা হইতে এক কপি 'বিন্দুর ছেলে' সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম। একখানা চটি বহি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ হইতে প্রকাশিত। খল্বাট বিদ্যাসাগরের ফাঁকা ললাট-শোভিত ব্যাকরণ-কৌমুদীর মলাটের আড়ালে 'বিন্দুর ছেলে'কে সুকৌশলে চালান করিয়া দিয়া মশগুল হইয়া পড়িয়া চলিয়াছি। 'পথ-নির্দেশ' কিছু কড়া পাকের

মনে হইল। দুই-চারি পৃষ্ঠা পড়িয়া ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু 'বিন্দুর ছেলে' মন কাড়িয়া লইল। গুরুজনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া পড়িয়া চলিয়াছি, সশব্দে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠি আর কি!

এদিকে পিতৃদেব পাঠ্যগ্রন্থে পুত্রের এতাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া কিছু সন্দিহান হইয়া কাছে আসিয়া আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তারপর তাঁহার নিকট যেরূপ মর্মান্তিক আপ্যায়ন লাভ করিলাম, সে কথা না হয় নাই বলিলাম। তাই বলিতেছিলাম, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চোখের জলের মারফতে হয়। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্র, না পিতৃদেবের চপেটাঘাত, কোন্‌টি অধিকতর বাজিয়াছিল মনে নাই।

আর একবার মনে আছে, হাওড়ায় ৪২ নম্বর, বৈকুণ্ঠ চাটুজ্যে লেনের কংগ্রেস অফিসে শরৎচন্দ্র আসিবেন শুনিলাম। কি লইয়া যেন ভোটা-ভুটি আছে। পাশেই এক সহপাঠীর বাড়া। খোলা জানলায় তীর্থের কাকের মতো বসিয়া আছি। তখন কংগ্রেস অফিসের মধ্যে তুমুল হট্টগোল হইতেছে, বোধহয় রাজনৈতিক উপদলায় কোন্দল। হঠাৎ কয়েকজন বলিয়া উঠিল - 'ঐ শরৎচন্দ্র'। ঈষৎ মলিন একজন প্রায়-বৃদ্ধ ব্যক্তি, মাথার চুলে প্রবাণতার শ্বেত পতাকা উড়িতেছে। কোঁচানো ধুতির একাংশ একটু তুলিয়া ধরিয়া (বোধহয় টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল) তিনি একটু দ্রুতবেগে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন, অপ্রসন্ন মুখ, কণ্ঠে বিরক্তিজনক নীরস কটূক্তি। কোন-এক ভক্ত মাথায় ছাতা ধরিয়া চলিয়াছেন। মনটা বড়ই দমিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের দেবোপম ফটো কত দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্রের শরীরে কোথাও দেবতার চিহ্ন পাইলাম না। নিতান্তই যেন পাঁচাপাঁচি সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাহারই মধ্যে কেমন যেন একটা অনির্বচনায় অসামান্যতা ছিল। বড়ো হইয়া তাঁহার গ্রন্থাদি বহুবার পড়িয়াছি, এখনও পড়ি, পড়িয়া পড়িয়া মুগ্ধ হই, কিছুই যেন পুরাতন হয় নাই, বাসি হয় নাই। কিন্তু তাঁহার

অঙ্কিত অতি সাধারণ নর-নারীগুলি হঠাৎ যেন ভস্মশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহারা সামান্যের মধ্যে অসামান্য হইয়া ওঠে, তাহারা যে-মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা, সে-মহাকাব্য একিলিস, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ, সীতারাম, গোরা, নিখিলেশ কাহাকেও অবলম্বন করে নাই। তাহারা ভস্মভূষিত ভোলানাথের মতোই শ্মশান-বাসী, দারিদ্র্যই তাহাদের পরমৈশ্বর্য, কলঙ্কতিলকই তাহাদের রাজলাঞ্ছনা। সে বয়সে এসব কথা বুঝিবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে প্রথম দর্শনের কথা ধূমবৎ এখনও মনে আছে।

আরও একটু বড়ো হইয়া হাওড়া জেলা স্কুলের গণ্ডী পার হইয়াছি, মা গঙ্গার বক্ষের উপর কাঠের পুল, তাহা পদব্রজে পার হইয়া কলিকাতা শিয়ালদহগামী তিন পয়সার টিকেট কাটিয়া ট্রামে চাপিয়া কলেজে চলিয়াছি। হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম, শরৎচন্দ্রের বাসাবাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাজে-শিবপুরে বি কে. পাল স্কুলের কাছে এক এঁদো গলিতে শরৎচন্দ্র বাস করিতেন। তিন-চারজনে বাড়িটিকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। অত্যন্ত সরু গলি, ইট-বাহির-করা একতলা বাড়ী--আভিজাত্যের নামগন্ধ নাই। হায়, কোথায় শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, শ্যামলী—আর কোথায় এই খোলা ড্রেনের গন্ধমাতাল অপরিসর গলি এবং জীর্ণশীর্ণ বাসাবাড়ী। তখন শরৎচন্দ্র সেখানে নাই, কিছুকাল পূর্বেই তিনি অশ্বিনী দত্ত রোডে চলিয়া গিয়াছেন। তাহারও আগে রূপনারায়ণের কূলে সামতাবেড়ে গ্রামে কিছুকাল ছিলেন। তবু হাওড়ার জীর্ণ বাড়ীটি আমাদের চোখে নূতন মহিমা লইয়া দেখা দিল। পরে শুনিয়াছি, শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থ হাওড়া শহরের এই জীর্ণ বাড়ীতে বসিয়াই রচিত হইয়াছিল। বিপ্লবীরা গভীর রাত্রে এই বাড়ীর দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হইতেন এবং অর্থসাহায্য বা অন্যবিধ সাহায্য লইয়া নীরবে এবং লোকচক্ষুর অগোচরে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেন। সামতাবেড়ের বাড়ী সরকারী আনুকূল্যে হয়ত মিউজিয়মে পরিণত হইবে। কলিকাতার ভবনটিও অনুরূপভাবে জাতীয় সম্পত্তি

বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু হাওড়া শহরের এই ভাঙা বাড়ীটি কি কাহারও বিস্ময় আকর্ষণ করিবে না? আজও, যখন 'অলকা' সিনেমার উত্তরের গলি ধরিয়া খানিকটা হাঁটিয়া গিয়া বাম ও দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া যাই, তখনই মনটা কেমন ব্যথা বোধ করে। এই রাস্তা দিয়া শরৎচন্দ্র নিত্য যাতায়াত করিতেন। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক—নানা বিভাগের কত জন এই পথ দিয়াই শরৎচন্দ্রের বাসাবাড়ীতে যাইতেন।

আর একবার শরৎচন্দ্রকে দেখিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধিদানের পর। এই উপলক্ষে হাওড়া টাউন হলে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়, ব্যারিস্টার বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত বোধ হয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তখন আমরা জেলা স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেছি, টিফিনের ফাঁকে ফাঁকে বেশ ভারিক্কিচালে সাহিত্য লইয়া আলোচনায় মাতিয়াছি। সেই সময়ে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়। শরৎচন্দ্রের যেন কিছু জীর্ণ চেহারা, চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ, মাথায় শুভ্র কাশফুলের বন্যা। অনেকে বক্তৃতা দিলেন, সংবর্ধনা লিপি পঠিত হইল। শরৎচন্দ্র কী বলিয়াছিলেন আজ আর মনে করিতে পারিতেছি না।

শরৎসাহিত্যের মধ্যে ডুব দিয়া মাঝে মাঝে বাল্যস্মৃতির মধ্যে তলাইয়া যাই। শরৎচন্দ্রকে ক্ষণিক দেখার স্মৃতিই সম্বল হইয়া রহিল।

শরৎপরিক্রমা ৪

শরৎচন্দ্রকে আমরা কেন ভালোবাসি, এ কথার জবাব দেওয়া দুরূহ, কারণ ভালোবাসার কোন 'কেন' নেই। ভালো লাগে বলেই ভালোবাসি। দক্ষিণ ভারতের এক বন্ধু বলেছিলেন যে, তেলুগুভাষায় অনূদিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ অন্ধ্রপ্রদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এক পথচলতি কাশ্মীরি বন্ধু বলেছিলেন যে পর্বত-উপত্যকার বাসিন্দা হয়েও তিনি শ্যামল বাংলা-

দেশের কাহিনীগুলির মধ্যে তাঁর জীবনে ভীড়-করে-আসা অসংখ্য নরনারীর মিছিল দেখতে পান। তখন আমার মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষে একালের যদি কেউ আন্তঃপ্রাদেশিক লেখক থাকেন তবে তিনি শরৎচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদের মারফতে সারা ভারতে সুপরিচিত, কিন্তু ভারতবর্ষে একালের যদি কেউ আন্তঃপ্রাদেশিক লেখক থাকেন তবে তিনি শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ মাথার মানিক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক নাটুকে মহলেও খুব জনপ্রিয়, কিন্তু ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অন্য প্রদেশের হৃদয়বান পাঠক অনূদিত শরৎগ্রন্থে কী রস পায় তা আমি সেই সময়ে উপলব্ধি করেছিলাম।

আমার তো মনে হয় আন্তঃপ্রাদেশিকতা যে সাহিত্যে আছে, অর্থাৎ যে সাহিত্য ভাষা ও ভূগোলের গণ্ডী কাটতে পেরেছে তাকেই আমরা যথার্থ ভারতের সাহিত্য বলতে পারি। যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্র হয় কোলকাতায় মেসবাড়ি থেকে, নয়, কালাপানির পার রেঙ্গুন থেকে সমস্ত জীবনকে দেখেছেন তাঁরা বোধহয় শরৎচন্দ্রের প্রতি কিছু অবিচার ক'রে থাকেন। শরৎচন্দ্রের গল্পকাহিনীর আধার হয়েছিল বাংলাদেশ, কোলকাতা ও কোলকাতার বাইরের পল্লীগ্রাম। শরৎচন্দ্র যে সমস্যাগুলি সাহিত্যে তুলেছিলেন সেগুলি হল একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব ঘরোয়া সমস্যা—পারিবারিক দ্বন্দ্ব, কৌলীন্য, স্বামী বর্তমানে অন্য পতি গ্রহণ, এবং তথাকথিত পণ্যারমণীর মধ্যে সীতা-সাবিত্রীকে আবিষ্কার। এই সমস্যা অন্যান্য প্রদেশে ঠিক এইরকম উৎকট নয়। যেমন ধরা যাক অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান সমাজ। উল্লিখিত পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলির দ্বারা তাঁদের সমাজ ও পরিবার প্রায় কোথাও আক্রান্ত হয় নি। সুতরাং এর তীব্রতাজনিত বেদনা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তাঁদের মধ্যে নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, তাঁদের সমাজেও শরৎ-চন্দ্রের এই গ্রন্থগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তা আমরা লক্ষ্য করেছি। রমাঁ রোলাঁ শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন; সুইডেনের এক বাংলা গবেষক কিছুকাল কলকাতায়

থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ওপর গবেষণা করছিলেন। তিনি দিলীপ রায় কৃত 'নিষ্কৃতি'র ইংরাজী অনুবাদ 'The Deliverence' পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এইসব দৃষ্টান্ত দেওয়ার অর্থ—শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত গল্পকাহিনীকে আমরা নিতান্ত 'tale' বলে মনে করি, অবারণ চোখের জলেই যার মোক্ষ প্রাপ্তি, সেগুলিও ভিন্নতর রুচির ভিন্নভাষাভাষী পাঠকদের অন্তরে দোলা দেয়। এর কারণ, বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের আধারে শরৎচন্দ্র নির্বিশেষ মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এইভাবেই বিশেষের সীমা লঙ্ঘন ক'রে নির্বিশেষের কক্ষে ধাবমান হয়। কত শতাব্দী আগে বৃদ্ধ হোমার ও ভার্জিল যেসব কথা লিখে গেছেন, আজকের আমাদের সঙ্গে তার কতটুকুই বা যোগাযোগ। তাহলে আমরা এখনো অ্যাণ্ড্রোমাকির বেদনায় মানসিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করি কেন? কেনই-বা রাজকুমার ইনিয়াস-এর ব্যর্থ ভাগ্যের জন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ হই? এর একই কারণ। মহৎ শিল্প সমসাময়িকতাকে ছাড়িয়ে যায়। ইতিহাস যখন কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ, তখন কোন কিছুই অনন্ত নয়, না সাহিত্য, না জীবন। তবু কোন কোন সারস্বত সৃষ্টি অমরত্বের আংশিক অধিকার নিয়ে আসে। শরৎচন্দ্রের পাঁচপাঁচটি গল্পের মধ্যে সেই সীমাতিশায়ী অনন্ত বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করি। এইজন্য তিনি বারবার ভূগোল ইতিহাসের সীমানা লঙ্ঘন ক'রে যাবেন।

একালের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক শরৎচন্দ্রের গল্পকাহিনীর মধ্যে real এর 'রোমান্স' লক্ষ্য করবেন। একসময়ে কোন কোন সমালোচক শরৎচন্দ্র কতোবড়ো realistic লেখক, সেবিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ফেঁদেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক, অতিশয় আবেগপ্রবণ লেখক বস্তুর যথাযথ বর্ণনায় কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করেন না। বস্তুত realism কথাটাই মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বে চলে কিনা জানি না। লেখক তাঁর মনের মুকুরে প্রতিফলিত জীবনকেই কথা-সাহিত্যে রূপ দেন এবং রূপ দিতে গেলেই মনের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে আসার জন্য সে বাস্তব ঘটনা-কাহিনী আর

নিছক বস্তুতন্মাত্রময় বাস্তব থাকে না, সে একটি কল্পনাশ্রয়ী ব্যক্তিগত আকৃতিলাভ করে। শরৎচন্দ্র চল্‌তি জীবনের ছবি আঁকলেও সেই জীবনগুলি তাঁর চোখের জলে আর্দ্র, বুকের বেদনায় নিষিক্ত। তারা যা, তাঁর কাছে এবং হৃদয়বান পাঠকের কাছে তার চেয়েও অনেক বড়ো। সুতরাং একথা যদি বলি, ঘটনাকে ঘটা করে না সাজিয়ে তিনি মনের মুকুরেই সেগুলিকে বিন্যাস করেছেন, এবং 'বড়দিদি' থেকে আরম্ভ ক'রে 'শেষের পরিচয়' পর্যন্ত সর্বত্র শরৎচন্দ্রই বর্তমান, তাহলে কি ভুল করা হবে? অর্থাৎ একথা বলতে চাই যে শরৎচন্দ্র দুঃখ-বেদনার মধ্যে দিয়ে যে নর-নারীগুলিকে আমাদের সামনে এনেছেন তারা অনেকেই বৃহৎ মহৎ-বিশাল নয়। কেউ মাতাল, কেউ গেঁজেল, কেউ চরিত্রভ্রষ্ট—অতি সাধারণ। কেউ সামান্য নারী—যার কোনরূপ মহিমাই নেই। অকস্মাৎ যবনিকা উঠে গেলে দেখা যায় সামান্য বিবর্ণ মানুষটি ভস্মভূষিত মহেশ্বরের মতো বেদনায় নীলকণ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। পণ্যাঙ্গনা বহ্নিপূত সীতার মতো জ্যোতির্ময় লাবণ্যের অধিকারী হয়। আজকের দিনে রাম-রাবণ, যুধিষ্ঠির দুর্যোধন, এমনকি কৃষ্ণা-দ্রৌপদীও দূরস্থান, গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ অমরনাথ—এঁরাও যেন কাছের মানুষ বলে অন্তরঙ্গতা দাবি করতে পারেন না। আকারে-প্রকারে এঁরা বিশাল, এঁদের দুঃখবেদনাও তেমনিই বিশাল। তাই বোধহয় আমাদের মতো ভূমিচারী মানুষ তাঁদের দেখে বিস্মিত হয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ আশ্লেষে কাছে টানতে পারে না। এমনকি গোরা নিখিলেশ সন্দীপ কুমুদিনী অমিত অতীন্দ্র এলা—এদেরও আর একালের পথেঘাটে দেখা যায় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি কোলকাতায় ও গ্রামে এখনো দুর্লভদর্শন হয়ে পড়ে নি। আমার এক বন্ধু বলেন, তাঁদের গ্রামে পল্লীসমাজের সকলেই আছে, অবশ্য রমা-রমেশ ও বিশ্বেশ্বরী বাদ দিয়ে। সে যাই হোক শরৎচন্দ্র সামান্য মানুষের কারবারী। তাঁর নায়ক কল্পনার রথে আরোহী হয়ে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে বিপুল ধ্বনি-সহকারে আবির্ভূত হয় না। তারা সামান্য সাধারণ, সওদাগরী আপিসের

কনিষ্ঠ কেরানী হরিপদর মত। তাদের অন্তরে ধলেশ্বরী নদীতীরের কোন বালিকার ছায়া পড়ে না, তবু এই সামান্য মানুষগুলি হঠাৎ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। তখন দেখা যায় তারা জ্যোতির্ময়। শরৎচন্দ্র সামান্যের বুকে এই অসামান্য হৃৎস্পন্দন শুনেছেন। চোখের জলের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের কাছে এসে বাণী প্রার্থনা করেছে।)

একালের মার্জিতরুচির পাঠক শরৎচন্দ্রের করুণরসের গল্পগুলিকে বলবেন, সেগুলি আদিম আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই চরিত্র এবং রেখায় লেখায় মননের চিহ্নমাত্রও নেই। শুধুমাত্র আবেগ সম্বল করে কথাসরিৎসাগরে একালে তরঙ্গ তোলা যায় কি? উত্তরটা হল-- বুদ্ধির দাহ হচ্ছে মনন। এই মনন মানুষকে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতায় পৃথক করে এবং পরিপার্শ্ব থেকে উদ্ধৃত ক'রে তোলে। কথাসাহিত্যে মননে মানুষ একক, আবেগে সে বহু। আবেগের শ্রীক্ষেত্রে জাত পাঁতের কোন ভেদ নেই। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, কথাসাহিত্যে এখনো আমরা আবেগের ভক্ত, সে আবেগ যতই আদিম ধরনের হোক না কেন। শরৎসাহিত্যকে কেউ কেউ এই বলে নিন্দা করেন যে এ সাহিত্য মননে দুর্বল। আমরা বলি, মানুষ তো মননে-পূর্ণ কোন যন্ত্র নয়, সে সর্বোপরি হৃদয়বান। শরৎচন্দ্র আমাদের আবিষ্ট করেন হৃদয়ের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা ততটা নয়। যেখানে তিনি বুদ্ধিকে, তত্ত্বকে, উগ্র রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে তিনি তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন- যেমন 'শেষ প্রশ্ন', 'পথের দাবী, 'বিপ্রদাস'।

শরৎ-শতবার্ষিক উৎসব এখন অনেককেই শরৎচন্দ্রের প্রতি কৌতূহলী করে তুলছে, বিশেষতঃ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কথা কিছুই বলেন নি, বিদ্যাসাগর নিজের জীবনসম্পর্কে দু-চার কথা লিখেই দাঁড়ি টেনেছেন। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' সত্য, অর্ধসত্য এবং অস্তিত্বহীন কাল্পনিক ব্যাপারকে মিশিয়ে যেসমস্ত বাললোভন রূপকথা লিখেছেন তা অতিশয় সুখপাঠ্য হলেও তাঁর জীবনের সবকথা তাতে ধরা পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' আত্মস্মৃতিমূলক

হলেও স্মৃতিকথা নয়। এ দুটি হল কবির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের এক-একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সুবলয়িত impression। তাকে আত্মজীবনী বলে গ্রহণ করা যায় না। শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নেই, আছে চিঠিপত্র। সে-সমস্ত চিঠির আবার অধিকাংশই কাজের কথায় পূর্ণ। সাহিত্যে যিনি বাক্‌পটু, নিজের সম্বন্ধে তিনি প্রায় নীরব। তাই তাঁর জীবনকে ঘিরে এত রহস্য রোমাঞ্চ। তাঁর নেপথ্যের দিক আমরা তর্জনীসংকেত করতে পারি, কিন্তু যবনিকা কোনদিন উঠবে কিনা কে বলতে পারে।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের এক ক্রান্তিকাল পূর্ণ হল। বিশ শতকের প্রথম থেকেই তিনি লেখা শুরু করেন অথচ উনিশ শতক যাই-যাই করেও তাঁর মধ্যে অল্পস্বল্প রয়ে গেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'— এটিতে যে পারিবারিক চিত্র আছে, সেটি নাকি নদীয়া জেলার বাঘ-আঁচ্‌ড়া গ্রামের সত্য ঘটনা। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হলে আমরা বাল্যকালে গবেষণা করতাম এ নিশ্চিন্দিপুর, আষাঢ়ুর ঘাট, বারাকপুর, যা এখন বনগ্রামের কাছাকাছি, এই সমস্ত সত্যঘটনাই কি বিভূতিভূষণের উপাদান। রমেশ দত্তের 'সমাজ' ও 'সংসার' রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলের পটভূমিকায় অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহের কাহিনী আঁকা হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র গল্প লিখতে পুরোপুরি সার্থক না হলেও এমন একটি স্বেচ্ছাচারিণী নারীকে এঁকেছেন যার ধরনধারন অনেকটা কিরণময়ীর মতো। কৌলীন্য ও বৈধব্য হিন্দু উচ্চবর্ণের দুটি প্রধান ব্যাধি উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ধরা পড়েছে। তারই শেষ তলানি বিশ শতকের গোড়ার দিকে এসে ঠেকল। এবং শরৎচন্দ্র সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করলেন। তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার মূল কিছুটা উনিশ শতকেই নিহিত। তবে গত শতকের পল্লীসমাজে ততটা ঘুণ ধরে নি, একান্নবর্তী পরিবার তখনো ভেঙে পড়ে নি এবং পণ্যাঙ্গনার মধ্যে সতী-সাবিত্রীকে আবিষ্কার করার মানসিকতা উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালীর ছিল না। শরৎচন্দ্র যখন আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন বাঙালীর সমাজ নামক সেই institution প্রায় ভেঙে পড়েছে, নাগরিক জীবনের সমাজ সংকীর্ণতা

প্রাপ্ত হয়ে তিনটি প্রাণীর মধ্যে আবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে—স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত নরনারীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অদৃশ্য সমাজের কাল্পনিক সংঘর্ষ শরৎসাহিত্যের একটা মূল উপাদান। রমা ও রমেশের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে বেণী-শাসিত পল্লীসমাজ। কিন্তু শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মধ্যে সেরকম তো কোন ব্যবধান ছিল না। শ্রীকান্ত বাউণ্ডুলে পুরুষ, অনেকটা সাংখ্যের পুরুষের মতো, বাহ্যতঃ কোন আসক্তির বন্ধন নেই। অপরদিকে রাজলক্ষ্মীর কোন সমাজ নেই, কারণ কাঞ্চনের বিনিময়ে সামাজিকের মনোরঞ্জন করাই তার একমাত্র জীবনচর্যা। সুতরাং দুজনেই সমাজহীন যাযাবর। কিন্তু মিলন হয় না কেন, কেন রাজলক্ষ্মীকে মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া বাস পরে কাশীতে ছুটতে হয় দীক্ষা নেবার জন্য। এর কারণ বোধহয় এই– সমাজ নামক প্রচণ্ড শক্তি আমাদের ওপরে অদৃশ্যভাবে মুঠি পেষণ করছে। তাকে দেখতে না পেলেও, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনবহিত থাকলেও, সে অদৃশ্য-লোক থেকে অনিবার্য নিয়তির মতো ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আনে। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা এই বন্ধন ছিঁড়তে চেয়েছে। কিন্তু পারে নি। এ যেন অদৃষ্টের মতো হিতাহিতজ্ঞানশূন্য একটা আদিম শক্তি। এই নিয়তিকে মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে, নিজেই ভেঙেছে। শরৎচন্দ্র এই দ্বন্দ্বসংঘাতে রক্তাক্তকলেবর মানুষের হৃদয়টাকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ও নবান্তর লেখকদের অল্প লেখাই পাঠককে পুনঃ পুনঃ পাঠে উত্তেজিত করে। শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক অশ্রুকণাময় পরিচিত কাহিনীগুলি অবসরের সঙ্গী হয়, একবার নয়, বহুবার। একাধিক পঠন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটা মূল লক্ষণ। বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থল থেকে শুরু করে যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের সীমা পর্যন্ত তাঁর গল্পকাহিনীর সুদূর বিস্তার। বহুকাল পরে তাঁর বই আবার পড়তে গেলে আমরা সহসা জাতিস্মর হয়ে উঠি ; কখনো বাল্যে, কখনো কৈশোর, কখনো মধুমত্ত যৌবনে, কখনো বা প্রশান্ত প্রৌঢ়ত্বের বৈরাগী অপরাহ্ণে তাঁকে নতুন ক'রে ফিরে পাই। বাঙালীর অন্তর্লোক

থেকে তিনি উত্থিত হয়েছেন, সারা ভারতের অন্তর্লোকে তিনি প্রবিষ্ট হয়েছেন, বাঙালী হিসেবে এ আমাদের পরম গৌরব।

করুণাকর শরৎচন্দ্র ঃ

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে বেদনার রসে। আদি-কবি বাল্মীকির হৃদয়ে ক্রৌঞ্চবিয়োগব্যথাই অনুষ্টুপ শ্লোকের মারফতে কাব্য-রূপে জন্মলাভ করেছিল। শোক থেকেই শ্লোকের উৎপত্তি। সাগর-পারের কবিরাও মহত্তম বেদনার শতদলে অশ্রুসিক্ত কাব্য-সরস্বতীর বেদী রচনা করেছেন। গ্রীক নাট্যকারেরাও সান্ত্বনাহীন দুঃখ ও নিয়তি-তাড়িত নৈরাশ্যের যবনিকার সামনে ব্যর্থ মানুষের শোকার্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। রামায়ণ ও মহাভারতও শোকাবেগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রামায়ণে হারানোর দুঃখ এবং মহাভারতে প্রাপ্তির দুঃখই ধ্বনিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অকল্যাণ, মৃত্যু, নৈরাশ্য, বিনাশ প্রভৃতি অশুভ পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষিত হয় না। তাই রামায়ণ মহাভারত বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল প্রাঙ্গণে ট্র্যাজিক রস ও অন্তিমে করুণরসের সাক্ষাৎ মেলে না। সেকালের আলংকারিকদের মতে, শোকাবহ পরিণতি সমগ্র শিল্প সৃষ্টি-তত্ত্বকেই বানচাল করে দেয়। কারণ ট্র্যাজেডির মধ্যে কোন-না-কোন প্রকার অবিচারবোধ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ভারতীয় দর্শনে বিশ্ব সৃষ্টি একটি যৌক্তিক পারম্পর্যে বিধৃত। যা ঘটে, ভালোই হোক, মন্দই হোক—সবই মানুষের কৃতকর্মের ফল। পূর্বজন্ম, বাসনা, সংস্কার—এগুলির মধ্যেই মানুষের পরিণাম নিহিত থাকে। মানুষের সুখ-দুঃখ কোন বাইরের শক্তি, অদৃষ্ট, নিয়তি, ভাগ্য বা nemesis-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না—মানুষই তার দুঃখ ভোগের জন্য দায়ী। তার ভুলত্রুটি, দুর্বাসনা, অসংযম—এগুলিই তাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় টেনে আনে। ভারতীয় ঐতিহ্য প্রধানতঃ

কর্মবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, আমরা কিন্তু বাস্তব জীবনে, অধ্যাত্ম-চেতনায় ও অভিজ্ঞতায় দুঃখভোগের কারণ নির্দেশ করতে পারি না। তাই দুঃখের কথা এত রহস্যময় এবং আমরা বেদনাপীড়িত হয়েও এত আনন্দের সঙ্গে সেই বেদনার শিল্পরস উপভোগ করতে চাই।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই অশ্রুসিক্ত দুঃখ-বেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি অতিশয় পরদুঃখকাতর ছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কিছু চারিত্রসাদৃশ্য আছে। বুদ্ধদেব চারটি 'আর্যসত্য' আবিষ্কার করে দুঃখের অস্তিত্ব, উৎপত্তি, স্বরূপ ও বিনাশের জন্য নির্বাণতত্ত্ব ও শূন্যবাদ প্রচার করেছিলেন, তবু দুঃখ দূর হয় নি। একমাত্র মৃত্যুকে বাদ দিলে, দুঃখের চেয়ে কঠোরতর সত্য আর কিছু নেই। একথাটা শরৎচন্দ্র হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাঁর সৃষ্ট নর-নারীগুলিকে দুঃখের আগুনেই যেন পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

বাংলাদেশ আর্দ্রভূমির দেশ বলেই বোধ হয় এখানকার আকাশ সজল মেঘের বাষ্পে ঘনশ্যাম, এখানকার মাঠ শ্যামসমারোহে ঐশ্বর্যবান, নদী এখানে অমৃতবাহিনী, এবং মানুষের মন বেদনার আবেগে সদাই কম্পমান। করুণ-বিপ্রলম্ভ এখানকার বিরহের পদাবলীর মূল সুর। তাই বেদনার আবেগই অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছে। শরৎচন্দ্রও এই মানসিকতার উত্তরাধিকারী। যে দুঃখশোক মানুষকে কান্নায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, শরৎচন্দ্র তারই কথাকাহিনী লিখেছেন। মিলন-রসে সার্থক কিছু কিছু ঘরোয়া কাহিনীও তিনি লিখেছেন, কিন্তু তা রমণীয় হলেও মনের গভীরে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলতে পারে না, কমেডি কবেই বা পারে! সে যাই হোক, চোখের জলের আলপনা এঁকেই শরৎচন্দ্র করুণাময়ী সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। তাঁর সেই আখ্যান অধিকতর জনবল্লভ হয়েছে যা পড়তে পড়তে পাঠক-পাঠিকার চোখে অশ্রুর বন্যা নামে। চোখের জলে স্নাত হয়ে তখন আমরা অনেকটা সুস্থ হই—অ্যারিস্টটলের Catharsis-এর মতো। বাংলা সাহিত্যে এমন আন্তরিক বেদনার অশ্রুবাষ্পভরা কাহিনী আর কেই-বা

রচনা করতে পেরেছেন? বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার দুঃখ ক্লাসিক ছাঁদে অঙ্কিত; চরিত্রগুলি যেমন প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে কল্পিত, তাদের দুঃখবেদনা ও ব্যর্থতার উষ্ণ নিশ্বাসও তেমনি প্রতিদিনের মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ও উপন্যাসে করুণরসের সার্থক চিত্র অনেক আছে। কিন্তু রোমান্টিক আবেগ ও সূক্ষ্ম লীরিক সৌন্দর্যের সহস্রমুখী বৈচিত্র্যের জন্য তাঁর কুশীলবগুলিও যেন আমাদের ততটা পরিচিত বলে মনে হয় না। শরৎচন্দ্রের কাহিনীগুলি প্রতিদিনের তুচ্ছতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও তাদের অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য আমাদের এক মুহূর্তেই আপন করে নেয়। তখন মনে হয়, এসব দুঃখ বেদনা যেন আমারই শ্বাসরোধকারী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সকরুণ ফলশ্রুতি। চোখের জলের সহজিয়া রসের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী শরৎচন্দ্র বাঙালীর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। বেদনা মানুষকে কাছে টানে। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রগুলিও মানুষ হিসেবেই এত সার্থক হয়েছে, এবং সে মানুষ হল সমাজে ও আচার-আচরণের চাপে যূপবদ্ধ পশুর মতো অসহায় ও রক্তাক্ত।

করুণরস, যার একটা বড়ো উদ্দেশ্য হল করুণা সৃষ্টি, সেদিক থেকে শরৎচন্দ্র প্রায় তুলনারহিত হলেও একটি বিষয়ে আমাদের মনে কিছু কিছু চিন্তা জাগতে পারে। করুণরসের কাহিনী এবং ট্র্যাজেডি কি এক বস্তু? করুণরস বা pathos আবেগধর্মী ও রোদনপরবশ। চোখের জলেই করুণরসের শেষ পরিণাম। কিন্তু ট্র্যাজেডির নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা অনেক গভীর, ব্যাপক ও সান্ত্বনাহীন। মহাভারতকে বাদ দিলে ভারতীয় সাহিত্যে আর দ্বিতীয় কোন ট্র্যাজিক সাহিত্য নেই। রামায়ণ ঠিক ট্যাজিক নয়, এর পরিণাম মুখ্যতঃ করুণরসের সুলভ আবেগ ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র অধিক পরিমাণে শেক্সপীয়র অধ্যয়নের জন্য রোমান্টিক ট্যাজেডির যথার্থ স্বরূপ ঠিকই ধরেছিলেন এবং কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, সীতারামে তার সার্থক আকার-আয়তন দিতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রবৃত্তির অসংযত আবেগে ভাসমান নর-নারীর শেষ পরিণাম কী নিদারুণ, সেকথাটা তিনি শেক্সপীয়র সুলভ লিপিকুশলতার

সাহায্যে আঁকতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ট্র্যাজিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে নীতিমার্গীয় পাপপুণ্যবোধ। ফলে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির সমস্ত উপ-করণ হাতের কাছে থাকলেও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে বাধা ঘটিয়াছে তাঁর অন্তর্লোকশায়ী কতকগুলি নীতিবোধ। তাঁর মতে মানুষের চিত্তসংযমে ব্যর্থতা ও অনীহাই মানুষের স্থিতিস্থাপকতাকে বিনষ্ট করে। মানুষ নিজেই নিজের চারিদিকে বিষচক্র সৃষ্টি করে এবং তার বিষময় ফলভোগ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের নীতি ও সংযমবোধ এতটা প্রবল না হলে খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রই আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একমাত্র ট্র্যাজিকধর্মী লেখক হতেন।

শরৎচন্দ্রের একমাত্র 'গৃহদাহ' ছেড়ে দিলে আর কোন লেখাই ট্র্যাজেডির শীর্ষ স্পর্শ করতে পারে নি। সে সমস্ত ঘরোয়া লেখায় শুধু অর্গলহীন বেদনাপ্রবাহই পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু 'গৃহদাহে'র নায়িকা অচলার আশাহীন, আনন্দহীন. মরুধূসর পরিণাম পাঠককে কাঁদায় না, মানব ভাগ্যের নিদারুণ পরিণাম তাকে বেদনায় স্তব্ধ করে রাখে। বস্তুতঃ আমরা কিসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিই? "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু" পতঙ্গের মতো আমরা কি ইচ্ছা করেই দুঃখবেদনার অলাতচক্রে প্রবেশ করি? এই যে প্রলোভন, একি মানুষের বাসনালোক থেকে সৃষ্ট, অথবা এ তার আদিম পাপ? অথবা কোনো খামখেয়ালী দেবতার নিদারুণ কৌতুক? অচলার পরিণামের জন্য শুধু কি তার "দোলাচল মনোবৃত্তি" ও নিরুদ্ধ আকাংক্ষাই দায়ী, অথবা এ-সবের বাইরে কোন অদৃষ্ট নিয়তির অনিবার্য তাড়না? শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে ট্র্যাজেডির সেই পরিণামই অঙ্কিত করেছেন যা পাঠককে সুলভ কান্নায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, মানব জীবনের অন্তিম পরিচয়টিকে নিবিড় বেদনায় ভরিয়ে দেয়। শরৎসাহিত্যে এই জন্য 'গৃহদাহে'র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এখানে তাঁর শিল্পদৃষ্টি কিয়দংশে হার্ডি ও ডস্টয়ভস্কির অনুরূপ। শুধু 'গৃহদাহে'র কোন কোন স্থানে অযথা বাগ্‌-বাহুল্য ও অনাবশ্যক বর্ণনা আছে বলে এই উপন্যাস সার্থক ট্র্যাজেডি হতে গিয়েও

কিছু বাধা পেয়েছে। সে যাই হোক, এখানে করুণরসের আবেগ শিলীভূত হয়ে গেছে, চোখের জলও বাষ্পীভূত হয়েছে। এমন নিষ্করুণ বিষণ্ণতার শুষ্ক কাহিনী স্বয়ং শরৎচন্দ্রও আর দ্বিতীয়বার লেখেন নি। শরৎচন্দ্রের মনের গড়ন যেমন ছিল, তাতে করুণরসের আবেগব্যাকুল রচনাই তাঁর লেখনীমুখে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেদিক থেকে 'গৃহদাহ' কিছু ব্যতিক্রম বলেই মনে হবে।

শরৎচন্দ্র ও উনিশ শতক :

আমাদের বেশ মনে পড়ে, এক সময়ে সাহিত্য-রসিক ও সমালোচকের দল শরৎ-সাহিত্যকে উচ্চতর কথাশিল্প বলে গ্রহণ করতে চাইতেন না ; কেউ কেউ বলতেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিতান্তই ঘরোয়া 'টেল' ধরনের হয়ে গেছে। হয়তো তাঁর লেখনীমূলে কিঞ্চিৎ তরলরস থাকতে পারে, যাকে করুণরস বলে। এবং কে না জানে করুণরসের সামান্য আঘাতেই ভাবপ্রবণ বাঙালী উদ্বেল হয়ে পড়ে! বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরাতন ঐতিহ্য ধরেই শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা যতই বিপ্লবাত্মক কথা বলুক না কেন, আসলে তাঁর মধ্যে উনিশ শতকের দুজন ঔপন্যাসিক অদৃশ্যভাবে বর্তমান ছিলেন। একজন রমেশচন্দ্র দত্ত আর একজন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সিভিলিয়ান, অশেষ গুণধাম রমেশচন্দ্র সহৃদয় সহানুভূতির সঙ্গে মানুষের জীবনকে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নানা পার্থক্য ছিল। প্রধান প্রার্থক্য এইখানে। ঋজু-কঠিন বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে শুধু আবেগের ফানুস রূপে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। একটা বিশেষ ধরনের চারিত্র্যধর্মই বঙ্কিমচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল। চারিত্র্যের সঙ্গে মানবিকতার সংঘর্ষ বাধলে তিনি স্বচ্ছন্দে আবেগের কণ্ঠরোধ করতে পারতেন। সুতরাং যে নর-নারী চিত্তসংযমে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক তাদের প্রতি দ্বিতীয়-বিধাতা

বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মানুষ বঙ্কিচন্দ্র জেগে উঠতেন, যেমন প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্ক, অমরনাথ-লবঙ্গলতার কাহিনী। এখানে বারেকের জন্য শিল্পী বঙ্কিম চারিত্র্যমাহাত্ম্য ও মানবনীতির জ্যোতির্ময় আবরণ সরিয়ে তার পশ্চাদবর্তী অনন্ত বেদনাময় ঘন যবনিকার তমসাচ্ছন্ন প্রান্তটি দেখতে পেয়েছেন।

রমেশচন্দ্র ইতিহাস অবলম্বন করে কয়েকখানি রোমান্স লিখেছিলেন, বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে। এগুলিতে আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু আয়োজন এত বেশী হয়েছে যে, চালচিত্র প্রতিমাকে ঢেকে ফেলেছে। অধিকতর ঐতিহাসিক আনুগত্যের জন্য তিনি মানব জীবনের হৃদ্‌স্পন্দন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর দু'খানি উপন্যাস 'সমাজ' ও 'সংসারে' বাঙালীর ঘরোয়া জীবন ও পারিবারিক সমস্যাই চিত্রিত হয়েছে। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ সমাজ ও পরিবারের পক্ষে শুভসূচক একথা উপন্যাসে প্রচার করার মতো দুঃসাহস তাঁর ছিল—অবশ্য উক্ত উপন্যাস দু'খানি শিল্পবস্তু হিসেবে যে বিশেষ সার্থক হয় নি তাও স্বীকার করতে হবে। এ-সব ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু রক্ষণশীল হলেও তাঁর কলমে ছিল সরস্বতীর অকৃপণ আশীর্বাদ। তাই একালের প্রগতিবাদী পাঠক তাঁর কোন কোন অভিমত মানতে না পারলেও তাঁর সাহিত্যের মধ্যে নিত্যই মনের আরাম খুঁজে পান। রমেশচন্দ্রের ততটা শিল্প-সৃষ্টিক্ষমতা ছিল না। তবু দেখা যাচ্ছে, সেকালে সামাজিক মানসের প্রবল প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে রমেশচন্দ্র বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষেই উপন্যাস লিখেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন না করলেও আন্তঃপ্রাদেশিক সবর্ণ বিবাহ তাঁর মনোমত ছিল। মারাঠী ব্রাহ্মণ ও বাঙালী ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্পর্ক তাঁর অনভিপ্রেত ছিল না। সে যাই হোক, রমেশচন্দ্রই উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে সর্বপ্রথম বাঙালীর একটি পারিবারিক সমস্যা, আর একটি সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমযুগে আবির্ভূত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যশের খানিকটা আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর 'স্বর্ণলতা' ও 'হরিষে বিষাদে' বাঙালীর ঘরোয়া কাহিনী অসাধারণভাবে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যতটা ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে বাঙালীর ঘরের কথাকে চিত্রিত করেছিলেন, বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র ততটা পারেন নি। প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য তারকনাথের অঙ্কিত চরিত্রগুলি যেন পূর্বপরিচিত বলে মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ, সূর্যমুখী, ভ্রমর, লবঙ্গলতা— এদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় স্থাপন করতে হয়। তবে রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে একটু আগে যা বলেছি, তারকনাথ সম্পর্কেও তার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। তারকনাথের প্রতিভায় সেই যাদুশক্তি ছিল না, এবং বঙ্কিমচন্দ্রে যা অপরিমিত ছিল, যাতে রাং-তামাও সোনা হয়ে যায়। সে যাই হোক, তারকনাথ প্যারীচাঁদের মতোই ঘরোয়া চিত্র অঙ্কন করেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল সরল ও বেদনাময়, প্যারীচাঁদের মতো বক্র ও কৌতুকময় নয়।

শরৎ সাহিত্যে প্রচ্ছন্নভাবে 'সমাজ', 'সংসার' ও 'স্বর্ণলতার' কিছু ইঙ্গিত আছে। কারণ তিনি প্রধানতঃ বাঙালী পরিবারের কাহিনী লিখেছেন। অবশ্য রমেশচন্দ্র ও তারকনাথ যে-সমাজকে অবলম্বন করেছিলেন, শরৎ-চন্দ্রের সময়ে সে-সমাজের আরও অধোগতি হয়েছিল, নারীর মূল্য তখন প্রায় ভেঙে পড়েছিল। সে যাই হোক, শরৎচন্দ্রের উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গী যে একান্ত অভিনব ব্যাপার নয়, তার বীজ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নিহিত ছিল, তা ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুতর পার্থক্য ছিল। শরৎচন্দ্র যে সমাজকে পেয়েছিলেন সে সমাজ তখন রোগজীর্ণ। যে একান্নবর্তী পরিবারকে পেয়েছিলেন, তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে এবং সেই শূন্যস্থানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক monolithic পরিবারের গড়ন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সর্বোপরি শরৎচন্দ্রের মানসিকতায় খানিকটা বিদ্যাসাগরের লক্ষণ ছিল। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিরোধকল্পে

প্রচুর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু আসলে জীবন্ত শাস্ত্র ছিল তাঁর পরবেদনা-পরবশ বিশাল উদার মহৎ হৃদয়। শরৎচন্দ্র পরিবার, সমাজ ও নীতিঘটিত অনেক গুরুতর কথা বললেও তাঁরও প্রধান অস্ত্র ছিল বেদনা, করুণা, অশ্রু। নারীর দুঃখকে পোষাকী সহানুভূতির সঙ্গে না দেখে তাকে বাস্তব, নির্মম ও কঠিন সত্যরূপে উপস্থাপিত করে তিনি যে আবেগতপ্ত কেতন উড়িয়েছিলেন, তা বিশ শতকের ব্যাপার হলেও উনিশ শতকের ৭ম-৮ম দশক থেকে তার সূচনা হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের স্বচ্ছন্দে মিত্রতা হতে পারত। নির্মমতা ও বেদনা এবং তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের রোমান্স সঞ্জীবচন্দ্রের দু' একটি রচনায় চমৎকার ফুটতে পারত, এবং তিনি শরৎচন্দ্রকে ত্বরান্বিত করতে পারতেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য একটি অসমাপ্ত লীরিকের মতো, অর্ধস্ফুট কোরকের মতো। প্রতিভা তাঁকে ধনী করতে পারত, কিন্তু উদাসীনতা তাঁকে সাহিত্যগত নিষ্ঠা, একব্রত, অনুরক্তি ও খ্যাতি-লাভের সম্ভাবনা থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এদিক থেকে তিনি অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের ঠিক যেন বিপরীত। কোন কোন ফলে রং ধরলেও পরিপক্ক হবার পূর্বে ঝরে পড়ে। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা কতকটা সেই জাতীয়। প্রতিভার উদাসীনতা বাদ দিলে তাঁর মানসিকতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গোত্র-গত মিল একটু অনুসন্ধান করলেই চোখে পড়বে। একমাত্র পার্থক্য, শরৎচন্দ্র প্রবলভাবে জীবনের প্রতি অনুরক্ত, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম, অসাড় অনড় সামাজিক অবক্ষয়ের ওপর বজ্রনিক্ষেপে বদ্ধপরিকর। সেদিক থেকে সঞ্জীবচন্দ্র উদাসীন।

তবে উনিশ শতকের উল্লিখিত কথাকারদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সেই পার্থক্য, উনিশ শতকের সঙ্গে বিশ শতকের যে পার্থক্য। উনিশ শতক মোটামুটিভাবে এস্টাবলিশমেণ্টের প্রতি আসক্ত। বিশ শতক ভাঙচুর করে নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায়, অসংখ্য প্রশ্ন করতে চায়, সে প্রশ্নের জবাব না পেলে পরিপার্শ্বকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। শরৎচন্দ্রের আগমন হল তারই নান্দীপাঠ ক'রে। তিনি সমাজ

পরিবার, নীতি, আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু সর্বস্থলে জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। আবেগের বশে তিনি দিদি অনিলা দেবীর বকলমে 'নারীর মূল্য' লিখেছিলেন বটে, কিন্তু এটি প্রচুর পরিশ্রমসাধ্য ও গবেষণাধর্মী হলেও ঠিক জন স্টুয়ার্ট মিল সাহেবের 'The Subjection of Women' জাতীয় প্রচারপুস্তক নয়, তিনি Suffragette আন্দোলনও সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি প্রধানতঃ বেদনাকে মূল নিয়ন্ত্রীশক্তি বলে মেনেছেন, মানুষকে সমাজ ও সদাচারের বাঁধাছাঁদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চান নি। মানুষের জন্যই সমাজ ও পরিবার, সেই সমাজ ও পরিবার যখন মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বকে পিষে মারতে চায়, সেখানে তিনি মানুষেরই পক্ষ নিয়েছেন। এইখানে তিনি উনিশ শতকের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং আধুনিক মানসিকতার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র থেকেই কথাসাহিত্যের যথার্থ আধুনিকতা শুরু হল। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা আনতে চাই না। কারণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নরনারী একালের হলেও তাদের কোনও ভূগোল ইতিহাস নেই, তারা নিত্যকালের এবং 'দ্যাবাপৃথিবী'র কুশীলব।

তবু শরৎচন্দ্রকে গ্রহান্তরের জীব বলা যাবে না। উনিশ শতকের চিতাভস্ম থেকেই তাঁর পুনর্জন্ম, একথা মানলে উনিশ শতকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অধিকতর স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

শরৎচন্দ্র ও 'নারীর মূল্য' :

'নারীর মূল্য' গ্রন্থের উপসংহারে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "নারীর মূল্য কেন হ্রাস পাইয়াছে এবং বাস্তবিক পাইয়াছে কিনা, এবং মূল্য হ্রাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে, এবং নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা নিজের কথায়

ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।" নিবন্ধ-প্রবন্ধের কোন লেখক এত সহজে ও স্পষ্টভাবে তাঁর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এমনভাবে দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। ১৯২৩ সালে এই গ্রন্থটি তাঁর দিদি অনিলা দেবীর নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল প্রায় বাইশ বছর ধরে শরৎচন্দ্র যতগুলি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন, তার মধ্যে নারীর সামাজিক সমস্যা, স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। 'বড়দিদি', 'বিরাজবৌ', 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'শ্রীকান্ত' (১ম-৪র্থ), 'চরিত্রহীন,' 'স্বামী', 'গৃহদাহ', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনা-পাওনা', 'শেষপ্রশ্ন', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তার দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে।

বাংলা কথাসাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই উপন্যাসে নারীচরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। একালের অধিকাংশ উপন্যাসেও পুরুষের চেয়ে নারীচরিত্রের যেন অধিকতর প্রাধান্য ও গুরুত্ব। পুরুষের চরিত্র যেখানে ঘটনাসূত্রের নিয়ামক, সেখানেও তার চরিত্র ও মনের পথ-নির্দেশক কোনও নারীচরিত্র—প্রেয়সী বা জায়া। এর কারণ সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা নিরূপণ করবেন। বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকে আরম্ভ করে একাল পর্যন্ত নারীশক্তি ও নারীচরিত্রই যেন সমস্ত চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। চর্যাগীতিকার সাধকেরা নৈরাত্মাবধূতিকাকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করে নির্বাণের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণব কবিরা প্রেম ও সৌন্দর্যের আধারে অধরা নারীকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাঁরই নাম দিয়েছেন শ্রীরাধা। শাক্ত কবিরা সেই নারীকেই কখনও ভীমা ভয়ঙ্করী, কখনও বা স্নেহাতুরা জননীরূপে প্রত্যক্ষ করে জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজেছেন। আধুনিক কালের সূচনাভাগেও দেখা যাচ্ছে, টপ্পা গানে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বাঙালী কুলবধূর কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ ও 'নববিধান'-এর নেতৃবৃন্দ বাঙালী মেয়েদের পারিবারিক বন্ধন-রজ্জুটিকে একটু শিথিল করে আধুনিক বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা পরগলগ্রহ

নারীকে আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুললেন। তারপর বৃহত্তর হিন্দুসমাজে বাঙালী কুলস্ত্রীর পারিবারিক অবস্থার বিশেষ হেরফের না হলেও সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা যৎকিঞ্চিৎ স্বীকৃত হল। কিন্তু তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন কলকাতার নাগরিক সমাজ। রাজধানীর বাইরে যে বিশাল দেশ পড়ে আছে, তার একান্নবর্তী পরিবারের যাঁতাকলে নারীজাতি যেমনভাবে পেষাই হচ্ছিল, সেই ধারাই বয়ে চলল। শরৎচন্দ্র যখন লেখা শুরু কবলেন তখন বাংলার নারীসমাজ বলে কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে ওঠে নি। বাঙালী মেয়ের ওপর উদাসীনভাবে লাঞ্ছনা একইভাবে চলছিল। ইতিমধ্যে কলকাতায় নারী-আন্দোলন কিছুটা দানা বেঁধে উঠলেও গ্রামে তার বিশেষ কোন প্রভাব সঞ্চারিত হয় নি। নারীর নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে কয়েক শতাব্দী ধরে যে নিয়ম চলে আসছিল উনিশ-বিশ শতাব্দীতে তার বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তনও দেখা যায় নি। বরং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণে বাঙালীসমাজের দুর্গতি বৃদ্ধির সঙ্গে নারীসমাজেরও অকল্যাণ আরও ঘনীভূত হল।

শরৎচন্দ্র যৌবনে বেশ কিছুদিন বাংলার বাইরে এমন অঞ্চলে বাস করেছিলেন যেখানকার নারীসমাজ বাংলাদেশের মতো এতটা জড়ধর্মী ও সর্বংসহ ছিল না। নারীর অন্তঃপুরচারিণী মূর্তি ছাড়াও আর একটা মূর্তি আছে তা শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে বাস করবার সময়েই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হয়তো তারই প্রভাবে 'বড়দিদি' থেকে 'বিপ্রদাস' পর্যন্ত—বাঙালী মেয়ের বিচিত্র জীবনকে তিনি নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপার সহানুভূতি ও বেদনাবোধ তাঁকে বাঙালী নারীর দুঃখদুর্গতির মধ্যে টেনে নামিয়েছে। বিদ্যাসাগরের পর এত আবেগেব সঙ্গে বাঙালী নারীর বেদনাময় কাহিনী আর কেই-বা লিখেছেন? সাগরপারে বসে জন স্টুয়ার্ট মিল নারীমুক্তির সনদপত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল প্রেরণা ছিল সামাজিক অধিকারবোধ এবং তার যৌক্তিকতা। শরৎচন্দ্রের অবলম্বন ছিল আবেগ, করুণা ও সহানুভূতি। মমতায় আর্দ্র অশ্রুধারা শিল্পের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কথা-

সাহিত্যে এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, পাঠক চোখের জল ফেললে লেখক মনে করেন, ঈপ্সিত ফল পেয়েছেন। আমরা অর্থাৎ সাধারণ পাঠক, সমালোচকের সাবধানতা সত্ত্বেও, চোখের জলের সাহিত্যকেই সব চেয়ে আপনার বলে মনে করি। কারণ শুষ্ক মনের চেয়ে আবেগতরল আতিশয্যের দিকেই আমাদের স্বাভাবিক প্রীতি। এটা শুধু বাঙালীরই কুলধর্ম নয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেখেছি, ভিন্নভাষী পাঠকের মন শরৎসাহিত্য কীভাবে লুঠ করে নিয়েছে। এর কারণ হচ্ছে আবেগের সহমর্মিতা। বুদ্ধি মানুষের অস্মিতাকে উগ্র করে তোলে, আবেগ ও বেদনা সকলকে সমভূমিতে টেনে আনে। তাই আমরা প্রকাশ্যে মননধর্মী রচনার প্রশংসা করলেও অন্তরালে আবেগধর্মী লেখা পড়তে অধিকতর আগ্রহী হয়ে থাকি।

শরৎচন্দ্র নারীর অশ্রুমোচনের ইচ্ছায় অনেক কাহিনী ফেঁদেছিলেন যার সমাজতাত্ত্বিক দিক থাকলেও মূলতঃ নারীর নিগৃহীত জীবনের বেদনামাধুরী অঙ্কনেই তিনি ছিলেন সিদ্ধশিল্পী। নারীর প্রতি সহানুভূতি বশতঃ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন তিনি কাহিনীগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন, তখনই বোধহয় নারীর পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার দিকটি সমাজ, ইতিহাস ও নীতির দিক থেকে চিন্তা করেছিলেন। শোনা যায় রেঙ্গুনে বাস করার সময়েই তিনি নারীজীবন, বিশেষতঃ পতিতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিকগুলি আলোচনা করার জন্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নানা স্থান থেকে হতভাগিনী কুলত্যাগিনীদের যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বইখানির পাণ্ডুলিপি গৃহদাহের ফলে বিনষ্ট হয়ে যায়। 'নারীর মূল্যে'র একস্থানে তিনি এই সম্পর্কে একটু ইঙ্গিতও দিয়েছেন—"বারো-তেরো বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলার বহু সহস্র হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে

ভস্মীভূত হইয়াছে—বোধ করি, ভালই হইয়াছে—সুতরাং কেহ সঠিক প্রমাণ চাহিলে দিতে পারিব না সত্য, কিন্তু ইহার আগাগোড়া কাহিনীটা আমার মনে আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তরজন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা।" এই 'জনৈক ভদ্রলোক' হয়তো শরৎচন্দ্র নিজেই। সেই আলোচনায় তিনি খুব সম্ভব দেখাতে চেয়েছিলেন, পতিতাবৃত্তির মূল কারণ স্ত্রীলোকের কামোন্মাদনা নয়। সমাজ ও পরিবারের লাঞ্ছনা, কোথাও বা দারুণ দারিদ্র্যজনিত গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবের জন্যই স্বামী-পুত্রবতী বহু কুলবধূ এবং বিধবাকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নারীচরিত্রের এই পরিণামের যথার্থ স্বরূপ ও হেতু বিশ্লেষণের অভিপ্রায়ে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, নীতিবাদ, নারী-আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে যত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন, নানা উৎস থেকে যেভাবে বস্তুগত তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করেছিলেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। একালের কোন ডিগ্রীকামী গবেষক এ ধরনের নিশ্ছিদ্র পরিশ্রমে ভীত হয়ে পড়বেন। সামাজিক কারণে নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা অবনমিত হয়েছে এবং সে কারণগুলি সৃষ্টি করেছে পুরুষ-শাসিত সমাজ। এ কালে পাশ্চাত্ত্যের পুরুষেরা নারীকে অত্যন্ত মূল্য দিয়ে থাকে। ভারতবর্ষেও বহু পূর্ব থেকে নারীকে দেবীর পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এর মূলে কিন্তু প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে পুরুষের স্থূল ধরনের স্বার্থবোধ। সেই কথাটা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের মূল গ্রন্থ থেকে নিজের প্রয়োজনমতো তথ্য সংগ্রহ করেছেন। য়ুরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনীও তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে বহু পাশ্চাত্ত্য ভূ-পর্যটক আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দুর্গম এবং বিপজ্জনক অঞ্চল ভ্রমণ করে সেই-সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিচিত্র, অদ্ভুত ও বীভৎস আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে নানা

কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য এর পিছনে প্রচ্ছন্নাবস্থায় ছিল শ্বেতাঙ্গের অহমিকা এবং ঔপনিবেশিক দম্ভ। বর্ণনার গুণে সে সমস্ত ঘটনা বা রটনা এমন উৎকট আকার ধারণ করল যে, আমরা—অর্থাৎ ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীরা, সে সমস্ত জল্পনাকে বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস করতে লাগলাম।

ঐ সমস্ত বর্ণনায় স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষের অত্যাচারের কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। শরৎচন্দ্র উক্ত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত তথাকথিত আদিম-অসভ্য অধিবাসীদের নারীর প্রতি বর্বরতার কাহিনীগুলিকে তথ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তারই সঙ্গে সুসভ্য ইউরোপেও নারীর প্রতি কত অন্যায় অবিচার হয়েছে—এই সেদিনও ওদেশের পুরুষ কত স্বেচ্ছাচারী ও নির্মম ছিল, বিশেষত, স্ত্রীলোকের বেলায় —শরৎচন্দ্র সে ঘটনারও উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষের শাস্ত্র-সংহিতা ও সাহিত্যে নারীকে প্রায় স্বর্গের ঈশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, আবার পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর অসম্মান চূড়ান্ত আকার লাভ করেছে। স্ত্রীলোকের ভোজন, শয়ন ও কাম পুরুষের চেয়ে কতগুণ বেশী তাই নিয়ে স্মৃতিকার ও পুরাণকারেরা বহু আলোচনা করেছেন। নারী যে নরকের দ্বার; সে হচ্ছে সনাতনী প্রকৃতির মতো নির্বিকল্প পুরুষকে যোগভ্রষ্ট করে। আবার অপরদিকে কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র, কোকশাস্ত্র, অনঙ্গরহস্য, কুট্টিনীমতম্, অমরুশতক, শৃঙ্গারশতক, পুষ্পবাণবিলাসম্, গাথাসপ্তশতী, আর্যাসপ্তশতী প্রভৃতি গ্রন্থে ষোড়শোপচারে অনঙ্গরঙ্গিণী নারীর শারীরতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে পরম আগ্রহে। আচার্য শঙ্করকে শৃঙ্গারতত্ত্ব শিক্ষার জন্য নারী-সঙ্গ করতে হয়েছে, ইত্যাকার ঘৃণ্য জুগুপ্সা কলমবন্দী করতে প্রাচীন আচার্যেরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। এই রিরংসা কতদূর যেতে পারে শৈব-পুরাণগুলি তার মারাত্মক দৃষ্টান্ত। একাধারে নারীকে ভোগের জান্তব উপাদান বলে শিরোধার্য করা, আবার পরক্ষণেই তাকে ছলনাময়ী বলে পদাঘাত করা—এই দুই মানসিকতাই অসুস্থ

ও বিকৃত। 'বনং বা যৌবনং বা'—হয় নারীকে ত্যাগ করে বনে যাও, আর না হয় তাকে নিয়ে যৌবনলীলা ভোগ কর। প্রাচীন ভারতে নারীকে কেন্দ্র করে একধরনের ইহ-সুখকামী hedonism, আর এক-দিকে নারীসংসর্গবঞ্চিত যতিধর্ম উচ্চবর্ণের কাছে স্বাভাবিক বলেই গৃহীত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, এ দুটোই হল নারীর সব চেয়ে বড়ো শত্রু। একালেও ভারতীয় হিন্দুসমাজে নারীকে 'মহাভাগা' বলে সম্মান করা হয়, জননীত্বকে নারীত্বের একমাত্র পরিণাম বলে ঘোষণা করা হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন যে, যেখানে নারীরা পূজিত হন, সেখানে দেবতারা বিহার করেন। কন্যাকেও পুত্রের মতো শিক্ষিত করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। গোরুকেও তো গোমাতা বলে অশেষ ভক্তি করা হয়, কিন্তু গৃহস্থ জানে, তার খড়-বিচালির ব্যবস্থা যত কম করা যায় এবং তাকে যতটা দোহন করা যায় পরিবারের পক্ষে ততই মঙ্গল। ভালো ভালো আপ্তবাক্য সত্ত্বেও বহু যুগ ধরে যে ভারতবর্ষে অবিরত নারীর প্রতি লাঞ্ছনা চলেছে, তার প্রমাণ দেবার জন্য পাঁজি-পুঁথি ঘাঁটার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই তা জানি। অন্তরের যে স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে ও মজ্জাগত মনুষ্যত্ববোধ আছে, তার দ্বারাই বোঝা যায়, ভারতের নারীকে ভারতবর্ষের শাস্ত্রসংহিতা সন্তানপ্রসবকারিণী ভিন্ন অন্য কোনরূপে দেখতে অভ্যস্ত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দল পরিপুষ্ট করবার জন্য বহু-প্রজাবতী নারীকে প্রশংসাই করা হত—সে সন্তান যেমনভাবেই আসুক না কেন। 'ক্ষেত্রজ' পুত্রের বিধান সেই মনোভাবপ্রসূত কিনা সমাজতাত্ত্বিকগণ বিচার করবেন। এই সমস্ত কথা আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র যে-কোনো গবেষকের মতোই বহু পরিশ্রম করে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এর মূলে ছিল যুক্তিগত গবেষণা নয়, হৃদয়গত আবেগ। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "যে সত্য আমি হৃদয়ের ব্যথার ভিতর দিয়া বাহির করিলাম, সে সত্যকে কোন মহামহোপাধ্যায় উড়াইয়া দিতে সক্ষম

হইবে না, তা নির্ভয়ে বলিতে পারি।" এই উক্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি যুক্তির মধ্য দিয়ে এই সত্যকে লাভ করেন নি, তাঁর প্রধান অবলম্বন হল 'হৃদয়ের ব্যথা'—অর্থাৎ সহানুভূতি বা আবেগ। যে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য—ইতিহাস ও সমাজবিবর্তনের দিক থেকে নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবিচার এবং তার প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের নির্যাতন, সেখানে তথ্যের দিকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। আবেগ, বেদনা ও ব্যাকুলতা সমগ্র সন্ধানের গতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেলে তথ্যের দিকে কিছু ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা, অথবা তথ্যানুসন্ধানে বাছাই করার ইচ্ছা জাগে। শরৎচন্দ্র মূলতঃ আবেগপ্রবণ এবং এ গ্রন্থ কোনো 'থিসিস্' নয়। আবেগই এর উৎস ও প্রেরণা। ফলে নিঃস্পৃহ তথ্যসজ্জার চেয়ে বিশেষ ধরনের আবেগ এ রচনাটির গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

প্রথমে পুরাতন পৃথিবীর ইতিহাস ও সমাজ, দ্বিতীয়ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজে নারীর স্থান এবং শেষে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় নারীর সামাজিক ও পারিবারিক স্বরূপ নিয়ে শরৎচন্দ্র এ গ্রন্থে বেশ তথ্যবহ আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল প্রামাণ্য বিষয়ঃ মধ্যযুগেই নারী পুরুষের খেয়ালখুশিমতো চলতে বাধ্য হয়েছে। একযুগে নারী ছিল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনকটা গোরুবাছুরের মতো। পরে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সে সম্পর্কের যৎকিঞ্চিৎ বদল হলেও মনের দিক থেকে পুরুষসমাজ সেই একই জায়গায় রয়ে গেছে। সহমরণ, বৈধব্য ও পতিতাবৃত্তি—তাঁর আলোচনা নারীজীবনের এই তিনটি দুর্গতিকে কেন্দ্র করেছে। প্রথমটি অতীতের বস্তু, দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে ভারতীয় হিন্দু নারীর সমস্যা। তৃতীয়টি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ঘটনা। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী থেকে শরৎচন্দ্র সেই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেখানে নারীর প্রতি পুরুষের নির্মম অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। তিনি পণ্ডিতা রমা বাঈয়ের কথা উল্লেখ কয়তে পারতেন। 'নববিধান' ও ভারতবর্ষীয় সাধরণ

ব্রাহ্মসমাজের কথাও বলা চলত। এঁরা নাগরিক নারীসমাজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। সে যাই হোক, যুগে যুগে নারীসমাজ পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে এবং সেই পীড়নের ধারা এখনও কমবেশী বয়ে চলেছে—শরৎচন্দ্র নানা নজীর ও দৃষ্টান্ত তুলে সে কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। নারীর মুক্তি কোন্ পথে, এই সম্পর্কে 'শেষ প্রশ্নে'র কমলের জবানীতে তিনি কিছু কিছু সেই ধরনের গঠনমূলক প্রস্তাব করেছেন—যা অর্ধশতাব্দী আগে বাঙালীসমাজে যথেষ্ট ঢেউ তুলেছিল এবং কমলের paradoxical উক্তিকে অনেকেই উগ্র প্রগতিবাদ এবং নারীস্বাতন্ত্র্যের অকারণ আস্ফালন বলে ভীত হয়েছিলেন, লেখককে যথেষ্ট নিন্দাবাদও করেছিলেন। 'নারীর মূল্যে'র পাণ্ডুলিপির খানিকটা পড়ে লেখকের "এক আত্মীয় 'morbid mind'-এর পরিচয় পাইয়াছেন; আর এক আত্মীয় নর-নারীর বিসদৃশ সম্বন্ধের আলোচনা করার অপরাধে এমনিই কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থে নির্মম বর্ণনার উল্লেখ থাকলেও লেখক নারীর কল্যাণ কামনাতেই দুষ্টক্ষতে আঙুলের খোঁচা দিয়েছেন। এ আলোচনায় তাঁর মনের আদর্শবাদী নারীহিতৈষিতাই ফুটে উঠেছে—'morbid mind'-এর কোন চিহ্ন এ গ্রন্থে নেই। স্ত্রী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক এবং অকৃত্রিম দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে বটে, কিন্তু যেখানে উভয়ের সম্পর্ক নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে, সেখানে নারীকেই সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেতে হয়—এই কথাটি শরৎ-চন্দ্র নানা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকে সংগ্রহ করেছেন। হয়তো স্বভা-বানুকূল আবেগাতিশয্যের জন্য ঘটনা বাছাই ও বিন্যাসকরণ কিছুটা একপার্শ্বিক হয়ে গেছে এবং ইউরোপীয়দের গ্রন্থের উপর অধিক নির্ভর করার জন্য বক্তব্যও খানিকটা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। সে যাই হোক, 'নারীর মূল্য' সমাজ, পরিবার ও নীতিতত্ত্বের দিক থেকে একখানি অভিনব গ্রন্থ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্র রচনাকর্মের পূর্ব থেকেই বাঙালী

নারীর দুর্গতি অত্যন্ত সহানুভূতি ও আবেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন এবং বোধহয় উপন্যাসাদি রচনার আগেই সমাজ ও ইতিহাসে নারীর স্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে উৎসাহী হয়েছিলেন।

নানা গ্রন্থ অনুশীলন করে শরৎচন্দ্র দেখলেন যে, শুধু এদেশে এবং এ কালেই নয়, সর্বযুগে এবং সর্বদেশে অধিকতর শক্তিশালী পুরুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীকে কোনও দিন স্বাতন্ত্র্য দিতে চায় নি। এ সমস্ত আলোচনায় তিনি সমাজবিজ্ঞানের দিকটি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য তাঁর মূল উপাদান ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের সহযোগে মানবজাতি ও সমাজের যে বৈজ্ঞানিক বিকাশধারার বিচার-বিশ্লেষণ এখন শুরু হয়েছে, তার বয়স অর্ধ শতাব্দীর মতো; শরৎচন্দ্র তখনও তার পুরো স্বরূপ জানতেন না। অর্থনৈতিক কারণ, অধিকার-বোধ, ধনোৎপাদন এবং ধনবণ্টন, মানবসমাজের বাইরের দিকটি মূলতঃ এই চতুর্বিধ বন্ধনরজ্জুর দ্বারা বিধৃত। অন্তরে আছে কালানুগত কুলাচার বা বংশগতি এবং ব্যক্তির নিজস্ব ঋক্‌থ, যা জীব কীভাবে অর্জন করে তা এখনও সন্দেহাতীতরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। শরৎচন্দ্র এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত পূর্বস্মৃত্রের চেয়ে আপন অন্তরের ব্যথা-বেদনা করুণাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই জন্য যাকে গবেষণা বলে, এ গ্রন্থ সে ধরনের নয়। কারণ গবেষণা সব-সময়ে নিঃস্পৃহ, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত। শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' নারী-নির্যাতনের কথাতেই পূর্ণ এবং লেখকের আবেগতপ্ত অশ্রুবেদনায় পরিস্নাত। শরৎচন্দ্র নানা তথ্য-উপাদান ঘেঁটে এইটুকু বুঝেছিলেন যে, সর্বকালেই দুর্বলা নারী সবল পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত হযেছে। বাংলাদেশের পরিবার ও সমাজে নারীর বিড়ম্বিত অবস্থা দেখে তাঁর সেই ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে বাঙালী নারীর মৌন বেদনা সহানুভূতির রসে আর্দ্র হয়ে পাঠকের আনুকূল্য প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। সমাজ, পরিবার—যার প্রধান নেতা পুরুষ,

তার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বাঙালী নারী যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, সারা ভারতের নারীসমাজের চিত্রও প্রায় তারই মতো। তাই অন্য প্রদেশের সহৃদয় পাঠকও শরৎসাহিত্যের বাঙালী সমাজের [illegible]কাহিনী অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে পড়ে থাকেন।

শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রের স্বরূপ বুঝতে গেলে 'নারীর মূল্য' তার অনেক ইঙ্গিত ও সূত্র পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা বিশ্লেষণের জন্যও এ গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান। এই গ্রন্থ রচনার পর অর্ধ শতাব্দীর বেশী অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাঙালী বা ভারতীয় নারীসমাজের যথার্থ স্বরূপ নিয়ে বৈজ্ঞানিক, নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক গবেষণা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয় হয় নি।*

* শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' রচনাকালে য়ুরোপীয় নারীজীবন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পড়েছিলেন। এখানে তার কয়েকখানির নাম উল্লেখ করা হল।

"Woman in all ages and in all countries" Series

Harus, John Rouse—*Woman of America.*

Thieme, Hugo. P.—*Woman of Modern France.*

Brittain, Rev. Alfred—*Roman Women.*

Women of Early Christianity, Philadelphia.

Schoeufield, Herman—*Woman of the Teutonic Nations*

Carrol, Mitchell—*Greek Women.*

Butler, Pierec—*Women of Mediaeval France.*

এই গ্রন্থগুলি এখনও সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্রের বাসগৃহের [illegible] লাইব্রেরীতে আছে।

[দ্রষ্টব্য : শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য—[illegible]]